পত্রাঙ্ক	প্রদানের তারিখ	গ্রহণের তারিখ	পত্রাঙ্ক	প্রদানের তারিখ	গ্রহণের তারিখ
১০৭৫	১৫/৫	৪/৬			প্র-৭
৫৭	১৭.৭.৭৭	৩/৮			
১০৭৪	১৪/৫	১/৭			

সচিত্র

তীর্থ-ভ্রমণ কাহিনী।

বা

ভারতবর্ষীয় তীর্থ সমূহের মাহাত্ম্য প্রকাশ।

ভারতের তীর্থ রাজি, মহা পুণ্য স্থান।
ভ্রমিতে মনের সুখ, হয় দিব্য জ্ঞান॥
শ্যামলা ধরিত্রী-বক্ষে, নরনারী যত।
আকুল অন্তরে সদা, ফিরে অবিরত॥

শ্রীগোষ্ঠ বিহারী ধর প্রণীত।

চতুর্থ ভাগ।

THE BENGAL MADICAL LIBRARY.
201. Cornwalis Street, CALCUTTA.
1914.

 মূল্য ১।০ এক টাকা চারি আনা মাত্র।

CALCUTTA.

Published by **Bepin Behari Dhur,**
No. 356 Upper Chitpur Road.

Printed by **Rango Lall Mittra,** *At the*
Punnya Printing Works,
6/1. Dawrka Nath Tagore Lane, CALCUTTA.

Illustrated by Srijut **Preo Gopal Dass.**

1914.

বিজ্ঞাপন।

দেশ পর্য্যটন করিয়া নানা দেশের ভিন্ন ভিন্ন লোকদিগের বিবিধ প্রকার আচার ব্যবহার ও রীতিনীতি দর্শন না করিলে যেরূপ জ্ঞানোদয় হয় না, সেইরূপ আবার নানা গ্রন্থকারের পৃথক পৃথক মনোভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিলে—লেখক কথনই উন্নতি সাধন করিতে সক্ষম হন না। চিরগত এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া, ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুগণ দেশ পর্য্যটনে বহির্গত হইয়া, পবিত্র তীর্থস্থানের নবপ্রস্ফুটিত গোলাপের সৌরভের ন্যায় কারুকার্য্য বিশিষ্ট দেবতাদিগের সুন্দর সুন্দর মন্দির শোভা এবং তাঁহাদের অতুল ঐশ্বর্য্য এতদ্ভিন্ন বহুতর সুদক্ষ কর্ম্মচারী নিয়োগ থাকায় অর্থের সদ্ব্যবহার সম্বন্ধেও বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া থাকেন; বিশেষতঃ তীর্থে তীর্থে পরিভ্রমণ করিলে—জ্ঞানের বিকাশ, দৈহিক উন্নতি, তৎসঙ্গে পরকালে মুক্তির পথ প্রশস্ত হয়।

ভগবানের সৃষ্টিলীলার বিবিধ প্রকার সৌন্দর্য্য দর্শনে যে আনন্দ অনুভব হয়, এমনটী আর কিছুতেই হয় না। হিন্দু—প্রাচীনকাল হইতে তীর্থসেবা করিতে উপদেশ পাইতেছেন, কেননা এই জ্বালা-যন্ত্রণাময় ভগবানের পরীক্ষাভূমি "সংসার যন্ত্রণা" অর্থাৎ হৃদয়ের শোক, তাপের করাল-কবল হইতে পরিত্রাণ পাইবার, ইহার সমকক্ষ আর দ্বিতীয় ঔষধ নাই স্থির অবগত হইয়াই সময় মত তাঁহারা তীর্থস্থান পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন।

"তীর্থ-ভ্রমণ কাহিনী"তে সেতুয়া ও পাণ্ডা গোলক ধাঁধা এবং অত্যাচার নিবারণ বিষয়, কোন্ তীর্থে কোন্ দেবতার পূজায়

কিরূপ দ্রব্যের আবশ্যক ও দ্রষ্টব্য স্থানগুলি সরল ভাষায় লিপিবদ্ধ করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। সাধারণের সুবিধার্থে এই সুবৃহৎ পবিত্র গ্রন্থখানি চারি খণ্ডে সম্পূর্ণ হইল। প্রত্যেক খণ্ডেই রাশি রাশি তীর্থ-চিত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে এবং প্রত্যেক খণ্ডের ভিঃ পিঃ খরচ ৵৹ স্বতন্ত্র।

সচিত্র তীর্থ-ভ্রমণ কাহিনী প্রথম ভাগ দ্বিতীয় সংস্করণের অবশিষ্টাংশ যাহা চতুর্থ ভাগ নামে প্রকাশিত হইল—ইহার স্থানে স্থানে স্বদেশ হিতৈষী মাননীয় শ্রীযুক্ত বাবু বরদাপ্রসাদ বসু মহাশয়ের "তীর্থ-দর্শন" নামক গ্রন্থ, এবং হিন্দুধর্ম্মের মুখপত্র "বঙ্গবাসী" প্রকাশক শ্রীযুক্ত বাবু সত্যেন্দ্র কুমার বসু মহাশয়ের সন ১৩১৯ সালের লিখিত পত্রিকায় অনেক সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি, এ নিমিত্ত উক্ত মহাত্মাগণের নিকট অন্তরের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি নিবেদন ইতি।

তীর্থ-ভ্রমণ কাহিনীর প্রথম ভাগ দ্বিতীয় সংস্করণে—কালি-ঘাট, কলিকাতার ইতিহাস, তারকেশ্বর, মগরার যুক্ত ত্রিবেণী, বর্দ্ধমান, বৈদ্যনাথ, বাঁকিপুর, গয়া, কাশী, প্রয়াগ, কাণপুর, অযোধ্যা, হরিদ্বার, কনখল, হৃষীকেশ, কর্ণপ্রয়াগ, ইন্দ্রপ্রস্থ, কুরুক্ষেত্র, হাতরাস, মথুরা ও বৃন্দাবন সংশ্লিষ্ট হইয়াছে, মূল্য—১৷৹ টাকা।

দ্বিতীয় ভাগে—ওয়ালটেয়ার, প্রহ্লাদপুরী, গোদাবরী, মান্দ্রাজ সহর, কাঞ্চীপুর, বালাজী, জলকান্তীশ্বর, অরুণাচলম্, বৈদেশ্বর, মায়াভরম্, কুম্ভকোণন্, তাঞ্জোর, ত্রিচিনাপল্লী, জগদ্বিখ্যাত শ্রীশ্রীরঙ্গম্ জীউর দেবালয়, কাবেরী বৃত্তান্ত, কিষ্কিন্ধ্যাপুরী, স্বাধীন মহিশূর রাজ্য মাদুরা, সেতু-বন্ধ তীর্থ, এতদ্ভিন্ন হরিদ্বার হইতে লক্ষ্মণঝোলা ও প্রসিদ্ধ ধাম বদরীকাশ্রম ইত্যাদি, মূল্য—১৷৹।

তৃতীয় ভাগে—জব্বলপুর, নর্ম্মদা, বোম্বে, পুণাসহর, এলিফ্যাণ্টা-কেপ, প্রভাসক্ষেত্র, দ্বারকাপুরী, আরও গোহাটীর অন্তর্গত চন্দ্রনাথের তীর্থসমূহ এতদ্ভিন্ন দার্জ্জিলিং ও নেপালের অন্তর্গত শ্রীশ্রীপশুপতিনাথ দর্শন যাত্রা পর্য্যন্ত সন্নিবেশিত হইয়াছে, মূল্য—১।০।

চতুর্থ ভাগে—কলিকাতা হইতে বালেশ্বর, বৈতরণী, ভুবনেশ্বর, সাক্ষীগোপাল, পুরীতীর্থ ও পদ্মক্ষেত্র, এতদ্ভিন্ন আগ্রা, জয়পুর, আজমীঢ়, পুষ্কর ও সাবিত্রী তীর্থের আদি বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ হইয়াছে, মূল্য—১।০ সিকা মাত্র।

গ্রন্থকার।

সূচীপত্র।

চিত্র-সূচী।



অধীন গ্রন্থকার।

Sulov Press, Calcutta.

তীর্থ-ভ্রমণ কাহিনী।

তীর্থযাত্রা পদ্ধতি।

যিনি কুপ্রতিগ্রহ করেন না, কুস্থানে যান না, তিনিই তীর্থযাত্রার ফল অধিকার করিতে সক্ষম হইয়া থাকেন। যাহার দেহ ক্লেশ-সহিষ্ণু, মন পবিত্র ও অহঙ্কারহীন, যিনি পরিমিত-ভোগী, জিতেন্দ্রিয়, সর্ব্ব-সঙ্গ-বিরহিত, তিনিই তীর্থের ফল-লাভ করিতে পারেন। শ্রদ্ধাহীন, নাস্তিক, পাপী, সন্দিগ্ধমনা এবং কারণ-অনুসন্ধায়ী ব্যক্তিরা কখন তীর্থে ফল পান না। তীর্থস্থানে অধিকারী ব্যক্তিগণের মুক্তিলাভ এবং অনধিকারীদিগের পাপক্ষয় হয়, সুতরাং তীর্থ-যাত্রার পূর্ব্বে জ্ঞাতাজ্ঞাত পাপক্ষয়ের জন্য গঙ্গাস্নানরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া তীর্থ-ভ্রমণ কাহিনীর প্রথমভাগের লিখিত নিয়মানুসারে শুভদিন শুভলগ্নে ঘট স্থাপনা পূর্ব্বক

শুভযাত্রা করিতে হয়। বিশেষতঃ পুরী যাত্রাকালে—রেলওয়ে ষ্টেশনে টিকিট খরিদ করিবার সময় সতর্ক হওয়া উচিত, এবং বিশেষ পরিচিত ব্যক্তি ভিন্ন অপরিচিত ব্যক্তিকে বিশ্বাস করিতে নাই। যে স্থানে যাইতে হইবে, ট্রেণখানি কোন্ সময়ে তথায় পৌঁছিবে, তাহা বিশেষরূপে জানা কর্ত্তব্য জ্ঞান করিবেন। রাত্রিকালে ট্রেণে অবস্থানকালে সাবধানে সময়-অতিবাহিত করিবেন, কেননা, অসাবধানতা বশতঃ নির্দ্দিষ্ট স্থান অতি-ক্রম করিয়া যাইলে কষ্টে পতিত হইতে হয়। তীর্থস্থানে দ্রব্যাদি খরিদ করিবার সময় সতর্ক হইবেন, কারণ অনেক স্থানের অনেক দোকানদারগণ "দালাল" সঙ্গে দেখিলে, দ্রব্যাদির উচ্চ মূল্য লইয়া থাকে। পরিষ্কার গৃহে বাসা এবং নির্ম্মল জল পান করা উচিত। পুরীধামে অনেক কারণে অনেক স্থানে ব্যাধি হইবার সম্ভাবনা আছে; ইহার প্রধান কারণ এই যে, এই পবিত্র ক্ষেত্র—একে গরম দেশ, তাহাতে ইচ্ছামত আহার পাওয়া যায় না আবার কোন যাত্রীকে এখানে রন্ধন করিয়া আহার করিতে নিষেধাজ্ঞা আছে। রাত্রিকালে এদেশে আহারীয় দ্রব্য সকল খরিদ করিবার সময় উত্তমরূপে দেখিয়া লইবেন; দুগ্ধে পূর্ব্বদিনের পচা দুগ্ধ মিশ্রিত থাকে এবং মিষ্ট দ্রব্যের মধ্যেও ঐরূপ ভেজাল দ্রব্য পরিলক্ষিত হয়। পীড়া হইলে অবিলম্বে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা উচিত! সর্ব্বদা সকল বিষয়ে সাবধান থাকা কর্ত্তব্য বিবেচনা করিবেন। ভারতবর্ষ মধ্যে যেখানে যত তীর্থ থাকুক না কেন, পুরীর ন্যায় সমকক্ষ পবিত্র স্থান আর কোথাও দৃষ্টিগোচর হয় না।

পুরী—বড় নীচু স্থান। এখানে সমুদ্রতীরে বালীর পাহাড় থাকায়, নগরের সমস্ত আবর্জ্জনা পরিষ্কাররূপে নিকাশ হয় না। অধিকাংশ ভাড়াটিয়া ঘরের মেজে কাঁচা, বড় জোর দুই হাত উচ্চ, বাড়ীর উঠানের মধ্যস্থানে প্রায়ই একটি নর্দ্দমা থাকে, উহার মধ্য দিয়া যাবতীয় আব-

র্জ্জনা ও ময়লা জল নিকাশ হইয়া বড় রাস্তার ড্রেণে পতিত হয়। সম্প্রতি মিউনিসিপালিটীর সুবন্দোবস্তের গুণে এক্ষণে এই সকল স্থানের অনেক উন্নতি সাধন হইয়াছে, তাই—যাত্রীগণেরও অনেক সুবিধা হইয়াছে। পুরী-সীমা মধ্যে যত ভাল ভাল বড় পুষ্করিণী আছে, তন্মধ্যে বেশীরভাগ-গুলি অত্যন্ত পবিত্র বলিয়া গণ্য। বলা বাহুল্য যাত্রীগণকে এই সকল পুষ্করিণীরই জল পান করিতে হয়।

পুরুষোত্তম যাত্রা করিবার পূর্ব্বে যাত্রীগণ কর্ত্তব্য বোধে নিম্ন-লিখিত দ্রব্যসামগ্রীগুলি যত্নের সহিত সংগ্রহ করিতে অবহেলা করিবেন না যথা;—

সিদ্ধি, গাঁজা, রক্তচন্দন, সাদা চন্দন, যজ্ঞোপবীত ২ কুড়ি, সুপারী বা হরিতকী ২০টা সঙ্কল্পের নিমিত্ত, সিন্দুরচুব্‌ড়ি মায় সাজ ২ দফা, মসলা সাধ্যমতে সংগ্রহ করিবেন, সাড়ী পাঁচ জোড়া প্রমাণ, তিন জোড়া ছোট সাড়ী, গামছা ২খানা, এতদ্ভিন্ন জগবন্ধু, বলভদ্রদেব ও সুভদ্রা দেবীর স্বতন্ত্র পরিধেয় বস্ত্র লইবেন। পঞ্চরত্ন পাঁচ দফা, কর্পূর, আসন-অঙ্গুরী ৫ দফা, নারিকেল ৩টা, বিছানা ও মসারী একদফা, আর অম্ল আচারও কিছু সংগ্রহ করিয়া লইবেন। এতদ্ভিন্ন হারিক্যান ল্যাম্প ১টা, ছোট মজবুত তালা ২টা, ইংরাজী পাই পয়সা, রেজকি প্রভৃতি, যোয়ানের আরক ও ক্লোরোডাইন ১ দফা, এতদ্ব্যতীত সমস্ত দ্রব্যই তথায় পাওয়া যায়।

কলির একমাত্র ত্রাণকর্ত্তা ভগবান্ জগন্নাথদেবজীউর কলিকাতা হইতে দর্শনযাত্রাকালে, পথিমধ্যে নিম্নলিখিত প্রসিদ্ধ তীর্থস্থানগুলির সেবা করিতে সক্ষম হইবেন যথা,—বালেশ্বরে—ক্ষীরচোরা গোপীনাথ জীউ, জাজপুরে—বৈতরণী-তীর্থ, ভুবনেশ্বরে—একাম্রকানন বা অনাদি-লিঙ্গ ভগবান্ ভুবনেশ্বরদেবজীউ, সত্যবাদীনামক গ্রামে—দেবশ্রেষ্ঠ

ভগবান সাক্ষীগোপাল জীউর পবিত্র মূর্ত্তি, পুরীধামে—শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব জীউ, কনারকে—সূর্য্যদেবের মন্দির ইত্যাদি। এখানকার এই সূর্য্যদেবের ন্যায় সুচারু-খচিত অদ্ভুত ও সুন্দর মন্দির পৃথিবীর মধ্যে আর অন্য কোন স্থানে আছে কি না সন্দেহ। মন্দির-গাত্রে প্রস্তর-খচিত বড় বড় সিংহ, হাতী, ঘোড়া, পুরুষ এবং স্ত্রীলোকদিগের যে সকল প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত আছে, সেই শিল্পচাতুর্য্যগুলির শোভা দর্শন করিলে আত্মহারা হইতে হয়, অধিকন্তু দর্শনকালে মনে হয়—সহস্র বৎসর পূর্ব্বের স্থপতিরা ইংরাজ ইঞ্জিনীয়ারদিগের হইতে কত উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। কনারকে—এই সূর্য্যদেবের শ্রীমন্দিরের সৌন্দর্য্য ব্যতীত ইহার জগমোহন, ভোগমণ্ডপ ও মায়াদেবীর মন্দিরের কারুকার্য্য দর্শন পাওয়া যায়। বহুকালাবধি এই প্রাচীন সুন্দর মন্দির-গুলি বালুকাগর্ভে নিহিত থাকিয়া ধ্বংসপ্রায় হইতেছিল, সম্প্রতি মহা-মতি বড়লাট কর্জ্জন বাহাদুরের আদেশে বহু অর্থ ব্যয়সহকারে এই সকল সুন্দর মন্দিরগুলি বালুকারাশি হইতে মান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু বিশ্বেশ্বর ঘোষ মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে পুনরুদ্ধার ও সংস্কৃত হইয়াছে, অন্য তিনটি অর্দ্ধাবস্থায় আছে।

পুরী—উড়িষ্যাদেশের একটি জেলা মাত্র।—ইহার অপর নাম পুরুষোত্তম। ধর্ম্মাত্মা মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নের কৃপায় এখানে ভগবানের দারুমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে—সেই পবিত্র মূর্ত্তি দর্শনের অনিবার্য্য আকাঙ্ক্ষা হিন্দুজাতির জাতীয় চরিত্রের এক প্রধান লক্ষণ। তাই—সমস্ত বৎসর ব্যাপীয়া এখানে দলে দলে ভগবানের পবিত্র মূর্ত্তি দর্শন আশে ভক্তগণ পুরীতে উপস্থিত হইয়া থাকেন।

উড়িষ্যা—পূর্ব্ববঙ্গের দক্ষিণ পশ্চিম দিকে সুবর্ণরেখা নামক নদীর মুখ হইতে চিল্কা হ্রদ পর্য্যন্ত সমুদ্রের কূলবর্ত্তী সমস্ত ভূমিখণ্ড উড়িষ্যা

নামে প্রসিদ্ধ। ইহার পরিধি ২৪০০০ হাজার বর্গ মাইল। সমগ্র বঙ্গদেশের তিন ভাগের এক ভাগ। উড়িষ্যার লোক সংখ্যা ৪১ লক্ষ।

উড়িষ্যা প্রদেশের মধ্যভাগ—জঙ্গলময়, ছোট ছোট পর্ব্বতে পরিপূর্ণ এই সকল স্থানে—বন্য জন্তু সকল নির্ব্বিঘ্নে বাস করিয়া থাকে। উড়িষ্যার প্রকৃত নাম উড্রদেশ, অর্থাৎ উড্রজাতীয় লোকদিগের বাস-স্থান। উড্রদেশের প্রাচীন নাম উৎকল। ইতিহাস পাঠে উপদেশ পাওয়া যায়—১৭৫১ খ্রীষ্টাব্দে এই উৎকল দেশটী মহারাষ্ট্রগণ আপন বাহুবলের পরিচয় দিয়া দখল করেন, তৎপরে পরিবর্ত্তনশীল কালের গতিতে নানা জাতীয় প্রতাপশালী রাজগণের হস্তান্তর হইয়া শেষে ইহা ১৮০৩ খৃঃ ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের অধীন হইয়াছে।

এ অঞ্চলে সমুদ্রের কূলবর্ত্তী স্থানে যাহারা বাস করেন, তাহারা উড়িয়া নামে খ্যাত। এই উড়িয়াদের ভাষা অনেকটা বঙ্গদেশের অনুরূপ। উড়িষ্যাদেশে অধিকাংশস্থানে লোহার কলম দিয়া তালপত্রে জমীদারদিগের হিসাব দাখিলা লিখিত হয়। উত্তর ভারতবর্ষীয় ভাষা সমূহের মধ্যে কেবল উড়িয়া অক্ষরের মাত্রা অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি।

উড়িয়াদিগের মধ্যে অধিকাংশ লোককে, পেটুক, বিদ্যাহীন এবং কুসংস্কারাপন্ন দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ত্তমানকালে ইংরাজরাজের কৃপায় তাঁহাদের অনেকেই উন্নতিলাভ করিতেছে।

এ জাতি অত্যন্ত পয়সা পিশাচ, অর্থাৎ অর্থ উপার্জ্জনের জন্য ইহারা মান অভিমান সমস্তই জলাঞ্জলী দিয়া, কেহ মালি, কেহ বেহারা, কেহ ভিস্তি, কেহ মুটিয়াগিরি, কেহ বা খানসামাগিরি করিতেও কুণ্ঠিত হয় না।

এই উড়িয়াদিগের মধ্যে আবার ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র জাতি আছে। ইহাদের পুরুষগণ— কম বহরের মোটা ও ময়লা

বস্ত্র পরিধান করিয়া থাকে, এবং ধোঁয়াপত্র (চুরুট) খাইতে ভালবাসে। বলাবাহুল্য, পুরুষদিগের ন্যায় ইহাদের স্ত্রীলোকেরাও সদা সর্ব্বদা ১৪ হাত সাড়ী কাপড় পরিধান সত্ত্বেও জানুর উপরিভাগ পর্য্যন্ত দৃষ্ট হইয়া থাকে; আবার কোন কোন স্ত্রীলোক মহারাষ্ট্রীয় রমণীর মত কাছা দিয়া থাকে। এই সকল স্ত্রীলোক এত গহনা পরিধান করিতে ভালবাসে যে, যাহারা গরীব তাহারাও রূপার পরিবর্ত্তে কাঁসার খাড়ু, মল, বাতানা, প্রভৃতি অতি কম একসের ওজনের গহনা ব্যবহার করিয়া থাকে। কর্ণে ও নাসিকার মধ্যে এত অতি ভার অলঙ্কার পরিধান করে যে, সেগুলির ভারে প্রায়ই উহাদের নাসিকা বা কর্ণের ছিদ্র বৃদ্ধি হইয়া থাকে। উড়িয়া পুরুষগণ যেরূপ ধোঁয়াপত্র খাইতে ভালবাসে, ইহাদের স্ত্রীলোকেরাও সেইরূপ অধিক পান ও তৎসঙ্গে খইনী (দোক্তা গুঁড়া) ব্যবহার করিয়া থাকে, অধিকন্তু গাত্রে হরিদ্রা লেপন পূর্ব্বক আপনাপন অঙ্গের সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন করে।

উড়িয়া শূদ্রজাতির মধ্যে কেহ বিধবা হইলে, সে আবার অবাধে তাহার দেবরকে বিবাহ করিতে পারে। ইহাতে কোন দোষ হয় না, কারণ, ইহাই ইহাদের দেশাচার। উড়িয়ারা একদিকে যেরূপ ভীরু, অপরদিকে সেইরূপ লম্পট স্বভাবযুক্ত, এইরূপই দেখিতে পাওয়া যায়।

ভগবান্ জগন্নাথদেবের অনুগ্রহে এই উড়িয়া ব্রাহ্মণজাতির মধ্যে অনেকে পাণ্ডাপদ প্রাপ্ত হওয়ায়, সাধারণে তাঁহাদের সম্মান করিয়া থাকেন।

উড়িষ্যাপ্রদেশটী তিনটি জেলায় বিভক্ত, যথা;—উত্তরে বালেশ্বর, মধ্যস্থলে কটক, দক্ষিণে পুরী অবস্থিত। দেশের দশ আনা অংশ পর্ব্বতময়, ঐ সকল অংশ পর্ব্বতময় জেলা নামে খ্যাত এবং ছোট ছোট করদ রাজার অধীন।

কলিযুগে পূর্ণব্রহ্ম ভগবান পাপীদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য শ্রীশ্রীজগন্নাথরূপে অবনীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। অতএব কলিকালে মনুষ্যমাত্রেরই পূর্ণব্রহ্ম এই ভগবান জগন্নাথদেব জীউর পবিত্র দারুমূর্ত্তির পূজার্চ্চনা করা কর্ত্তব্য। পাণ্ডুবংশীয় অভিমন্যু-পুত্র মহারাজ পরীক্ষিতের স্বর্গারোহণ সময় হইতেই মর্ত্ত্যে কলির শুভাগমন হইয়াছে।

কলি-মাহাত্ম্য।

কলিকালে সত্য, ধর্ম্ম, পবিত্রতা, ক্ষমা, দয়া আয়ু, বল এবং স্মৃতি সকলগুলিই বিনষ্ট হইবে। এই কলিকালে মনুষ্যের ধনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদার্থ এবং ধর্ম্ম নির্দ্ধারণ বিষয়ে ধনই বলবৎ হইবে। কলিকালে রুচি অনুসারে বিবাহ—ক্রয় বিক্রয় হইবে, এবং স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে যাহার রতি-কৌশল অধিক, তিনিই শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিবেন।

ব্রাহ্মণদিগের চিহ্নের মধ্যে কেবল যজ্ঞসূত্রগাছটী গলে শোভা পাইবে; আচার, বিনয়, বিদ্যা প্রভৃতি গুণগুলি তাঁহাদের নিকট হইতে বিদায় লইবে। কলির পণ্ডিতেরা বহু বাক্যব্যয় করিবেন এবং অর্থ-লোভে অন্যায় ব্যবস্থাপত্রও প্রদান করিতে সঙ্কুচিত হইবেন না। কলিকালে—কেশধারণ কেবল সৌন্দর্য্যের জন্য থাকিবে। মনুষ্যগণ সর্ব্বদা শীত, বাত, রৌদ্র, বর্ষা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও ব্যাধি এবং চিন্তার দ্বারা সাতিশয় কষ্ট পাইবে।

মনুষ্যদিগের পরমায়ু ৫০ পঞ্চাশ বৎসর স্থির থাকিবে কিন্তু অধি-কাংশ ব্যক্তিকে ২০।২২ বৎসর বয়সেই মানবলীলা সম্বরণ করিতে হইবে। দেহীদিগের দেহ খর্ব্বাকৃতি ও ক্ষীণ হইবে, তাহারা জাতি-ভেদ বা বর্ণভেদ বিচার করিবে না। কলির প্রতাপে মনুষ্যগণ চৌর্য্য-কার্য্যেই তৎপর হইবে, মিথ্যা ভিন্ন সত্য, ভ্রমেও বলিবে না, অধিকন্ত

পরহিংসা—তাহাদের স্বভাব-সিদ্ধ গুণে পরিণত হইবে। গো-সকল ছাগবৎ খর্ব্বাকৃতি হইয়া অল্প দুগ্ধ প্রদান করিবে; ঘৃতাদিতে পূর্ব্বের ন্যায় গন্ধ ও মিষ্টতা থাকিবে না, এবং বৃক্ষাদিতেও প্রচুর পরিমাণে ফল জন্মাইবে না।

মানবগণ আপনাপন সম্বন্ধীদিগকে পৃথিবীর মধ্যে পরমবন্ধু বলিয়া বোধ করিবে, এমন কি পূজনীয় পিতা মাতা ও গুরুজনের পরামর্শ না লইয়া কেবল ইহাদেরই পরামর্শে পরিচালিত হইবে; এইরূপ আবার কলিকালে ঔষধসকলের গুণ ক্ষীণ হইবে, মেঘ হইতে সুচারুরূপে জল বর্ষিবে না, কেবল বিদ্যুৎ ও বজ্রাঘাত হইবে, মানুষদিগের গর্দ্দভের ন্যায় আচরণ হইবে। বলা বাহুল্য, কলির পূর্ণাবস্থায়—ছল, মিথ্যা, আলস্য, নিদ্রা, হিংসা, দুঃখ, শোক, মোহ, ভয় ও দৈন্যদশার প্রাধান্য হইবে, এতদ্ভিন্ন মনুষ্যগণ ক্ষুদ্রদর্শী, অল্পভোগী, অধিক আহারকারী, অতিশয় কর্ম্মী ও ধনহীন হইবে। কলিকালে সকল স্ত্রীলোকই অসতী হইবে, কেবল গর্ভধারিণী আপন গর্ভজাত পুত্রের নিকট সতীরূপে বর্ত্তমান থাকিবে। কলিরাজের ইচ্ছামত সকলকেই এই সমস্ত পালন করিতে বাধ্য হইতে হইবে;

কলির প্রচণ্ড প্রতাপে—প্রত্যেক নগর ও গ্রাম পাষণ্ড দস্যু-দিগের দ্বারা পরিপূর্ণ অবস্থায় অবস্থান করিবে। কেহ কাহারও অধীন থাকিতে ইচ্ছা করিবে না। মনুষ্যগণ পিত্তল ও কাঁশার পরিবর্ত্তে কেবল লৌহের এনামেল বাসনকে সমাদর করিবে। পূর্ণ কলিকালে রাজা—তাম্রবর্ণের হইবেন। ব্রাহ্মণেরা অত্যন্ত পেটুক হইবেন, অর্থাৎ নিমন্ত্রণ হইলেই তাহারা জাতি বিচার না করিয়া, তথায় গমন করিবেন।

স্ত্রীলোকেরা খর্ব্বাকৃতি ও অধিক ভোজী হইবে এবং বহু সন্তান

প্রসব করিয়া অল্পায়ু ও লজ্জাহীনা অবস্থায় নিরন্তর কটুবাক্য প্রয়োগ করিবে, অধিকন্তু সদা সর্ব্বদা চৌর্য্যছলান্বেষণ করিয়া বেড়াইবে। কলিরাজের ইচ্ছানুসারে স্বামীরা গুরুর ন্যায় স্ত্রী-সেবা করিবে, অর্থাৎ স্ত্রৈণ হইয়া থাকিবে।

শূদ্রেরা ব্রাহ্মণের শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া ধর্ম্ম-চর্চ্চা করিবে এবং ব্রাহ্মণেরা শূদ্রের নিকট ব্যবস্থা লইতে থাকিবেন, তখনই জানিবেন —কলির পূর্ণকাল উপস্থিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, আপনার জীবনে যাহা দেখিবেন, আপনার পুত্র বা পৌত্রের আমলে ঠিক তাহার বিপরীত ভাব দেখিতে থাকিবেন। অন্নকষ্ট, অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টির প্রাদুর্ভাব হইবে; লোকের অন্ন, বস্ত্র, পান, ভোজনের [illegible] থাকিবে না। সামান্য অর্থ লইয়া ভ্রাতৃ-বিচ্ছেদ [illegible] পিতা মাতা, পুত্র, কন্যা ও স্বীয় পত্নীকে প্রতিপালন [illegible] হইবে না। কি স্ত্রী, কি পুরুষ, কি বালক, কি বৃদ্ধ প্রত্যেককেই পরিশ্রম করিয়া আহার সংগ্রহ করিতে হইবে। কপট ধর্ম্ম ও ধর্ম্ম-প্রচারকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে। কলিকালে একমাত্র অন্নদান ও বিদ্যাদান অপেক্ষা ইহার সমকক্ষ আর অধিক পুণ্য, পরিলক্ষিত হইবে না; কিন্তু কলির সেই পূর্ণকালে—দিনান্তে যিনি একটিবার ভক্তিসহকারে হরিণাম উচ্চারণ করিবেন, তিনি নিঃসন্দেহে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্তিলাভ করিতে সক্ষম হইবেন। কলি-মাহাত্ম্য নামক মহাগ্রন্থ পাঠে এইরূপই উপদেশ পাওয়া যায়।

কলিযুগে একমাত্র ত্রাণকর্ত্তা শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব—যিনি ইচ্ছানুসারে লীলাবশে আপন অংশ হইতে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গনামে ধরায় অবতীর্ণ হইয়া কত মহাপাপীকে উদ্ধার করতঃ মানবদিগকে ভবপারের কাণ্ডারী —ভগবান্ শ্রীহরির পদে মতি রাখিতে উপদেশ দান করেন এবং যাব-

তীর্য তীর্থ সকল যথা-নিয়মে পর্য্যটন পূর্ব্বক অবশেষে পুরুষোত্তমে উপস্থিত হইয়া স্বীয় কায়া জগবন্ধুর শ্রীঅঙ্গে মিলিত করিয়া এ ক্ষেত্র —শ্রীক্ষেত্র নামে খ্যাত করেন, যে করুণাময়ের কণামাত্র করুণা প্রাপ্ত হইলে, পতিত জন অক্লেশে মুক্তিলাভ করিতে সক্ষম হয়, সেই পতিতপাবন ভবপারের কাণ্ডারী ভগবান জগন্নাথদেবকে কাহার না দর্শন করিতে ইচ্ছা হয়? শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর নামক মহাগ্রন্থে এ বিষয় স্পষ্টাক্ষরে বর্ণিত আছে।

শাস্ত্র-বল, বেদ-বল, পুরাণ-বল, গীতা-বল সমস্তই মহাপুরুষদিগের উপদেশ। এই কারণে সুধীবৃন্দের প্রীতির জন্য এইস্থানে গুটিকতক সিদ্ধপুরুষ বা মহাত্মাগণের উপদেশ লিপিবদ্ধ হইল;—

মহাপুরুষদিগের উপদেশ-বাক্য সংগ্রহ।

১। ঈশ্বর—যাঁহার কার্য্য, স্বভাব এবং স্বরূপ, যিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বশক্তিমান, নিরাকার, সর্ব্বগুণযুক্ত, জ্ঞানী, সর্ব্বানন্দময়, ন্যায়কারী, দয়াল, যিনি জগতের সৃষ্টি, পালন ও লয়কর্ত্তা অধিকন্তু জীবগণকে যিনি তাহার আপনাপন পাপ ও পুণ্যের বিচার অনুযায়ী যথা-যোগ্য ফল দান করেন, সেই সর্ব্বশক্তিমানই ঈশ্বর নামে কথিত।

২। মুক্তি—যে সকল [redacted] কর্ম্মদ্বারা জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত কষ্টভোগ দ্বারা পরিত্রাণ পাইয়া ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হয় এবং সচ্ছন্দে অবস্থান করিতে পারে উহাই মুক্তি নামে খ্যাত।

৩। সংসার—ইহা ভগবানের পরীক্ষাস্থল। সংসারমাঝে মানবগণ অবস্থান করিয়াও ইহাকে চিনিতে পারেন না; ভগবান মায়ারূপ

এই ভব-সংসারে—মানবদিগকে পরীক্ষার নিমিত্তই পাঠাইয়া থাকেন। অর্থাৎ সংসার—সৃষ্টিকর্ত্তার লীলাস্থান। এ ক্ষেত্রে তিনি নানাভাবে নানাদিকে, নানা স্থানে বিবিধপ্রকার লীলাখেলা করিয়া আপন মহত্ত্ব প্রকাশ করিতেছেন। মা—যেরূপ অবোধ শিশু-সন্তানের করে সুন্দর খেলনা দিয়া ভুলাইয়া রাখেন, ভগবানও সেইরূপ সংসারী মানবদিগকে নানাপ্রকার সুখ সামগ্রী প্রদান করিয়া ভুলাইয়া রাখিয়াছেন, কিন্তু সেই শিশু যখন খেলনা পরিত্যাগ করিয়া মা—মা বলিয়া চীৎকার করে, স্নেহময়ী মাতা, সেই চীৎকার শ্রবণে অস্থির হইয়া সন্তানের নিকট আসিয়া থাকেন—মানবগণও যখন সুখ-সামগ্রী পরিত্যাগ করিয়া শিশুদিগের ন্যায় সরলপ্রাণে ঈশ্বরকে ডাকেন, তখন নিশ্চয়ই তাঁহার চরণে স্থান পাইতে পারেন, অর্থাৎ ধৈর্য্য ধারণ পূর্ব্বক সেই পরম পুরুষ ভগবানের আরাধনা করিলে, যথা-সময়ে তিনি নিশ্চয়ই কৃপা করিবেন।

৪। তীর্থ—জিতেন্দ্রিয় হইতে যে সকল উত্তম কর্ম্ম দ্বারা জীবগণ দুঃখ-সাগর হইতে ঈশ্বরোপাসনা, ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া উদ্ধার হন, সেই সকল কর্ম্মই তীর্থ নামে কথিত।

৫। সাধনা—ফল, ফুল, মূল, দান, চন্দন, পুষ্প দিয়া বিগ্রহদেবকে পূজা করাকে সাধনা বলা যায় না, ভক্তিপুষ্পদ্বারা অর্চ্চনা করিতে না পারিলে সেই সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের শ্রীচরণে স্থান পাওয়া যায় না।

৬। সাধুপুরুষদিগের উপদেশ সকল হৃদয়ঙ্গম পূর্ব্বক পালন করা উচিত, কারণ মহাত্মাদিগের কৃপা ব্যতীত কখন কেহ সিদ্ধ বা ধর্ম্মপথ দর্শন করিতে পারে না।

৭। রক্ত শুদ্ধ থাকিতে থাকিতে চিকিৎসা করা উচিত, রক্ত মন্দ হইলে শরীরকে নষ্ট করে, সেইরূপ সাধুদিগের পবিত্র উপদেশ সকল পালন না করিলে—পাপ হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায় না। প্রমাণ

স্বরূপ দেখুন, যেমন রোগের উপর কুপথ্য করিলে রোগ বৃদ্ধি পায়, সেইরূপ জ্ঞানত পাপ করিলে আত্মার বিনাশ হইয়া থাকে।

৮। অন্ন ও জল রীতিমত ব্যবহার করিলে, দেহে রক্ত হইয়া শরীরকে যেরূপ পুষ্ট করে, মহাত্মাদিগের উপদেশ-বাক্যে সকল পালন করিতে পারিলে সেইরূপ আত্মার পুষ্টি হয়।

৯। ভগবান কৃপা করিয়া রোগ হইতে মুক্ত হইবার নিমিত্ত যেরূপ নানাপ্রকার ব্যবস্থা করিয়াছেন, সেইরূপ পাপ হইতে পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্তও তিনি যে সকল পবিত্র উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, উহা পালন করিলে পাপীগণ—নিশ্চয়ই পরিত্রাণ পাইতে পারে।

১০। অর্থ ব্যয় দ্বারা দেহ রোগের প্রায়শ্চিত্ত হয় সত্য, কিন্তু পাপ রোগের প্রায়শ্চিত্ত কিছুতেই হয় না। পাপ রোগের একমাত্র মহৌষধ—ভগবানের সাধনা।

১১। জন্ম হইলেই মরিতে হইবে। সাধু, পাপী, মহাত্মা, ধনী, দুঃখী, সকলকেই সময় হইলে দেহ ত্যাগ করিতে হইবে। মানবগণ ইহা অবগত হইয়াও কোন উপায় করিতে ইচ্ছা করেন না।

১২। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য—এই ষড়রিপু ও মনকে বশীভূত করিতে না পারিলে ধর্ম্মের পথ দেখা যায় না।

১৩। ক্রোধ—জীবগণের প্রধান শত্রু, ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া মনুষ্য না করিতে পারে, এমন দুষ্কর্ম্ম দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু সেই ক্রোধ উপশম হইলে, মনকে অনুতাপানলে দগ্ধ করিতে থাকে। অতএব ক্রোধে উত্তেজিত হইবার পূর্ব্বে এই সারগর্ভ উপদেশটী স্মরণ করিবেন।

১৪। ধনাহঙ্কারে মত্ত থাকিয়া চিরদিন এইরূপে কাটিবে বিবেচনা

করা ভ্রান্তি মাত্র। অতএব সময় থাকিতে থাকিতে পথ পরিষ্কার করা উচিত।

১৫। কাহারও গলগ্রহ হইয়া বাস করিবে না। কু-লোকের মিষ্ট কথায় তুষ্ট হইয়া আপন কার্য্য ভুলিবে না।

১৬। ধন সম্পদ বা পরাক্রমশালী ব্যক্তির সাহায্যে গর্ব্ব করা উচিত নয়।

১৭। প্রাণের কথা কখনও কাহাকে বিশ্বাস করিয়া ব্যক্ত করা উচিত নয়; কারণ, আজ যিনি সুহৃদ, কালক্রমে সে ব্যক্তি আবার পরম শত্রু হইতে পারে!

১৮। ভবিষ্যৎকে বিশ্বাস করিয়া কাহাকেও আশ্বাস দিবে না, এইরূপ আবার কাহারও আশা, ভরসা ও বাসস্থানে বিঘ্ন ঘটাইতে নাই।

১৭। বিপদ বা দুঃখ যতই হউক না কেন, যে ব্যক্তি কৃতজ্ঞ অন্তরে সমভাবে সকল সহ্য করিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত বুদ্ধিমান।

২০। বিপদ-সময়ে অধীর হওয়া উচিত নয়, কারণ বিপদ কখন একলা আসে না। বলা বাহুল্য, বিপদ সময় অধীর হইলে—জ্ঞান, বল, বুদ্ধি সমস্তই নাশ হয়। বিপদে—শান্ত, নির্য্যাতনে—নীরব থাকিয়া ভগবানের উপর দৃঢ় ভক্তি স্থাপন করাই শ্রেয়। ভুলক্রমে নানা ব্যক্তির নানাপ্রকার পরামর্শে বিচলিত হওয়া উচিত নয়।

২১। জল ও দুগ্ধ এক পাত্রে রাখিলে—উভয়ে মিশ্রিত হয়, ইহা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। সংসার-মাঝে সেইরূপ নানাপ্রকার লোকের সহবাসে মানবের মনকে ধর্ম্মভাব হইতে বঞ্চিত করে, অর্থাৎ তখন সে ব্যক্তি তাহার পূর্ব্ব-বিশ্বাস, উৎসাহ কিছুই জানিতে পারে না।

জল ও দুগ্ধ একত্রে মিশ্রিত হয় সত্য, কিন্তু দুগ্ধকে মাথন করিতে পারিলে, জলের সহিত মিশ্রিত হইবার ভাবনা যায়। সেইরূপ এক-বার শ্রীহরিকে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে—শত বদ্ধ জীবের মধ্যে বাস করিলেও তাহার মনকে নষ্ট করিতে পারে না।

২২। ধনী ব্যক্তির বাটীতে দাসীগণ বেতনভুক্তা হইয়া দাসীত্ব করিয়া থাকে এবং স্বীয় প্রভুর শিশু সন্তানদিগকে মাতার ন্যায় লালন পালন করিতে থাকে, কিন্তু তাহারা উত্তমরূপে অবগত আছে যে—ঐ সকল সন্তানদিগের উপর তাহাদিগের কোন অধিকার নাই। মনুষ্যমাত্রেই সেইরূপ স্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া নিজেদের সন্তানগুলিকে যত্নের সহিত লালন পালন করিয়া থাকেন. কিন্তু তাহাদিগকে নিশ্চয় ভাবিতে হইবে যে. ঐ সকল সন্তান হইতে অন্তিম সময়ে তাহাদের কোন উপকার দর্শিবে না।

২৩। তুমি তোমার পিতামাতাকে যেরূপ ভক্তি শ্রদ্ধা করিবে, তোমার পুত্রেরাও তদনুরূপ করিবে। যে সকল পুত্র, পিতামাতাকে ভক্তি করে না, উহা উহাদের কেবল কর্ম্মফলের ভোগ বলিয়া জানিতে হইবে।

২৪। মনুষ্য পরলোক গমন করিলে কে তাহাদের সহায় বা অনুগামী হয়? একমাত্র কর্ম্মফলই তাহার অনুগমন করিয়া থাকে। ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই তিনটী জীবের ফলস্বরূপ, অতএব ধর্ম্মানুসারে ঐ সমুদয়ের অনুষ্ঠান করা মনুষ্যদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য।

২৩। জল—নারায়ণ স্বরূপ, কিন্তু সকল স্থানের জল পান করা উচিত নয়। ঈশ্বর সকল স্থানেই বিরাজিত, তা বলিয়া সর্ব্বত্রেই তাঁহার দর্শনে সমান ফল পাওয়া যায় না। প্রমাণ স্বরূপ দেখুন—সকল জীবের মধ্যেই ঈশ্বর বিরাজ করিতেছেন, সুতরাং ধরিতে হইবে,

ব্যাঘ্রের মধ্যেও তিনি আছেন, কিন্তু ব্যাঘ্রের সম্মুখে যাওয়া কি উচিত? এইরূপ কু-লোকের মধ্যেও নারায়ণ অবস্থান করিতেছেন, অতএব উহাদের সঙ্গ ত্যাগ করিতে হয়।

২৬। স্প্রীংএর শয্যায় শয়ন করিলে—শয্যা কুঞ্চিত হয় কিন্তু উহা ত্যাগ করিলেই আবার স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়। সংসারী ব্যক্তির মনও যতক্ষণ ধর্ম্ম বিষয় আলোচনা করে, ততক্ষণ তাহার ধর্ম্ম ভাব বৃদ্ধি পায়, কিন্তু মায়া-সংসারে লিপ্ত হইলেই আবার অন্য ভাব আসিয়া থাকে; অতএব মনকে সতত ধর্ম্মপথে রাখিবার চেষ্টা করিবেন।

২৭। অসতী স্ত্রীলোক—স্বামী, পুত্র, কন্যা প্রভৃতি পরিবার বর্গের মধ্যে বাস করিয়া নানাবিধ গৃহকার্য্যে সমস্ত দিন ব্যস্ত থাকিয়াও তাহার মন যেমন সদা সর্ব্বদা উপপতির উপর আকৃষ্ট রাখে, মনুষ্যগণ যদ্যপি সেইরূপ সংসারের বিবিধপ্রকার কর্ম্মে ব্যস্ত থাকিয়াও ভগবানের প্রতি মন আকৃষ্ট করিতে পারেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সে সুখ-সচ্ছন্দে থাকিতে পারে।

২৮। স্ত্রীলোকদিগের নিকট কখন কেহ গুপ্ত কথা প্রকাশ করিবেন না, কারণ তাঁহারা অভিসম্পাত বশতঃ কোন গুহ্য বিষয় গোপন রাখিতে পারেন না; যদ্যপি কোন স্ত্রীলোক কোন গোপনীয় বিষয় জানিবার জন্য কোন পুরুষের নিকট একান্ত জিদ ধরেন, তাহা হইলে তিনি যেন তাহাকে অপর কোন বাক্যে ভুলাইয়া সন্তুষ্ট করেন, কারণ কুরুপাণ্ডবের মহাযুদ্ধ উপস্থিত হইলে মহাবীর কর্ণ —মহারথী অর্জ্জুনের বাণে নিহত হইলে পর, পাণ্ডু-মহিষী কুন্তিদেবী স্নেহপ্রযুক্ত যুধিষ্ঠিরকে সেই মৃত কর্ণের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করিতে অনুরোধ করেন, এবং এই মহাবীর ও মহাদাতা কর্ণই যে তাঁহার

জ্যেষ্ঠ সহোদর, তখন উহা প্রকাশ করেন। ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির জননীর নিকট এইরূপ বিজ্ঞাপিত হইলে—সেই মর্ম্মভেদী বাক্যে অধীর হইয়া নানাপ্রকার বিলাপ করিতে লাগিলেন, অধিকন্তু জননীর উপর অভিমান পূর্ব্বক ক্রুদ্ধ মনে স্ত্রী-জাতিকে এই বলিয়া অভিসম্পাত করিলেন যে, "যদি আমার ধর্ম্মে মতি থাকে, যদি দেব-দ্বিজের প্রতি শ্রদ্ধা ও জননীর শ্রীচরণে আন্তরিক ভক্তি থাকে, তাহা হইলে সেই পুণ্যফলে—আমার এই মর্ম্মভেদী মনস্তাপের জন্য আজ হইতে কোন স্ত্রীলোক আমার কথা মত কখন কোন গোপনীয় বিষয় গুপ্ত রাখিতে সক্ষম হইবে না।" ধর্ম্মপুত্র মহাত্মা যুধিষ্ঠিরের অভিশাপে সেই অবধি কোন স্ত্রীলোক কোন গোপনীয় বিষয় গুপ্ত রাখিতে সমর্থ হন্ না।

২৯। মৃতদেহ চক্ষের অগোচর হইয়া ভস্মীভূত হইলে কর্ম্ম কিরূপে তাহার অনুষ্ঠান করে; এ বিষয়ে সকলেই জিজ্ঞাসা করিতে পারেন! ইহার উত্তর এই যে—পৃথিবী, বায়ু, সলিল, মন, বুদ্ধি ও আত্মা এই সকল প্রাণীর ধর্ম্মাধর্ম্মের সাক্ষী-স্বরূপ, কিন্তু ধর্ম্ম উহাদের সহিত অলক্ষিতভাবে জীবের অনুগমনে প্রবৃত্ত হয়। জীব—পরলোকে স্বর্গ বা নরকভোগ করিয়া পুনরায় শরীর পরিগ্রহ করিলে, তখন পঞ্চভূতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ পুনর্ব্বার উহার শুভাশুভ কর্ম্ম সকল বিচার করিয়া যাহাতে তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়, সেইরূপ বিধান করিয়া থাকেন। প্রমাণ-স্বরূপ "প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ" নামে পরে একটী প্রাচীন উপাখ্যান প্রকাশিত হইল।

কয়েকটী প্রশ্ন ও উত্তরের সার-সংগ্রহ।

প্র। শ্রীমান কে?

উ। সকল বিষয়ে সন্তুষ্ট হয় যে।

প্র। মূর্খ কে?

উ। হিতাহিত বিবেচনা করে না যে।

প্র। অসুখী কে?

উ। পরাধীন বা ঋণগ্রস্ত যে।

প্র। সুখী কে?

উ। অঋণী বা অপ্রবাসী যে।

প্র। উপকারী কে?

উ। যথার্থবাদী ও অসময়ে দয়া করে যে।

প্র। অপকারী কে?

উ। চাটুকার যে।

প্র। দুঃখী কে?

উ। বিষয়ানুরক্ত যে।

প্র। সংসারে ধন্য কে?

উ। পরোপকারী ও ধার্ম্মিক যে।

প্র। শত্রু কে?

উ। আপনার ইন্দ্রিয় এবং জ্ঞাতি কুটুম্ব সকল।

প্র। মৃত্যু কাহাকে বলে।

উ। আপনার অকীর্ত্তিকে মৃত্যু বলে।

প্র। কর্ণহীন কে?

উ। উপদেশ বাক্য না শুনে যে।

প্র। বন্ধু কে?

উ। বিপদে সহায় হয় যে।

প্র। অন্ধ অপেক্ষা অন্ধ কে?

উ। মদনাতুর যে।

প্র। বীর হইতে বীর কে?

উ। কামবানে মত্ত হয় না যে।

প্র। শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার কি?

উ। সৎস্বভাব।

প্র। কোন্ কোন্ ব্যক্তির সহিত সহবাস করিবে না?

উ। মূর্খ, পাপী, নীচ ও খলস্বভাব সম্পন্নদিগের সহিত কখন অবস্থান করিবে না।

প্র। মিত্র হইয়াও শত্রু কে?

উ। পুত্র পরিবারাদি।

প্র। বিদ্যুতের ন্যায় চঞ্চল কি?

উ। ধন, জীবন ও যৌবন।

প্র। অহর্নিশি কি চিন্তা করিবে?

উ। আত্মোন্নতি।

প্র। চোরাবান কাহাকে বলে?

উ। খলব্যক্তির মনের ভাবকে।

প্র। সর্ব্বদা অন্ধকার কোথায়?

উ। মূর্খের হৃদয় মধ্যে।

প্র। বিশ্বাস কাহাকে বলে?

উ। যাহার মূল ও ফল সত্যাশ্রয়যুক্ত।

প্র। উপাসনা কাহাকে বলে।

উ। যাহার দ্বারা ঈশ্বরে—আত্মাকে মনোনিবেশ করা যায়, তাহাকেই উপাসনা বলে।

প্র। পরলোক কাহাকে বলে?

উ। যাহার দ্বারা পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হইয়া পুনর্জন্মে মুক্তি পাইয়া পরম সুখ পাওয়া যায়।

প্র। অপর লোক কাহাকে বলে?

উ। যাহাতে দুঃখভোগ হয়, এবং পরলোকের অনুরূপ ফল দান করে, তাহাই অপর লোক নামে কথিত।

প্র। মরিলে মানুষ ক্রন্দন করে কেন?

উ। ক্রন্দনের ফলে—মৃতব্যক্তির পাপ নাশ হয় বলিয়া।

প্র। জন্ম কাহাকে বলে?

উ। যাহার দ্বারা প্রাণী—দেহের সহিত সংযুক্ত থাকিয়া কর্ম্ম করিতে পারে, তাহাকেই জন্ম বলে।

প্র। জীবাত্মা পঞ্চভৌতিক কলেবর পরিত্যাগ করিয়া কোথায় অবস্থান পূর্ব্বক সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে?

উ। জীবাত্মা স্বীয় কর্ম্মপ্রভাবে প্রথমে রেত—আশ্রয় করিয়া স্ত্রীলোকের গর্ভকোষে প্রবেশপূর্ব্বক যথাকালে ইহলোক সমাগত ও পরলোক গত হয়। এইরূপে মানবগণ স্ব স্ব কর্ম্মপ্রভাবে বারম্বার সংসার চক্র পরিভ্রমণ করিয়া, যমদূতদিগের প্রহার ও বিবিধ যন্ত্রণা সহ্য করিয়া থাকে, তৎপরে সকল প্রাণীকেই জন্মাবধি ধর্ম্মাধর্ম্মের ফলভোগ করিতে হয়।

প্র। পরস্ত্রী সহবাসে রত থাকিয়া অস্থায়ী সুখভোগ অনুভব করিলে কিরূপ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়?

উ। পরস্ত্রী সহবাসে রত থাকিলে—পিতৃপুরুষগণ শ্রাদ্ধকালে

তাহাদের প্রদত্ত কোন দ্রব্য গ্রহণ করেন না, ইহার ফলে তাহাদিগকে অনন্ত যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। পরস্ত্রী গমন, বন্ধ্যানারীতে অনুরাগ বা পরস্ত্রীকে মনমধ্যে স্থান দান, এইরূপ আবার ব্রহ্মস্ব অপহরণ করা এই চতুর্ব্বিধ কার্য্যই তুল্য দোষাবহ বলিয়া কথিত।

প্র। ব্যাভিচার কাহাকে বলে?

উ। স্বীয় পত্নী ব্যতীত অপর স্ত্রীলোকের সহিত সহবাস. ঋতুকালে বীর্য্যদান এবং অত্যন্ত বীর্য্যনাশ; যুবাবস্থা ব্যতীত বিবাহ—এই সকল কার্য্যগুলি ব্যাভিচার নামে প্রসিদ্ধ।

প্র। গুরু কাহাকে বলে?

উ। জন্মদান দিয়া ভোজনাদি প্রদান ও পালন করেন বলিয়া পিতাকে গুরু বলে, আর যে ব্যক্তি সৎ ও সত্য উপদেশ দান করিয়া হৃদয়ের অন্ধকার দূরীভূত করেন, তিনিই গুরু নামে খ্যাত।

প্র। অতিথি কাহাকে বলে?

উ। যে ব্যক্তির গমনাগমনের কোন নির্দ্ধারিত সময় নাই, যে মাহাত্মা সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়া প্রশ্নোত্তর করেন এবং সকলকে উৎসাহ ও সৎ উপদেশ দান করিয়া থাকেন, তাঁহাকেই অতিথি বলে।

প্র। জাতি কাহাকে বলে?

উ। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত ঈশ্বরকৃত যাহা বর্ত্তমান থাকে এবং অনেক ব্যক্তিতে একত্র বাস করিয়া এক ধর্ম্মাবলম্বন পূর্ব্বক জাতি শব্দার্থে গৃহী হয় উহাকেই জাতি বলে।

প্র। কর্ত্তা কাহাকে বলে?

উ। যিনি স্বতন্ত্ররূপে কার্য্য করেন এবং জাতীয় ধর্ম্ম যাহার অধীন, সেই ব্যক্তিই কর্ত্তা নামে খ্যাত।

প্র। মনুষ্য কহাকে বলে?

উ। হিতাহিত বিবেচনা করিয়া, যিনি সকল কার্য্য করেন।

প্র। ধর্ম্ম কাহাকে বলে ?

উ। ঈশ্বরাজ্ঞাপালন, পক্ষপাত শূন্য, লেহ ও সর্ব্বাত্মার মঙ্গল সাধন করা, যাহা প্রমাণ দ্বারা পরীক্ষিত—তাহাই ধর্ম্ম।

প্র। অধর্ম্ম কাহাকে বলে ?

উ। ঈশ্বরাজ্ঞা অগ্রাহ্য করিয়া পক্ষপাত সহিত অন্যায় ও দোষ আশ্রয় লওয়া ও যাহা সাধু ব্যক্তির পরিত্যক্ত উহাই অধর্ম্ম।

প্র। পূজা কাহাকে বলে ?

উ। যিনি জ্ঞান, ধর্ম্মাদিযুক্ত, তাঁহার যথাযোগ্য অর্চ্চনাকে পূজা বলে।

প্র। সৎ ও অসৎসঙ্গ কিরূপ ?

উ। যাহার দ্বারা প্রাণীসকল—মন্দ কর্ম্মে রত হয় তাহাকে কু-সঙ্গ, আর যাহার দ্বারা মিথ্যারূপে সত্যের লাভ হয়—উহা সৎসঙ্গ নামে কথিত।

প্র। পুণ্য কাহাকে বলে ?

উ। বিদ্যা, বুদ্ধি ও শুভগুণের দান এবং সত্য ব্যবহারে অনুষ্ঠান স্বরূপকে পুণ্য বলে।

প্র। পাপ কাহাকে বলে ?

উ। মিথ্যাভাষণাদি কর্ম্মকে পাপ বলে।

প্র। মরণ কাহাকে বলে ?

উ। যে দেহ আশ্রয় করিয়া প্রাণীসকল কর্ম্ম করেন, সময়ে সেই দেহের সহিত জীবের বিয়োগকে—মরণ বলে।

প্র। স্বর্গ কাহাকে বলে ?

উ। প্রাণীর অত্যন্ত সুখ দ্রব্য প্রাপ্তির নাম স্বর্গ।

প্র। নরক কাহাকে বলে?

উ। প্রাণীর অত্যন্ত দুঃখ প্রাপ্তির নাম নরক।

প্র। সৎপুরুষ কাহাকে বলে?

উ। সর্ব্বমঙ্গলকারী, সত্যে রত ও ধর্ম্মাত্মাই সৎপুরুষ নামে কথিত।

প্র। কি ত্যাগ করিলে সুখী হইতে পারা যায়?

উ। কামিনী ও কাঞ্চন ত্যাগ করিলে—সুখী হইতে পারা যায়। শাস্ত্রের বচন এবং বেদের উপদেশ স্ত্রীজাতি—গৃহের অলঙ্কার স্বরূপ এবং লক্ষ্মীস্বরূপিনী। গৃহে স্ত্রী না থাকিলে পুরুষ কখনই সুখী বা সংসারী হইতে পারেন না; এমন কি মানবগণ পিণ্ড প্রাপ্তির আশায় যে পুত্র কামনা করিয়া থাকেন, স্ত্রীকে—ত্যাগ করিলে কিরূপে সেই পুত্রের উৎপাদন হইবে? যে স্ত্রীজাতি—এতগুলি গুণে অলঙ্কৃত, সংসারী মানবদিগের তাঁহাদিগকে সকল সময়ে ও সকল বিষয়ে সন্তুষ্ট রাখা কর্ত্তব্য বিবেচনা করিতে হইবে, কিন্তু ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন সময় "কামিনী ও কাঞ্চন" এই দুইটী পরিত্যাগ না করিলে—পুরুষ কখনই সুখী হইতে পারিবেন না।

প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ।

একদা মহর্ষি নারদ—বীণাযন্ত্রে হরিগুণ গানে বিভোর হইয়া পিলোনা নদীর তীর দিয়া গমন করিতেছিলেন, হঠাৎ তাঁহার চিত্ত চাঞ্চল্য হওয়ায় বিশ্রাম হেতু একটী নির্জ্জন স্থান অনুসন্ধান করিতে করিতে দেখিলেন—একস্থানে নদীকূলোপরি স্বয়ং ব্রহ্মা স্তূপিকৃত কুশরাশি স্থাপন পূর্ব্বক এক মনে দুইগাছি কুশাকর্ষণ করিয়া গাঁইট

বাঁধিয়া সেই নদীতে নিক্ষেপ করিতেছেন। ব্রহ্মার ঈদৃশ কার্য্য দর্শনে নারদ বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে তথায় দণ্ডায়মান হইয়া নানাপ্রকার চিন্তা করিয়াও ইহার নিগূঢ় রহস্য ভেদ করিতে অসমর্থ হইয়া ভক্তি পূর্ব্বক তাঁহার শ্রীচরণ বন্দনা করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে জিজ্ঞাসিলেন, "পিতঃ! আপনি এই নির্জ্জন জনশূন্য তটে বসিয়া কি করিতেছেন জানিবার নিমিত্ত আমার মন বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়াছে, সবিনয় প্রার্থনা—এক্ষণে উপদেশ দানে আমার বাসনা পূর্ণ করুন।"

ব্রহ্মা নারদের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণে অকপটচিত্তে বলিতে লাগিলেন, "বৎস! ইহা আর কিছুই নয়, কেবল কোন্ পুরুষের সঙ্গে কোন্ নারী পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইলে কিরূপ কর্ম্মফল ভোগ করিবে, সেই সকল বিচার পূর্ব্বক সংঘটন করিতেছি—কেননা ইহজন্মে যিনি যেরূপ কর্ম্ম করিতেছেন, তাহাদিগকে সেইরূপই ফলভোগ করিতে হইবে।" বিধাতার নিকট এইরূপ উপদেশ পাইলে নারদের বড়ই কৌতূহল জন্মিল; সুতরাং এবার পুনর্ব্বার ব্রহ্মার কুশবন্ধন নিক্ষেপ সময় তিনি বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাতঃ! আপনি এইমাত্র যে গ্রন্থি প্রদান করিলেন, ইহার মধ্যে স্ত্রীই বা কে আর পুরুষই বা কে এবং নিবাস কোথায়?" তখন বিধাতা স্নেহসহকারে উত্তর করিলেন,—

"নারদ! তুমি যে গ্রন্থির বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছ, উহাদের দু'য়ের মধ্যে কেহই এক্ষণে জন্মগ্রহণ করে নাই।" ব্রহ্মার নিকট এরূপ উত্তর পাইবেন, নারদ ঋষি তাহা পূর্ব্বে একবার কল্পনাও করেন নাই; বলা বাহুল্য ইহাতে তাঁহার কৌতূহল পূর্ব্বাপেক্ষা শতগুণে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল এবং মনে মনে স্থিরপ্রতিজ্ঞা করিলেন যে—যখন এক্ষণে ইহারা জন্মগ্রহণ করে নাই; তখন যাহাতে ইহাদের দুয়ের মধ্যে পরস্পর পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইতে না পারে তাহার নিমিত্ত আমায় বিশেষ

চেষ্টা করিতে হইবে। যদ্যপি চেষ্টা সফল হয়, তাহা হইলে জানিব, ইনি যে সকল গ্রন্থি নিক্ষেপ করিতেছেন বা পরে করিবেন উহা সর্ব্বৈব মিথ্যা। এইরূপ নানাপ্রকার চিন্তা করিয়া নারদ পুনর্ব্বার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "গুরো! যে গ্রন্থি বাঁধিতেছেন, ইহারা কোন্ স্থানে কিরূপ অবস্থায় জন্মগ্রহণ করিবে?" অন্তর্যামী বিধাতা—নারদের মনোভাব অবগত হইয়া বলিলেন, "বৎস! অধিক কিছুই বলিবার নাই, তবে এইমাত্র স্থির জানিও যে—বালকটী গৌরাষ্ট রাজার পুত্ররূপে আর কন্যাটি জম্বুনাদ্বীপের অধিপতি মহারাজ চন্দ্রশেখরের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করিবে।" এইরূপে নারদ বারম্বার নানাপ্রকার কথোপকথন ছলে নিজের অভিষ্ট সিদ্ধ করিয়া তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন।

সময় কাহারও প্রতীক্ষা করেনা, সে আপন মনে একই ভাবে চলিতে থাকে। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর, গত হইল কিন্তু সেই বালক বালিকার বিষয় একবারও নারদের মনকে অধিকার করিল না। কোন সময় বিষ্ণুলোকে নারদ ব্রহ্মাকে দর্শন করিয়া সেই কুশগ্রন্থির বিষয় তাঁহার স্মৃতিপটে উদিত হইল। তখন তিনি এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে রাজা গৌরাষ্ট্রের দ্বারদেশে উপনীত হইলেন এবং অবগত হইলেন যে রাজা এতাবৎকাল অপুত্রক ছিলেন, সম্প্রতি একটী সর্ব্বসুলক্ষণযুক্ত পুত্রলাভ করিয়া তাহার মঙ্গল কামনায় মনের উল্লাসে নানাপ্রকার দান ধ্যান করিতেছেন। ছদ্মবেশী নারদ তখন মনে মনে ভাবিলেন যে, ব্রহ্মা যথার্থই বলিয়াছিলেন, এই বালক বালিকা অদ্যাপি জন্মগ্রহণ করে নাই। এইরূপে বালকের তত্ত্ব অবগত হইয়া জম্বুনাদ্বীপাধিপতির নিকট বালিকার তত্ত্ব সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলেন।

এক দিবস মহারাজ চন্দ্রশেখর তাঁহার প্রিয়তম মহিষীর সহিত

উদ্যানের সরসীতটে সুশীতল মরুত-হিল্লোলে বসিয়া সুখানুভব করিতেছেন, এমন সময় একটী শ্লোক তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। "জিস্‌কা ঝুটামে এত্বে মজা, না জানে সাচ্চামে কেয়া হ্যায়।" এইরূপ শ্রুত হইয়া মহারাজ তৎক্ষণাৎ একজন অনুচরকে আদেশ করিলেন, যিনি ঐরূপ বলিলেন, তাঁহাকে সমাদরে আমার নিকট লইয়া আইস। ভৃত্য রাজাজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া কিয়দ্দূর মাত্র অগ্রসর হইয়া এক দীর্ঘকায় জটাবিশিষ্ট সন্ন্যাসীকে দর্শন করিয়া এবং তাঁহার মুখনিঃসৃত শ্লোকটী অনুমান করিয়া যুক্তকরে তাঁহাকেই রাজ আজ্ঞা জ্ঞাপন করাইল; সন্ন্যাসীও বিনা আপত্তিতে তাহার সহিত রাজ সমীপে উপস্থিত হইলেন। এদিকে সেই তেজপুঞ্জ কায় সন্ন্যাসীকে দর্শন করিয়া দম্পতিদ্বয় যথা বিহিত বিধানে ভক্তিপূর্ব্বক অর্চ্চনা করিয়া তাঁহাকে বিশ্রামের নিমিত্ত আসন প্রদান করিলেন।

ক্রমে নানাপ্রকার কথোপকথনের পর সন্ন্যাসী জানিতে পারিলেন যে রাজার অদ্যাপি কন্যা হয় নাই, তখন তিনি বলিলেন, "মহারাজ! এই অসার সংসার—স্বভাবতঃ শোক দুঃখেই পরিপূর্ণ। ইহার কি বিচিত্রগতি, ধনীই হউন আর নির্ধনই হউন ভবিষ্যত উন্নতির আশা চেষ্টা করিয়া সকলেই এ ক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছেন, এমন কি আমাদিগকেও নানাপ্রকার প্রলোভনে মোহিত করিয়াছে। এরূপ কাহাকেও দেখিতে পাইবেন না যিনি আশার মোহময়ী শক্তিতে ভুলে না। অতএব রাজন্! আপনি সকল দুঃখ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক স্বেচ্ছায় সেই সর্ব্বশক্তিমান শ্রীহরির আরাধনা করুন। তাঁহার কৃপা হইলে—আপনার অদৃষ্টে সন্তানলাভ হইবে সন্দেহ নাই। প্রমাণস্বরূপ দেখুন সমুদ্রমন্থনকালে স্বয়ং বিষ্ণু লক্ষ্মীদেবীকে লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু মহাদেব কালকূট বিষ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন মাত্র। এই বিষয় বিবেচনা

করিয়া দেখিলেই জানা যায় যে—ভাগ্যই সর্ব্বত্র বলবান হয়, বিদ্যাতে বা শক্তিতে কিছুই হয় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বিচার করুন, হরিহর উভয়ে তুল্য হইয়া এক যাত্রায় পৃথক ফললাভ করিয়াছিলেন কেন ?" এইরূপ নানা-প্রকার যুক্তিপূর্ণ উপদেশ বাক্যালাপের পর সন্ন্যাসী বিদায় প্রার্থনা করিলে—মহারাজ নানা অছিলায় বহু সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন, ইত্যবসরে মহিষী—অতিথি সৎকার হেতু পানভোজনের বিবিধপ্রকার উপাদেয় সামগ্রী আয়োজন পূর্ব্বক স্বহস্তে তথায় উপস্থিত হইলেন, এবং কৃতাঞ্জলিপুটে সন্ন্যাসীকে বলিলেন, "যোগীবর ! ভাগ্য-ক্রমে অদ্য আপনার দর্শন লাভ করিয়াছি, কৃপাদানে অদ্য আতিথ্য স্বীকার করিয়া আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন। রাণীর সেই অলৌ-কিক শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে মুগ্ধ হইয়া সন্ন্যাসীর ইচ্ছা না থাকিলেও তিনি তাঁহার আশা পূর্ণ করিলেন, অধিকন্তু মহিষীর বাৎসল্যভাব অবলোকনে প্রীতমনে পিতৃবাক্য স্মরণপূর্ব্বক সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মাতঃ ! তোমার ভক্তিতে আমি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি" এই কথা বলিয়া স্বীয় কমণ্ডলু হইতে একটী সুপক্ক ফল গ্রহণপূর্ব্বক মহিষীর হস্তে প্রদান করিয়া উপদেশ দিলেন, "জননি ! আমার প্রদত্ত এই ফলটী শুদ্ধচিত্তে অতি গোপনে ভক্ষণ করিবেন—আশীর্ব্বাদ করি আমার এই ফল ভোজনের ফল-স্বরূপ—আপনি শীঘ্রই এক পরম রূপলাবণ্যময়ী পদ্মপলাশলোচনা কন্যার মুখ-দর্শন করিবেন।

এদিকে মহিষী সন্ন্যাসীপ্রদত্ত সেই অমূল্য ফল প্রাপ্ত এবং তাঁহার আশীর্ব্বাদ শ্রবণ করিয়া মনে মনে সন্তুষ্ট হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন যে—দৈব-শক্তিকে ধন্য বলিতে হয়, কেননা অসম্ভবকে মুহূর্ত্তেক মধ্যে দৈব ব্যতীত কে সম্ভব করিতে পারে ? এতাবৎকাল পুত্র-মুখ দর্শন আশে কত—বার, ব্রত করিলাম, এক নিমিষের জন্য কখন স্বপ্নেও

ভাবি নাই যে, আমি গর্ভবতী হইব কিন্তু জানি না আজ কোন্ দেব কোন্ ছলে সন্ন্যাসীরূপে অতিথি হইয়া আমার আশা শতগুণে বৃদ্ধি করাইলেন। সন্ন্যাসীপ্রদত্ত এই ফলটী শুদ্ধ-চিত্তে ভক্ষণ করিলে আমি যে কন্যারত্নের মুখ-দর্শন করিব, সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। এইরূপ নানাপ্রকার চিন্তা করিয়া তিনি মনের সুখে পুনরায় পতি-সনে মিলিত হইলেন।

কালক্রমে রাণীর গর্ভ লক্ষণ প্রকাশ পাইল, গগনমণ্ডলস্থ কৃষ্ণবর্ণ মেঘ দেখিয়া একবিন্দু জলের আশায় পিপাসিত চাতকপক্ষী যেরূপ আনন্দিত হয়, মহারাজ চন্দ্রশেখরও মহিষীর গর্ভলক্ষণ দর্শনে সন্তানের মুখদর্শন আশে সেইরূপ দিন গনণা করিতে লাগিলেন। এইরূপে দিনের পর দিন অতীত হইবার পর যথা-সময়ে রাণী এক সর্ব্বসুলক্ষণা কন্যারত্ন প্রসব করিলেন। তাঁহারা আশপথের পথিক হইয়া কন্যালাভ করিলেন বলিয়া ঐ কন্যার নাম—আশাময়ী রাখিলেন।

আশাময়ী দিন দিন মাতৃস্নেহে পরিবর্দ্ধিত হইয়া রাজ-গৃহের শোভা-বর্দ্ধন করিতে লাগিল। নারদের মনে সদাসর্ব্বদা এই বালক বালিকা-দের পরিণয় বিষয় জাগরূপ ছিল, তিনিও যথাসময়ে নানাবেশে রাজ-ভবনে যাতায়াত করিতে লাগিলেন এবং আশাময়ীর সৌন্দর্য্যমাধুরী নিরীক্ষণ করিয়া মনে মনে আশীর্ব্বাদ করিলেন কিন্তু ইহাদের উভয়ের মধ্যে যাহাতে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ না হয় সেই বিষয় চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

কালপ্রভাবে আশাময়ীর বিবাহের সময় উপস্থিত হইল, তখন রাজা চন্দ্রশেখর নানাস্থানে সর্ব্বসুলক্ষণ সুশ্রী পাত্র অনুসন্ধানার্থে ঘটকদিগকে নিযুক্ত করিলেন। নারদঋষি সদাসর্ব্বদা নানাবেশে বালকবালিকাদের

পিতা মাতার নিকট গমনাগমন-পূর্ব্বক বিবিধপ্রকার উপদেশ দিতে পরাঙ্মুখ হইলেন না, কিন্তু নিজের অভিপ্রায় গোপন রাখিলেন। এদিকে ঘটকগণ স্ব স্ব দক্ষতার পরিচয় দিবার নিমিত্ত ব্যস্ত হইয়া ভারতের নানা-স্থানে যাত্রা করিলেন; কেহবা মহারাজ চন্দ্রশেখরের সমকক্ষরাজার পুত্রের সহিত—সম্বন্ধ স্থির করিবার জন্য দিগ্‌দিগান্তর হইতে সংবাদ পাঠাইতে লাগিলেন। জম্বুনাদ্বীপাধিপতি ঐ সকল সংবাদ স্বীয় মহিষীকে শ্রবণ করাইয়া তাঁহার মতামত জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। এইরূপে আশাময়ীর সৌন্দর্য্যের কথা ভারতের সর্ব্বস্থানেই প্রকাশিত হইল। মহিষী সকল পাত্রের গুণাগুণ অবগত হইয়া প্রজা-পতির নির্ব্বন্ধ হেতু তাঁহার অধীনস্থ রাজা গৌরাষ্টের পুত্রকেই মনোনীত করিলেন। মহারাজ চন্দ্রশেখর তখন সন্ন্যাসীর উপদেশ-বাক্য স্মরণ করিয়া স্বীয় অভিলাষ গোপনপূর্ব্বক রাণীকে নানাপ্রকারে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন এবং বলিলেন, "রাজা গৌরাষ্ট আমার অধীনস্থ—অন্যান্য প্রজাগণ যেরূপ আমায় কর প্রদান করে, তিনিও আমায় তদ্রূপ কর দিয়া থাকেন। তুমি স্থির-চিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখ, রাজা গৌরাষ্টের পুত্রকে আমি কন্যা সম্প্রদান করিলে কি মানের লাঘব হইবে না? রাণি! আমার বিবেচনায় রাজা হাস্তদ্বীপাধিপতি সকল বিষয়ে ধনে, মানে, কুলে—আমার সমকক্ষ। এই নিমিত্ত আমি তাঁহার একমাত্র সুশ্রী পুত্রটীকে মনোনীত করিয়াছি। স্নেহের আশাময়ীকে ঐ সৎপাত্রে সম্প্রদান করিতে পারিলে আমার মান ও গৌরব উজ্জ্বল হইবে।"

এতৎশ্রবণে রাণী রাজ-সমীপে নানাপ্রকার যুক্তি তর্ক করিয়া স্বীয় অভিমত জানাইয়া বলিতে লাগিলেন,—"মহারাজ! হাস্তদ্বীপাধিপতি পূজ্যপাদ উত্তানপাদ স্বয়ং বিদ্যা, বুদ্ধি ও ঐশ্বর্য্য-সুখে সুখী—সন্দেহ

নাই ; কিন্তু লোক-মুখে শুনিতে পাই—তাঁহার একমাত্র পুত্রটি মাকাল ফলের ন্যায় সুশ্রী এবং সিমুলফুলের ন্যায় নির্গুণ। কথিত আছে যে, ধনবান্ ব্যক্তিদিগের পুত্রেরা প্রায়ই কু-সংসর্গ-দোষে বিদ্যা ও বুদ্ধিহীন হইয়া থাকে। আপনি বিচার করিয়া দেখুন—ঐ সকল পুত্র যখন অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হয়, তখন তাহারা হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া যে কোনও কুকার্য্যই করিতে কুণ্ঠিত হয় না, এমন কি স্বীয় জন্মদাতা পিতা মাতাকেও ঘৃণার চক্ষে দেখে, আপন পত্নীকে বিনা দোষে পরিত্যাগ করিয়া পরস্ত্রীতে আসক্ত হয়, চাটুকারদিগের প্রলোভনে—মান, সম্ভ্রম সমস্তই নষ্ট করে, সেই সকল ব্যক্তি যখন নিজেই সুখী হইতে পারে না, তখন আপন পত্নীকে কিরূপে সুখী করিবে ?

আমার আশাময়ী যখন আপনার অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী—তখন ঐশ্বর্য্যের দিকে দৃষ্টি না করিয়া যাহাতে সেই স্নেহের আশা সর্ব্বপ্রকারে সুখী হইতে পায়, তাহারই ব্যবস্থা করুন। আমার বিবেচনায় গৌরাষ্ট রাজার সর্ব্বগুণসম্পন্ন কোটি-কন্দর্প-অনুপম রূপ-লাবণ্যযুক্ত পুত্রসম আশাময়ীর উপযুক্ত পাত্র আর পাওয়া যাইবে না ! স্বামিন্ ! যদ্যপি অধিনীর প্রার্থনা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করেন, তাহা হইলে গৌরাষ্ট-রাজপুত্রের সহিত কন্যাটীর বিবাহ স্থির করুন, নচেৎ যাহা ভাল হয় করিবেন, দাসীর মতামতের কোন অপেক্ষা করিবেন না।”

মহারাজ চন্দ্রশেখর মহিষীর যুক্তিপূর্ণ উপদেশ বাক্যে মনে মনে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন, কিন্তু নারদের কুহকে বাধ্য হইয়া পূর্ব্বসংকল্প অনুসারে হাস্তদ্বীপাধিপতির পুত্রের সহিত আশাময়ীর শুভবিবাহ সম্পূর্ণরূপে স্থির করিলেন। বলা বাহুল্য সেই দিবস হইতে তাঁহার রাজ্যমধ্যে উৎসবের স্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল।

এক্ষণে মহিষী মহারাজের কার্য্যকলাপ দর্শন করিয়া মনে মনে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। এদিকে কর্ম্মসূত্র প্রজাপতির আজ্ঞায় রাণীর সহায় হইল, ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা ব্যতীত কোন বিষয় সম্পন্ন হয় না। একদিকে নারদঋষি প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, যাহাতে গৌরাষ্ট রাজার পুত্রের সহিত বিবাহ না হয়, অপরদিকে কর্ম্মসূত্র মহিষীর সহায় হইয়া উক্ত রাজ-পুত্রেরই সহিত বিবাহের স্থির হইল; এই প্রকারে তাহাদের উভয়ের মনের মধ্যে যুদ্ধ চলিতে লাগিল।

ইহার ফলে মহিষী বুদ্ধিবলে রাজার চেষ্টা ব্যর্থ করিবার জন্য স্বীয় কন্যার একখানি অলেখ্যসহ আপন অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া অতি গোপনে গৌরাষ্টরাজার পুত্রের নিকট প্রেরণ করিলেন। রাজপুত্র সেই পত্রে রাজ্ঞীর নানাপ্রকার উৎসাহ বাক্যে আরও যৌবন স্বভাব হেতু রাজ-কন্যার অপরূপ রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করিলেন।

অপরদিকে হাস্তদ্বীপাধিপতি বিবাহের দিন সমাগত দেখিয়া স্বীয় সৈন্যসামন্তে পরিবেষ্টিত হইয়া পুত্রের সহিত জম্বুনাদ্বীপাধিপতি রাজা চন্দ্রশেখর ভবনে অতি সমারোহে বিবাহের জন্য শুভযাত্রা করিলেন। তখন নারদঋষির আনন্দের সীমা রহিল না; তিনি একবার পাত্র ও একবার পাত্রীর বাটীতে গমনাগমন করিতে লাগিলেন। যথাসময়ে বিবাহ দিবসে হাস্তদ্বীপাধিপতি সদলে রাজা চন্দ্রশেখরের রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন। বলা বাহুল্য তাঁহাদের শুভাগমনে মহারাজ চন্দ্রশেখর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া স্বীয় রাজধানীর প্রান্তভাগে অভ্যর্থনাপূর্ব্বক বিশ্রাম-স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। বিশ্রামের পর হাস্তদ্বীপাধিপতিসহ সকলেই জম্বুনাদ্বীপের মনোমুগ্ধকর স্থান সকল পরিদর্শন করিতে লাগিলেন।

অপরাহ্নকালে তিমিরবসনে অবগুণ্ঠণবতী হইয়া সন্ধ্যাসতী পৃথিবীতে

অবতীর্ণা হইবার উপক্রম করিতেছেন দর্শনে গৌরাষ্ট পুত্র আশায়—পূর্ণ হৃদয়ে মহারাজ চন্দ্রশেখরের কন্যার পাণিগ্রহণে উত্তেজিত হইলেন, এবং মহারাণীর উপদেশ মত রাজধানীর প্রান্তভাগে নদীর তটে—ষষ্ঠিদেবীর দেবালয়ের সন্নিকটে উপস্থিত হইবার সময় পথিমধ্যে এক স্থানে একটী ব্রাহ্মণকে দর্শন করিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। বলা বাহুল্য এই সময় নারদঋষি এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বেশে কিরূপে ইহাদের বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হয়, উহা দেখিবার জন্য ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছিলেন। ইত্যবসরে সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বেশধারী নারদ সহসা এখানে এই শুভ সন্ধ্যার সময়, গৌরাষ্ট রাজার পুত্রকে দেখিয়া মনে মনে চিন্তিত হইয়া, তাহার সহিত নানাপ্রকার প্রশ্নোত্তরে জানিতে পারিলেন যে, যদিও আশাময়ীর ভার্ত্তা বহু দুরদেশ হইতে এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, তথাপি রাণীর কৌশলে সেই রাজকন্যারই সহিত ইহাদের গুপ্তভাবে পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন হইবে; চিন্তারূপ তরঙ্গ তথন নারদের মনেরমধ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে আরও আকুল করিল। অবশেষে মনে মনে নানাপ্রকার তর্কবিতর্ক করিয়া তিনি নিজমূর্ত্তি ধারণ করতঃ খগরাজ গরুড়কে স্মরণ করিলেন।

স্মরণমাত্র গরুড় কৃতাঞ্জলিপুটে নারদসমীপে উপস্থিত হইয়া কহিল, "ঋষিবর! আপনার কোন্ আজ্ঞা পালন করিতে হইবে অনুমতি করুন? এই সময় দেবগণ, অপ্সরাগণ, গন্ধর্ব্বগণ পিতাপুত্রের মহাযুদ্ধ দেখিবার জন্য অন্তরীক্ষে উপস্থিত হইলেন। এদিকে নারদ নানাপ্রকার চিন্তা করিয়া পক্ষীরাজ গরুড়কে অনতিবিলম্বে মনুষ্যের অগম্য স্থান সুমেরু পর্ব্বতের গহ্বর মধ্যে ঐ গৌরাষ্টপতির পুত্রকে রাখিয়া আসিতে অনুমতি করিলেন।

রাজকন্যার বিবাহ উপলক্ষে রাজাজ্ঞায় ভক্তপ্রজাগণ প্রশস্ত রাজপথ

গুলি আলোকমালা ও পুষ্পপতাকাদিতে অপূর্ব্বসাজে শোভিত করিয়াছিলেন, গৌরাষ্ট্র রাজপুত্র প্রফুল্ল মনে তাহাই দেখিতেছিলেন, তাহার নিজের অদৃষ্টে কি ঘটিবে উহা কিছুই অবগত ছিলেন না। এমন সময় গরুড় পক্ষী হঠাৎ তাহাকে ধরিয়া সেই পর্ব্বতের শিখরদেশে উচ্চ গহ্বরে স্থাপন-পূর্ব্বক নারদসমীপে যথাযথ নিবেদন করিলেন।

কর্ম্মসূত্রের গতি কে রোধ করিতে পারে, গরুড়ের বাক্যে নারদের মনে দয়ার সঞ্চার হইল; সুতরাং তিনি মনে মনে দুঃখিত হইয়া খগপতিকে পুনর্ব্বার সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "গরুড়! আমি তোমার প্রতি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি সন্দেহ নাই; কিন্তু এক্ষণে তোমায় আর একটী কর্ম্ম করিতে হইবে—যাহাকে তুমি এইমাত্র পর্ব্বতের গুহার মধ্যে স্থাপন করিয়া আসিলে, উহার ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারণের উপায় তোমাকেই করিতে হইবে; অতএব যে কোন স্থানে প্রচুর পরিমাণে খাদ্য সামগ্রী নয়নগোচর করিবে, তুমি স্বীয় বাহুবলে উহা সংগ্রহ করিয়া তাহার নিকট রাখিয়া এস। আদেশ প্রাপ্তে পক্ষীরাজ আকাশমার্গে উড্ডীয়মান হইয়া নারদের ইচ্ছানুরূপ খাদ্যসামগ্রী অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।

নারদ ঋষি এইরূপে নিষ্কণ্টক হইয়াও নানাপ্রকার দুশ্চিন্তায় কাতর হইলেন এবং যাহাতে শুভলগ্নে চন্দ্রশেখরের কন্যার সহিত হাস্তদ্বীপাধিপতির পুত্রের শুভপরিণয় নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হয় তাহারই চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

এতক্ষণ তিমির বসনাবৃত প্রকৃতিদেবী তাঁহার অবগুণ্ঠন উত্তোলন পূর্ব্বক নারদ ঋষির সহিত কার্য্যকলাপ অবলোকন করিতেছিলেন, এক্ষণে অতিশয় বিষন্নবদনে পুনরায় অবগুণ্ঠিত হইলেন।

এদিকে রাজমহিষী প্রকৃতিদেবীর ভয়ে স্বীয় অভিলাষ পূরণ করিতে পারেন নাই। এই সময় উপযুক্ত অবসর পাইয়া ষষ্ঠীপূজা উপলক্ষে

উপাদান সকল সংগ্রহ করিতে লাগিলেন এবং যে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন উহা চিন্তা করিয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলেন; অবশেষে এক উপায় স্থির করিয়া পরিচারিকাকে আদেশ প্রদান করিলেন যে,"মহারাজ যেখানেই থাকুন না কেন, তুমি শীঘ্র তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বলিবে"। আদেশ প্রাপ্তে দাসী রাজ-সমীপে যথাযথ নিবেদন করিল; তখন মহারাজ সকল কার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক অস্থিরচিত্তে একবার মহিষীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলেন।

এদিকে রাজ্ঞী সমাগত মহারাজকে সাদর অভ্যর্থনা করিয়া বলি-লেন, "স্বামিন্! আমি বিবাহের সময়—আশাময়ীর শুভ কামনায় ষষ্ঠীদেবীর পূজা মানসিক করিয়াছিলাম; অদ্য প্রজাপতির কৃপায় সেই শুভ সময় উপস্থিত—পূজার আয়োজন সমস্তই প্রস্তুত, কেবল আপনার অনুমতির অপেক্ষা করিতেছি"।

মহারাজ চন্দ্রশেখর পূর্ব্ব হইতেই জানিতেন যে, মহিষীর দেবদেবীর প্রতি ঐকান্তিক ভক্তি ও বিশ্বাস আছে, এই নিমিত্ত সময় মত তিনি যখন তখন দেবস্থানে মানত করেন; যাহাহউক এক্ষণে রাণীকে সন্তুষ্ট রাখি-বার জন্য তিনি বলিলেন, "রাণি! আজ যদি বিবাহ কার্য্যে এত ব্যস্ত না থাকিতাম, তাহা হইলে স্বয়ং আমিও তোমার সহিত মিলিত হইয়া দেবীস্থানে গমন করিতাম; এক্ষণে যাহাতে পূজার কোনরূপ ক্রটি না হয় সে বিষয় যত্নবান হও।"

রাজা মহিষীকে এইরূপ উপদেশ দিয়া রাজসভায় প্রস্থান করিলেন। এবার রাণী স্বাধীনভাবে অনুচরবর্গকে আদেশ করিলেন, তোমাদের মধ্যে একজন সত্বর পুরোহিত ঠাকুরকে সঙ্গে লইয়া নদীতটে ষষ্ঠীদেবীর দেবালয়ে গমন কর, আর এই যে সুবৃহৎ নৈবেদ্যখানি

দেখিতেছ—উহা সাবধানে আমার সহিত দেবীস্থানে লইয়া আইস। এইস্থানে একটী কথা বলিবার আছে, পূর্ব্ব হইতে রাজ্ঞী স্বহস্তে এই নৈবেদ্যখানি প্রস্তুত করিয়া তন্মধ্যে তাঁহার স্নেহের পুত্তলি আশাময়ীকে এরূপভাবে লুক্কাইত করিয়া রাখিয়াছিলেন যে, কেহই এ রহস্য ভেদ করিতে সক্ষম হয় নাই, আবার যাহাতে কন্যাটীর নিশ্বাস প্রশ্বাস সহজে প্রবাহিত হইতে পারে তজ্জন্য তাহার উপর একটী ঝুড়ি ঢাকা দিয়া নানাস্থানে ছিদ্র রাখিয়া তৎপরে আতপ তণ্ডুল ফল, ফুল মিষ্টান্ন প্রভৃতির দ্বারা স্তরে স্তরে সজ্জিত করিয়া দিয়াছিলেন। এইরূপে দেবীপূজার ভাণ করিয়া মহিষী গুপ্ত ভাবে স্বীয় কন্যার শুভবিবাহ দিবার নিমিত্ত শুভযাত্রা করিলেন।

প্রজাপতির নিয়ম লঙ্ঘন কে করিতে পারে ? এদিকে খগরাজ—নারদের উপদেশ মত রাজপুত্রের আহার সংগ্রহের জন্য আকাশমার্গে বিচরণ করিতে করিতে ঐ সুবৃহৎ নৈবেদ্যখানি দেখিবা মাত্র ছোঁ মারিয়া উহা সেই অত্যুচ্চ পাহাড়ে, যথায় রাজপুত্র অবস্থান করিতেছিলেন, তাহার একস্থানে স্থাপনপূর্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। বলা বাহুল্য এই দুর্ঘটনায় সকলেই হাহাকার করিতে লাগিলেন।

দিনমনি অস্তমিত হইলে সুধাংশুদেব সুনীল—অম্বরমাঝে তারকারাজি পরিবেষ্টিত হইয়া বসুধা-বক্ষে কিরণমালা বিকীর্ণ করিলেন। আহা, নিয়মের কি বিচিত্রগতি! গৌরাষ্ট রাজপুত্র সেই জনশূন্য উচ্চ পাহাড়ের গহ্বরে কিরূপে আহার সংগ্রহ করিবেন হতাশপ্রাণে চন্দ্রালোক প্রাপ্ত হইয়া তাহারই চেষ্টায়—চারিদিক পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন এবং আপন অদৃষ্টের বিষয় ভাবিতেছেন, এমন সময় হঠাৎ এই অভিনব ব্যাপার সংঘটিত হওয়ায় তিনি বিস্ময় বিস্ফারিতনেত্রে ক্ষুধায় কাতর হইয়া ঐ ভোজ্য সামগ্রীগুলির প্রতি দৃষ্টি করিতে লাগিলেন।

অপর দিকে আশাময়ী বহুক্ষণ অবধি আচ্ছাদিত থাকায় এ বিষয়ের কিছুই জানিতে পারেন নাই। তিনি অতিশয় ক্লান্ত হইয়া কোনরূপ জনরব না পাওয়ায় এক্ষণে ভীতমনে ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন। তখন রাজপুত্র সেই নৈবেদ্য মধ্য হইতে বামাকণ্ঠবিনিঃসৃত ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণে প্রথমে স্তম্ভীত হইলেন কিন্তু পরক্ষণেই সাহসে নির্ভর করিয়া সেই তণ্ডুল-রাশি অপসারিত করিয়া দেখিলেন যে—এক অনুপম রূপলাবণ্যময়ী বালিকা তন্মধ্যে বিরাজ করিতেছেন। তাহারা এইরূপে উভয়ে উভয়ের প্রতি শুভদৃষ্টি করিবামাত্র স্বর্গ হইতে দেববালাগণ পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। জন্মাবধি তাঁহারা কখন পুষ্পবৃষ্টি কাহাকে বলে তাহা জানিতেন না, সুতরাং উহার বিষয় কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। বালিকা কিরূপে কাহার দ্বারা অপহৃত হইয়া এই অত্যুচ্চ নির্জ্জন পাহাড়ের উপর উপস্থিত হইলেন, রাজপুত্র মধুর বচনে প্রথমেই তাহাকে এই প্রশ্ন করিলেন।

আশাময়ী এবার রাজপুত্রের প্রশ্নের উত্তর দিবার নিমিত্ত অকপট চিত্তে আদ্যোপান্ত সমস্ত বিষয় প্রকাশ করিল। বালিকার সেই মুখনিঃসৃত অমৃতময় কথাগুলি শ্রবণ করিয়া রাজপুত্র নিকটস্থ আলেখ্য-খানি তাহার হস্তে দিয়া বলিলেন—"এই পত্রখানি কাহার বল দেখি?" বালিকা অনিমেষ নয়নে বারম্বার উহার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "আমার এই লিপিপত্র কিরূপে কোথায় সংগ্রহ করিলেন, আর কি অভিপ্রায়েই বা আপনি এই নির্জ্জন গিরি গহ্বরে অবস্থান করিতেছেন?" তখন রাজপুত্রও এই ঘটনার বিষয় সমস্ত প্রকাশ করিয়া সকল দুঃখের অবসান করিলেন। এইরূপে উভয়ে—উভয়ের সহিত পরিচিত হইয়া সেই সুবৃহৎ নৈবেদ্য হইতে দেবীপূজার পুষ্পমালা উত্তোলন করিয়া পরস্পরে বদল পূর্ব্বক সুখী হইলেন অর্থাৎ প্রজাপতির

নির্ব্বন্ধ হেতু এইরূপে তাহাদের গন্ধর্ব্ব মতে বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইল।

অপরদিকে মহর্ষি নারদ—হাস্তদ্বীপাধিপতির নিকট হইতে পুনরাগমন পূর্ব্বক যাহা শ্রবণ করিলেন—তাহাতে আর তাঁহার বুঝিবার কিছু বাকি রহিল না; তথাপি তিনি সন্দেহ মোচনার্থ একবার যোগাবলম্বনে দেখিলেন যে—এই নবীন দম্পতি মনের সুখে পর্ব্বতোপরি নির্জ্জন গহ্বরে বসিয়া কথোপকথন করিতেছেন। তখন ঋষিবর নিজের ধৃষ্টতা বুঝিতে পারিয়া প্রজাপতি ব্রহ্মার স্তবে মনোনিবেশ করিলেন।

তৎপরে নারদ আবার অবসর মত একখানি অতি জীর্ণ পুঁথি বগলে স্থাপনপূর্ব্বক এক বৃদ্ধ গণতকারবেশে রাজসভায় উপস্থিত হইলেন এবং শোকাতুর রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নিরুদ্দিষ্ট রাজকন্তাসহ রাজপুত্রের উদ্ধার সাধন তৎসঙ্গে ইহার নিগূঢ়তত্ত্ব প্রকাশ পূর্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

মহারাজ চন্দ্রশেখর এক্ষণে গৌরাষ্ট্র রাজপুত্রের নিকট আদ্যোপান্ত সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া প্রজাপতির মহত্বগুণে এই সকল সংঘটন হইয়াছে স্থির জানিতে পারিয়া—গৌরাষ্ট্র রাজাকে স্বরাজ্যে আনয়ন করাইলেন এবং শুভদিনে শুভলগ্নে মহাসমারোহে তাহাদের উদ্বাহ কার্য্য সম্পন্ন করাইয়া মনের সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

এই উপাখ্যানটী উপদেশ দিতেছে—যিনি যেরূপ কর্ম্ম করিবেন, তাহার সেইরূপ ফলাফল বিচার করিয়া ভগবান পরীক্ষার নিমিত্ত পুনর্ব্বার তাহাকে সংসারক্ষেত্রে পাঠাইয়া থাকেন, অতএব ঐশ্বর্য্যসুখে মত্ত না হইয়া সেই সর্ব্বশক্তিবান ঈশ্বরকে নিত্য স্মরণ করিবেন।

দক্ষিণ-তীর্থে

বালেশ্বর গ্রামে ভগবান ক্ষীরচোরা গোপীনাথ জীউর দর্শন-যাত্রা।

কলিকাতা হইতে এই গোপীনাথ জীউর দর্শন ইচ্ছা করিলে, যাত্রীদিগকে বেঙ্গল নাগপুর রেল-যোগে—বালেশ্বর নামক ষ্টেশনে অবতরণ করিতে হয়। হাওড়া হইতে বালেশ্বর ১৪৪ মাইল দূরে অবস্থিত। বালেশ্বর উড়িষ্যা দেশের একটি জেলা মাত্র। এখানে বুড়াবলঙ্গ ও সুবর্ণরেখা—এই দুইটী নদীই প্রধান, কিন্তু এই দুই প্রধান নদী ব্যতীত বালেশ্বরে অনেকগুলি ছোট খাট নদী দেখিতে পাওয়া যায়। যাবতীয় নদীগুলি প্রায় ছয়মাস কাল শুষ্কাবস্থায় থাকে, বর্ষা সমাগমে উহারা আপনাপন ক্ষমতানুসারে ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া দর্শক মাত্রেরই প্রাণে আতঙ্ক উপস্থিত করে।

বালেশ্বরের প্রধান রাস্তা কটক রোড। ইহার অন্তর্গত রেবুনা গ্রামে কাঁশার উৎকৃষ্ট বাসন ও পিত্তলের খেলনা প্রস্তুত হইয়া থাকে। এ প্রদেশে যে সকল মাটীর সুন্দর সুন্দর খেলনা ও পুতলী বিক্রয় হইয়া থাকে, সে সমস্তগুলি প্রথমতঃ দেখিলেই কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তর-নির্ম্মিত বলিয়া ভ্রম হয়। বালেশ্বর দেশটী দেখিতে বেশ সুশ্রী ও স্বাস্থ্যকর। অনেক বহুমূত্র রোগী এই স্থানে আসিয়া উক্ত রোগ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন।

বালেশ্বরে বাজার বসিবার সময়—প্রত্যহ অপরাহ্ন কাল হইতে রাত্রি ৮ ঘটিকা পর্য্যন্ত নিরূপিত আছে। এই নির্দ্দিষ্ট সময় অতীত হইলে স্থানীয় দোকানীদের নিকট যে কোন দ্রব্য চাহিবেন "সব চলি গলা" শব্দ শুনিতে পাইবেন, অর্থাৎ সমস্তই বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। এখানকার বাজারে যে সমস্ত দ্রব্য সামগ্রী অর্থাৎ ফল মূল, শাক এবং ঘৃত দুগ্ধ প্রভৃতি বিক্রয় হয়, ঐ সকল দ্রব্য সহর কলিকাতা অপেক্ষা অনেক সুলভ মূল্য বলিয়া অনুমান হয়; বলা বাহুল্য এই বাজারে ইতস্ততঃ বিচরণ করিবার সময়—স্থানীয় অধিবাসীদিগের নিকট কত দ্রব্যের কত নূতন নাম শুনিতে পাইবেন তাহার ইয়ত্তা নাই। সহরে—আমরা যে ফলকে কাঁটাল বলিয়া জানি—এখানে সেই কাঁটাল "পানসো" নামে প্রসিদ্ধ; এইরূপ আবার আনারসকে—সপুরী, পেয়ারাকে—আমরুত, শশাকে—কাঁরা, গুপারীকে—গুয়া, সিন্দুরকে ঝুড়া ইত্যাদি।

সন্ধ্যার পর এই বাজারের সম্মুখভাগে যে প্রশস্ত রাজপথ আছে, সেই রাস্তার চতুর্দ্দিকে—চা, রুটি, সরবৎ ও অপরাপর নানা প্রকার দ্রব্য সামগ্রীর দোকান সকল সজ্জীকৃত করিয়া স্থানীয় দোকানীরা ইহার শোভা আরও বৃদ্ধি করিয়া থাকে। আমরা অল্প সময়ের জন্ত এখানে যতক্ষণ ছিলাম, ততক্ষণই নানাপ্রকার বিদেশী ভাষা শ্রবণ করিয়া আহ্লাদিত হইয়াছিলাম। বালেশ্বরে মিষ্টান্নের মধ্যে "খাজা" অতি সুস্বাদু ও বিখ্যাত। এখানে যে সকল বাঙ্গালী বাস করেন, তাহাদের অধিকাংশ ভাষা—উড়িয়াদের স্থায় শুনিতে পাওয়া যায়।

চুঁচুড়া নিবাসী স্বর্গীয় পদ্মলোচন মণ্ডল এখানকার জমিদার, এক্ষণে সেই মহাত্মার অবর্ত্তমানে তাঁহার বংশধরগণ সদলে উপস্থিত থাকিয়া সুখ্যাতির সহিত বিষয় কর্ম্ম পরিচালনা পূর্ব্বক পূর্ব্বপুরুষদিগের মান রক্ষা করিতেছেন। আমরা বালেশ্বর ষ্টেশনে উপস্থিত হইবা মাত্র,

ঘোঁড়ার গাড়ীর সাহায্যে সহরের মধ্যে দুই ক্রোশ পথ অতিক্রম পূর্ব্বক একস্থানে এই জমিদার মহাশয়দের বসতবাটীতে আশ্রয় লইয়াছিলাম। বালেশ্বরে বীরহনুমানের উপদ্রব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দেখিতে পাওয়া যায়।

এ সহরে রথ-যাত্রা উৎসব মহা-সমারোহে সম্পন্ন হয়, সেই সময় নিকটস্থ গ্রামের অধিবাসীগণের একত্র সম্মিলনে এই নগর এক অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করে। বলা বাহুল্য, আমরা সকলে বালেশ্বরে দুই দিবস অবস্থান করিয়া সহরের শোভা দর্শন করিলাম, তৎপর-দিবস প্রত্যুষে যথা-সময়ে গরুর গাড়ীর সাহায্যে সহরের দক্ষিণদিকে যে পাকা বাঁধা রাস্তা ষ্টেশন অতিক্রম পূর্ব্বক প্রসারিত হইয়াছে, সেই রাস্তার উপর দিয়া শ্রীশ্রী৺ক্ষীরচোরা গোপীনাথজীউর দর্শন আশে শুভ যাত্রা করিলাম। এইরূপে প্রায় ছয় মাইল পাকা রাস্তা অতিক্রম করিয়া আবার প্রায় এক মাইল মেটে পথ অগ্রসর হইবার পর একটি সুন্দর শিব-মন্দির নয়ন-গোচর হইল; তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া এক লিঙ্গমূর্ত্তির দর্শন পূর্ব্বক নয়ন ও জীবন সার্থক বোধ করিলাম; এই লিঙ্গ-মূর্ত্তিটী মৃত্তিকার নীচে এক গহ্বর-মধ্যে অবস্থিত। স্থানীয় পূজরীর নিকট উপদেশ পাইলাম—এই লিঙ্গরাজ পাষাণ ভেদ পূর্ব্বক ঊর্দ্ধে হস্তপ্রমাণ জাগরূপ থাকিয়া ভক্তগণকে দর্শন দানে উদ্ধার করিতেছেন। দেবালয়ের সম্মুখ ভাগে বিস্তর মালাকারের দোকান শোভা পাইতেছে। এই সকল দোকানগুলির মধ্যে আমরা একটী দোকান হইতে সাধ্যমত বিল্বপত্র পুষ্প, সিদ্ধি, গাঁজা ও দুগ্ধ সংগ্রহ করিয়া যখন আশুতোষের অর্চ্চনায় রত হইলাম, তখন এক আশ্চর্য্য ঘটনা দর্শন করিলাম—যে সময় ভগবানের মস্তকে সিদ্ধি মিশ্রিত দুগ্ধজল প্রদান করিলাম, সেই সময় মাত্র গুটি-কয়েক ভুড়ভুড়ি কাটিয়া দুগ্ধটুকু অন্তর্হিত হইল এবং সিদ্ধি ও জলটুকু

পৃথক অবস্থায় বাহির হইয়া গেল। লিঙ্গরাজের এই অদ্ভুত মহত্ত্ব দর্শনে সকলকেই চমৎকৃত হইতে হইল। এই শিবালয় হইতে আরও কিয়দ্দূর উত্তরদিকে অগ্রসর হইবামাত্র যে দেবের দর্শনের কাঙ্গাল হইয়া এখানে আসিয়াছিলাম, সেই ভগবান ক্ষীরচোরা গোপীনাথ জীউর দেবালয়ের ফটকদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এই ফটক দ্বার হইতে ভিতরের মন্দির ও নাট-মন্দির যাহা কিছু দর্শন পাওয়া যায়, সে সমস্তই সুন্দর কারুকার্য্যে শোভিত। মন্দির-মধ্যে ভগবান গোপীনাথ জীউর পবিত্র মূর্ত্তি—বংশীকরে ভুবনমোহন মূর্ত্তিতে ভক্তবৃন্দকে দর্শন দানে উদ্ধার করিতেছেন। এ মূর্ত্তি যিনি একবার দর্শন করিবেন, তাঁহাকেই আপন অর্থ সদ্ব্যবহার হইল মনে করিতে হইবে। কথিত আছে—একদা ভগবান্ গোপীনাথ—আপন লীলা প্রকাশচ্ছলে, স্থানীয় গোপবালাদিগের ক্ষীর হরণ করিয়াছিলেন, এই কারণ তিনি এখানে ক্ষীরচোরা গোপীনাথ নামে খ্যাত হইয়াছেন।

এইরূপে এ তীর্থে শিবলিঙ্গ ও গোপীনাথ জীউর পবিত্র মূর্ত্তি দর্শন করিয়া এখান হইতে প্রত্যাগমনকালে পথিমধ্যে অসংখ্য তরুরাজি-সম পর্ব্বতমালা উচ্চ শিরে স্তরে স্তরে দণ্ডায়মান থাকিয়া সৃষ্টিকর্ত্তার মহিমা প্রকাশ করিতেছে দেখিতে পাইলাম। এই সকল পর্ব্বতমালা নীলগিরি নামে অভিহিত এবং ইহাদের শিখরদেশটী, যেন নীলবর্ণ আকাশ স্পর্শ করিতেছে, এইরূপ মনে হয়। রাস্তার উভয় পার্শ্বের এই সকল মন-প্রাণ-বিমোহনকারী দৃশ্যাবলী দেখিতে দেখিতে যথা-সময়ে নির্ব্বিঘ্নে বালেশ্বর ষ্টেসনে সদলে পুনর্ব্বার উপস্থিত হইলাম।

যে সকল যাত্রী এখান হইতে মহানদীতে স্নান এবং কটক সহরের শোভা উপভোগ করিতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহাদিগকে কটক নামক এই লাইনের প্রধান ষ্টেসনে অবতরণ করিতে হইবে। আমরা বালেশ্বরে

হইতে বৈতরনী যাত্রা করিয়াছিলাম, সুতরাং সেই বিষয়ই এখানে লিপিবদ্ধ হইল।

বৈতরণী যাত্রা।

বালেশ্বর হইতে বৈতরণী যাইতে হইলে—পূর্ব্বে যাত্রীদিগকে জাজপুর নামক ষ্টেশনে অবতরণ করিতে হইত; এক্ষণে বৈতরণী রোড নামক নূতন ষ্টেশন হওয়াতে, সকলেই তথা হইতে গমনাগমন করেন। কলিকাতা হইতে বৈতরণী রোড ২০২ মাইল, এবং বালেশ্বর হইতে ৫৮ মাইল দূরে অবস্থিত; মহারাজ যযাতি কেশরী এই নগরের স্থাপন-কর্ত্তা। এই ষ্টেশন হইতে বৈতরণী-তীর্থের নির্দ্দিষ্ট স্থান, অন্যূন চৌদ্দ মাইল পথ গো-শকটে যাইতে হয়। বলা বাহুল্য এই ষ্টেশনটী অতিক্রম করিবার পর, যে পথে উপস্থিত হওয়া যায়, তাহার চতুর্দ্দিকেই বিস্তীর্ণ মাঠ ধূ ধূ করিতেছে—সেই জনশূন্য স্থানটী দেখিলে মনে ভয় হয়। ষ্টেশনের অনতিদূরে মাত্র কয়েকখানি পুরাতন ভগ্ন মুদির দোকান (চটী) ব্যতীত আর কোন বাসস্থান দেখিতে পাওয়া যায় না।

জাজপুর কটক জেলার একটী প্রধান নগর, পুণ্যতোয়া বৈতরণী নদীর দক্ষিণ-তীরে ইহা অবস্থিত। যাত্রীগণ বহু কষ্ট ও বহু অর্থব্যয় স্বীকার করিয়া যে বৈতরণীতে পিতৃপুরুষগণের মুক্তি কামনায় আসিয়া থাকেন—সেই বৈতরণী নদী, গোনাসা নামক পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া সিংহ-ভূম, মাণিপুর অতিক্রম পূর্ব্বক জাজপুর নগরকে দক্ষিণ-ধারে রাখিয়া বঙ্গোপসাগরে মিলিতা হইয়াছে।

বৈতরণী—বিষ্ণুপদ-সম্ভূত এবং গঙ্গার সদৃশী বলিয়া খ্যাত।

চতুরানন ব্রহ্মা স্বয়ং এইস্থানে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া যজ্ঞেশ্বর শ্রীহরিকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন এবং বেদ যখন অপহৃত হয়, সেই সময় বরাহদেব ঐ যজ্ঞকুণ্ড হইতে সমুদ্ভূত হইয়া উহা উদ্ধার করিয়াছিলেন; এই নিমিত্ত ভগবান এইস্থানে যজ্ঞ-বরাহ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। স্থানীয় পণ্ডাদিগের নিকট উপদেশ পাইলাম, পূর্ব্বে ঐ নির্দ্দিষ্ট স্থানটীই ব্রহ্মার যজ্ঞস্থল ছিল।

বৈতরণী রোড নামক ষ্টেশনটী পার হইয়া, গো-শকটের সাহায্যে এই প্রশস্ত পথ অতিক্রম করিবার সময় স্থানীয় উড়ে-পাণ্ডাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে যাত্রীদিগকে অস্থির হইতে হয়। পাণ্ডা কে? কি নাম? কোন্ জেলায় বাড়ী? প্রত্যেক পাণ্ডাকে এই একই প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে জ্বালাতন হইতে হয়। বলা বাহুল্য এই সময় পাণ্ডাদিগের মধ্যে যদি কোন যাত্রীর পূর্ব্বপুরুষদিগের নাম তাঁহাদের খাতায় থাকে, তাহা হইলে উক্ত যাত্রীকে সেই পাণ্ডাকেই তীর্থ-গুরুপদে মান্য করিতে হইবে এবং বৈতরণীর যাবতীয় তীর্থকার্য্য তাঁহারই দ্বারা সম্পন্ন করাইতে হয়, কিন্তু যাঁহাদের কোন নিরূপিত পাণ্ডা নাই, তাঁহারা ইচ্ছানুযায়ী পাণ্ডা মনোনীত করিয়া লইতে পারেন।

বৈতরণী-তীর্থ পদ্ধতিক্রমে যাবতীয় কার্য্য, গো-দান প্রভৃতি এখানকার এই বরাহদেবের মন্দির মধ্যেই সম্পন্ন হইয়া থাকে। স্থানীয় নিয়মানুসারে এই শুভকার্য্য সম্পন্ন করাইতে—গাভীর মূল্য, ব্রাহ্মণবরণের কাপড়, গো-পূজার কাপড়, উপকরণের মূল্য ও ক্রিয়ার দক্ষিণা প্রভৃতি সর্ব্বশুদ্ধ ন্যূনকল্পে সাত টাকা বার আনা ধার্য্য আছে। এই নির্দ্ধারিত মূল্য স্বীয় পাণ্ডার নিকট প্রদান করিলে—তিনি আবশ্যকীয় সমস্ত দ্রব্যই সংগ্রহ করিয়া ভক্তের কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করাইয়া থাকেন।

যেস্থানে বরাহদেবের মন্দিরটী স্থাপিত আছে, সেই স্থানটী বরাহক্ষেত্র নামে কথিত। মন্দিরাভ্যন্তরে ভগবান্ বরাহদেবের বিগ্রহমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। এই মন্দিরের পুরোভাগে জগমোহন অর্থাৎ ভোগমণ্ডপ আপন শোভা বিস্তার করিতেছে। ভক্তগণ—এই জগমোহনেই বরাহদেবের সম্মুখে দুগ্ধবতী গাভীদান করেন, অধিকন্তু সেই গোপুচ্ছ ধারণ করিয়া বৈতরণী পার হইয়া স্বর্গের পথ পরিস্কার করিয়া থাকেন। বৈতরণী-তীর্থ তীরে যে বাঁধা-ঘাট দেখিতে পাওয়া যায়, সেই ঘাটটীই দশাশ্বমেধ-ঘাট নামে খ্যাত। কথিত আছে স্বয়ং ব্রহ্মা যজ্ঞেশ্বর শ্রীহরিকে সন্তুষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে এই নির্দ্দিষ্ট ঘাটস্থানে কাশীর ন্যায় দশবার অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। এই নিমিত্ত ইহা দশাশ্বমেধ-ঘাট নামে খ্যাত হইয়াছে। ঘাটের বিপরীতদিকে মহাকালীর বিগ্রহ-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। এই কালীমন্দিরের দক্ষিণদিকে—ধর্ম্মপুত্র যমরাজের স্ত্রী, ইন্দ্রাণী, যমের মাতা, মাসী, পিসী ও সর্ব্বদক্ষিণে স্বয়ং "ধর্ম্মরাজ যম" মূর্ত্তির দর্শন পাওয়া যায়।

বিষ্ণুচক্রে বিচ্ছিন্ন সতীর নাভীদেশ এইস্থানে পতিত হয়, এই নিমিত্ত জগজ্জননী এখানে বিরজা নামে প্রসিদ্ধ হইয়া পুরী পবিত্র করিতেছেন। এই দেবীমন্দিরের পশ্চাদ্ভাগে প্রস্তরময় চতুর্দ্দিক সোপানে শোভিত একটী পুষ্করিণী বা (কুণ্ড) দেখিতে পাওয়া যায়, সেই কুণ্ডটীই এখানে যজ্ঞকুণ্ড নামে কথিত। যজ্ঞকুণ্ডের ঠিক উত্তরদিকে কক্ষমধ্যে যে একটী বাঁধান কূপ দেখিতে পাওয়া যায় সেই নির্দ্দিষ্ট কূপটীই এখানে নাভীগয়া নামে প্রসিদ্ধ। ভক্তগণ, বৈতরণী-তীর্থে আসিয়া পিতৃপুরুষ-দিগের উদ্দেশে এই নাভীগয়াতেই পিণ্ডদান ও পুণ্যতোয়া নদীতীরে গাভীদান করিয়া আপনাপন মুক্তিরপথ পরিস্কার করিয়া থাকেন।

ব্রহ্মার যজ্ঞকালে—বৈষ্ণবচূড়ামণি মহামতি, মহাবীর গয়াসুর শয়ন

করিলে—তাঁহার নাভীদেশ এইস্থান স্পর্শ করিয়াছিল বলিয়াই এতীর্থের নাম "নাভীগয়া" হইয়াছে। কথিত আছে নাভীগয়াতে—যথানিয়মে পিণ্ডদান করিলে তীর্থশ্রেষ্ঠ গয়াধামের স্বরূপ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমরা সদলে বৈতরণী তীর্থের সেবা করিয়া এখান হইতে ভগবান্ ভুবনেশ্বর দেবজীউর শ্রীচরণ বন্দনা করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলাম।

শ্রীশ্রীভুবনেশ্বরজীউ।

বৈতরণী-তীর্থ বা জাজপুর রোড নামক ষ্টেশন হইতে লিঙ্গরাজ ভগবান ভুবনেশ্বরজীউর দর্শন বাসনা করিলে যাত্রীগণকে বেঙ্গল নাগপুর রেলযোগেই ভুবনেশ্বর নামক ষ্টেশনে অবতরণ করিতে হয়। কলিকাতা হইতে ভুবনেশ্বর ২৭১ মাইল এবং জাজপুর রোড নামক ষ্টেশন হইতে ৬৯ মাইল দূরে অবস্থিত। পবিত্রস্থান ভুবনেশ্বরের অপর নাম একাম্র কানন।

একাম্রকানন অষ্টতীর্থ সমন্বিত, সর্ব্বপাপ হর, পরমদুর্ল্লভ, কোটিলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত, এই স্থানটী দ্বিতীয় কাশী বলিলে অত্যুক্তি হয় না। উড়িষ্যাদেশে দক্ষিণ সাগরের তীরে বিন্ধ পর্ব্বতোদ্ভূতা পূর্ব্বগামিনী একটী নদী দেখিতে পাওয়া যায়, সেই পবিত্র নদীটী গন্ধবতী নামে খ্যাত। ইহা সাক্ষাৎ কাশীর উত্তর বাহিনী গঙ্গার সদৃশী। একাম্রকাননে যে সমস্ত প্রাচীন দেবালয় বর্ত্তমান আছে, তন্মধ্যে ভগবান ভুবনেশ্বরের মন্দিরটীই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ত্রিলোকপূজ্য ভুবনেশ্বরজীউর প্রকৃত নাম ত্রিভুবনেশ্বর।

ভুবনেশ্বর ষ্টেশন হইতে ভগবানের দর্শন করিতে যাইতে হইলে—স্থানীয় ষ্টেশনটী পার হইয়া যে পাকাবাঁধা রাস্তা প্রসারিত হইয়াছে,

সেই রাস্তার সাহায্যে অন্ততঃ দুই ক্রোশ পথ অতিক্রম করিবার পর তীর্থস্থানের পদপ্রান্তে পৌঁছিতে পারা যায়। যে সকল অসমর্থ যাত্রী এতদূর প্রশস্ত পথ চলিতে অক্ষম হইবেন, তাঁহাদিগকে ছত্রীওলা গো-শকটের সাহায্য লইতে হইবে। ষ্টেশন হইতে তীর্থতীর পর্য্যন্ত একখানি গো-শকটের ভাড়া অন্যূন ।৷০ আনা দিতে হয়। এই প্রশস্ত পথ অতিক্রম করিবার সময় পথিমধ্যে অসংখ্য শিবমন্দির দর্শনে আনন্দে অধীর হইয়া মনে মনে ভাবিলাম এতাবৎকাল যে সকল তীর্থপর্য্যটন করিয়াছি, এক কাশী ব্যতীত অপর কোথাও ত এরূপ অগণিত শিবলিঙ্গের দর্শন পাই নাই। এই সকল মন্দিরাভ্যন্তরে একটী করিয়া শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই সকল প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গমূর্ত্তিগুলির মধ্যে কয়েকটী প্রধান লিঙ্গ ব্যতীত অপরগুলি পুষ্পচন্দনাদি দ্বারা পূজার্চ্চনা হয় এরূপ মনে হয় না।

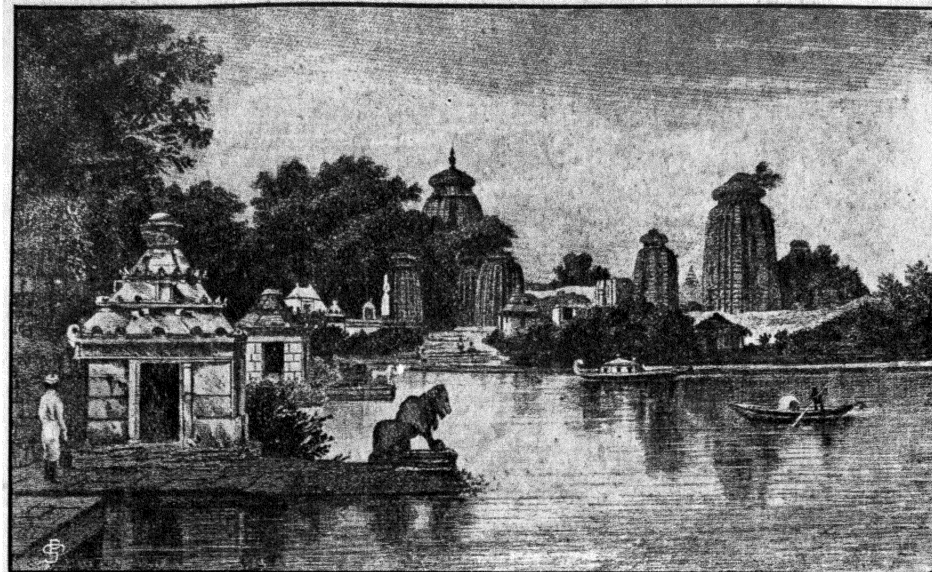
পুরাকালে এতীর্থে একটীমাত্র আম্রবৃক্ষ থাকায়, ইহার নাম একাম্র-কানন হইয়াছে; কিন্তু বর্ত্তমানকালে সেই একের পরিবর্ত্তে এখানে সহস্র আম্রবৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। পথের উভয়পার্শ্বে এই সকল মন্দিরারণ্যের মধ্যে মধ্যে ছোট বড় বহুবিধ সরোবর ও কুণ্ড দেখিতে পাওয়া যায়; সেই সকল কুণ্ডের মধ্যে ব্রহ্মকুণ্ড, গৌরীকুণ্ড, ললিতা-কুণ্ড, রামকুণ্ড ও মরীচিকুণ্ড এই কয়টীই প্রধান; সুতরাং এই সকল কুণ্ডের যথানিয়মে সেবা করিতে হয়। এইরূপ আবার বিন্দুসরোবর, কপিলহ্রদ, কোটীতীর্থ ও পাপনাশিনীতীর্থ এই কয়টী সরোবরের মাহাত্ম্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, ফলতঃ এগুলিরও যথানিয়মে পূজার্চ্চনা করিতে হয়। এতীর্থে মরীচি নামক কুণ্ডের মাহাত্ম্য চিরপ্রসিদ্ধ—কেননা ইহার পবিত্র বারি ভক্তিসহকারে পান করিলে বন্ধ্যানারী গর্ভবতী হন। আমরা সদলে এই পথের উভয়পার্শ্বে কত হ্রদ, কত

কুণ্ড ও কত শ্যামলা সুফলা ক্ষেত্রসকলের শোভা দর্শন করিতে করিতে মনের আনন্দে যথাসময়ে বিন্দু সরোবরের তটে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এই বিন্দু সরোবরের তীর হইতে ত্রিভুবনেশ্বরের শ্রীমন্দিরের দৃশ্য অতি মনোহর! নির্দ্দিষ্ট এইস্থানে অত্যন্ত বনজঙ্গল এবং পর্ব্বতে বেষ্টিত থাকায় নানাজাতীয় অজাগর ইচ্ছামত বিচরণ পূর্ব্বক যাত্রীদিগের প্রাণে ভয়োৎপাদন করিয়া থাকে; তাহাদের সেই দ্রুতগামী গতি অবলোকন করিলে মনে হয়, যেন ইহারা ভগবান শঙ্করের শিঙ্গরব শুনিয়া, তাঁহার আদেশ মত তাঁহারই নিকট গমন করিতেছে। আমরা বিন্দু সরোবরে পৌঁছিবামাত্র বিস্তর পাণ্ডার মধ্যে অনন্ত মহাপাত্র ছাপার ভোগী নামক একজন পাণ্ডাকে মনোনীত করিলাম এবং এই সরোবরের উপরিভাগে দারোগা বাবুর বাটীতে বাসা ভাড়া ঠিক করিয়া লইলাম।

ভুবনেশ্বরের মূল মন্দিরের উত্তরদিকে বড় দন্দ নামক প্রশস্ত রাজ পথ, দক্ষিণদিক—জঙ্গলে পরিপূর্ণ ও কতকগুলি ভগ্নপ্রাচীর ও ভগ্ন অট্টালিকার প্রাচীর চিহ্নগুলি বর্ত্তমান থাকিয়া কেশরীনৃপগণের মহিমা প্রকাশ করিতেছে। পূর্ব্বদিকে—বিন্দুসরোবর আপন শোভা বিস্তার করিয়া অবস্থিত।

বিন্দু সরোবর।

বিন্দু সরোবর—এক সুবৃহৎ দীঘিবিশেষ। ইহার জলরাশি সুনির্ম্মলস্ফটিক তুল্য ও স্বাস্থ্যকর। এই সরোবরে কত লোক ছিপে কতপ্রকার মৎস্য ধরিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিয়া থাকে, তাহার ইয়ত্তা নাই। বিন্দুসরোবরের চারিদিক চারি নামে খ্যাত যথা;—পূর্ব্বদিক—



বিন্দু সরোবরের দৃশ্য।

[৪৭ পৃষ্ঠা]

Sulov Press, Calcutta.

মণিকর্নিকা, দক্ষিণদিক—ত্রিশূর, পশ্চিমদিক—বিশ্রাম ও উত্তরদিক—গোদাবরী নামে প্রসিদ্ধ। ইহার পূর্ব্বদিকে মণিকর্নিকা নামে যে বাঁধা ঘাট আছে, যাত্রীগণ উহার তটে বসিয়া ভক্তিসহকারে তীর্থগুরু পাণ্ডার সাহায্যে যথানিয়মে মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক ঋষিগণ ও পিতৃপুরুষগণের উদ্দেশ্যে তর্পণ করিয়া আপনাদিগকে চরিতার্থ বোধ করিয়া থাকেন। পাঠকবর্গের প্রীতির জন্য এইস্থানে বিন্দুসরোবরের একখানি চিত্র প্রদত্ত হইল।

বিন্দুসরোবরের উৎপত্তির কিম্বদন্তী এইরূপ ;—

একদা শঙ্কর—পার্ব্বতাকে কাশীর মাহাত্ম্য প্রকাশ করিলে, তিনি বিনীতভাবে জিজ্ঞাসিলেন, "নাথ! কাশীধামই কি আপনার একমাত্র পুণ্যতীর্থ ?" তদুত্তরে মহেশ্বর মধুর বচনে তাঁহাকে এই একাম্রকাননের নাম উল্লেখ করিয়া বলিলেন, "প্রিয়ে! কাশী অপেক্ষা আমার প্রিয়তম স্থান "একাম্রকানন"। মর্ত্ত্যধামে কাশী মাহাত্ম্য বিঘোষিত হইবার পর, আমার দ্বিতীয়েচ্ছা সংযত হইলে আমি প্রফুল্ল মনে ঐ কাননে অবস্থান করিতে লাগিলাম। ঐ সময় এখানে একটী মাত্র আম্রবৃক্ষ থাকায়, আমি স্বেচ্ছায় উহার নাম একাম্রকানন রাখিয়াছি।"

শঙ্করী ভগবান মহেশ্বরের নিকট ঐ একাম্রকানন কাহিনী অবগত হইয়া সেই পুণ্য স্থান দর্শনের নিমিত্ত শঙ্কর সমীপে স্বীয় বাসনা জ্ঞাপন করিলেন। মহেশ্বর পার্ব্বতীকে সন্তুষ্ট করিবার অভিলাষে বিনা আপত্তিতে তাঁহাকে ঐ একাম্র কাননের শোভা দর্শন করিতে অনুমতি দান করিলেন। গিরিসুতা পার্ব্বতী—শঙ্করের আজ্ঞা প্রাপ্তে যথা সময়ে এই একাম্রকাননে উপস্থিত হইলেন এবং নানাবর্ণের নানাপ্রকার লিঙ্গ সকল দর্শন পূর্ব্বক হৃষ্টচিত্তে তাঁহাদের পূজার্চ্চনা করিয়া ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

এইরূপে এই মনোহর কাননে কিছুকাল অবস্থিতির পর একদা পার্ব্বতী মহাদেবের অর্চ্চনার্থে পুষ্প ও বিল্বপত্র সংগ্রহ করিবার সময় কীর্ত্তি ও বাস নামে অসুরদ্বয়ের নেত্রপত্রে পতিত হইলেন। দুর্ব্বৃত্তেরা ঘোরান্ধকারময়ী যামিনীতে সৌদামিনীসদৃশ, দেবীর সেই অপরূপ রূপ প্রভা নিরীক্ষণ করিয়া কামান্ধচিত্তে তাঁহার নিকট আপনাপন হেয় প্রবৃত্তি ব্যক্ত করিল। গিরিসুতা ভবানীদেবী—পাপীষ্ঠদিগের এই অকথ্য বাক্য শ্রবণ করিয়া কোপান্বিত কলেবরে দেবাদিদেব মহাদেবকে স্মরণ করিলেন। স্মরণমাত্র ত্রিপুরারি-পার্ব্বতীর নিটক উপস্থিত হইয়া এবম্বিধ বাক্য অবগত হইয়া, একবার মৃদুহাস্য করিয়া বলিলেন, "দেবি! এই দুরাত্মাদিগের আদি বৃত্তান্ত শ্রবণ কর;—

পূর্ব্বকালে ভ্রমিল নামে এক পরম ধার্ম্মিক রাজা এইস্থানে বাস করিতেন। তিনি বহু যাগযজ্ঞ করিয়া দেবতাদিগের নিকট স্বীয় পুত্রদিগের মঙ্গল কামনায় এই বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, "এই বিশ্ব ভূমণ্ডলে—দেব, যক্ষ, পুরুষ কিম্বা কোনরূপ অস্ত্রে কেহ যেন কখন আমার পুত্রদ্বয়কে বিনাশ করিতে না পারে;" সেই বীর পুত্রদ্বয়ের অল্প শক্তি সম্পন্না নিরীহ স্ত্রীজাতির দ্বারা কোনরূপ অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই বিবেচনা করিয়া তিনি স্ত্রীলোকদিগকে উপেক্ষা করিয়াছিলেন। দেবতারা সেই ধার্ম্মিক ভ্রমিল রাজার স্তবে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার স্বেচ্ছা-ক্রমে রাজার বাসনা পূর্ণ করিয়াছিলেন। যে পাপীষ্ঠদ্বয় তোমার অপমান করিতে সাহস করিয়াছে, উহারাই সেই ভ্রমিল রাজপুত্র, অতএব উহারা দেবতাদিগের অবধ্য। প্রিয়ে! তুমি আমার আদেশ মত বিনা অস্ত্রে কেবল পদদলিত করিয়া উহাদের এখানে বিনাশ কর। রণরঙ্গিণীশঙ্করী—শঙ্করের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া তাঁহার পূর্ব্বক্রোধানল শান্তি করিবার মানসে ঐ দুর্ম্মতি অজেয় অসুরদ্বয়কে পদদলিত করিয়াই

বিনাশ করিলেন। যে স্থানে এই অসুরদ্বয়ের সহিত পার্ব্বতীর যুদ্ধ হইয়াছিল, রণচণ্ডীকার পদভরে সেই স্থান কম্পান্বিত হইয়া এক বিশাল হ্রদে পরিণত হইল। ত্রিপুরারি তখন বিন্দুবাসিনীর নাম চিরস্মরণীয়া করাইবার নিমিত্ত ঐ হ্রদে পৃথিবীর যাবতীয় তীর্থের সার ভাগ সংযুক্ত করাইয়া—ইহাকে এক পবিত্র পুণ্যময় তীর্থে পরিণত পূর্ব্বক বিন্দু-সরোবর নামে প্রসিদ্ধ করিলেন। বলা বাহুল্য পূর্ব্ব হইতে বিন্দুবাসিনীর পদরেণু এই যুদ্ধক্ষেত্রে পতিত হওয়ায় ইহা পবিত্রতর হইয়াছিল।

বিন্দুসরোবরের মধ্যস্থলে জগতী মন্দির নামে একটী পাকা ইষ্টক নির্ম্মিত সুন্দর দেবালয় আছে। বৈশাখ মাসের চন্দনযাত্রার সময় দ্বাবিংশতি দিবস ভগবান ভুবনেশ্বরের প্রতিনিধি স্বরূপ "চন্দ্রশেখরদেব জিউর" বিগ্রহমূর্ত্তি ঐ মন্দিরে অবস্থান করিয়া থাকেন। সরোবরের দক্ষিণদিকে ভুবনমোহন ভুবনেশ্বর দেবের প্রধান মন্দির বিরাজমান। এই প্রধান মন্দিরের পূর্ব্বদিকে অনন্ত বাসুদেবের মন্দির প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরাভ্যন্তরে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ মূর্ত্তিতে বিরাজমান, আবার বলভদ্র দেবের মস্তকের উপর অনন্তদেবের সহস্র ফণা, ছত্ররূপে শোভা বিস্তার করিয়া আছে। শ্রীরামকৃষ্ণের এই প্রেমপূর্ণ মূর্ত্তিদ্বয় দর্শন করিলে, নয়ন আর ফিরাইতে ইচ্ছা হয় না। ইহার পরে দেবতাদিগের বিগ্রহমূর্ত্তি সকল দর্শন করিতে করিতে জগদ্বিখ্যাত ত্রিলোকপূজ্য ভগবান ভুবনেশ্বরদেবজীউর সুবৃহৎ মন্দির-প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়া স্তম্ভিত হইলাম; কারণ এই প্রাঙ্গণের চতুর্দ্দিকই উচ্চ প্রশস্ত প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। মন্দির-মধ্যে এবার যে স্থানে উপস্থিত হইলাম, তাহার সম্মুখদিকে "অরুণস্তম্ভ" নামে একটী সুন্দর স্তম্ভ এই স্থানের শোভা বৃদ্ধি করিতেছে।

ইহার পর ভোগ মণ্ডপ, তাহার পর নাটমন্দির। প্রধান মন্দিরের

দুইটী পৃথক প্রাঙ্গণ আছে, তন্মধ্যে ছোটখাট বহুবিধ মন্দির শোভা পাইতেছে, এতদ্ভিন্ন দুইটী বৃহৎ কূপ দেখিতে পাওয়া যায়। স্থানীয় পাণ্ডার নিকট উপদেশ পাইলাম ঐ কূপের জল কেবল ভগবানের সেবায় ব্যবহৃত হয়। মধ্য প্রাঙ্গণের একস্থান হইতে জগদ্বিখ্যাত ত্রিভুবনেশ্বরের সেই অত্যুচ্চ বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মিত নানা চিত্রে শোভিত শ্রীমন্দির দর্শন করিয়া বহু দিনের বাসনা পূর্ণ করিলাম। এই শ্রীমন্দির-মধ্যে প্রবেশ করিবার সময় স্থানীয় নিয়মানুসারে প্রবেশ দ্বারে চারিটী পয়সা দিতে হয়। অবগত হইলাম এই চারি পয়সার মধ্যে এক পয়সা মন্দির মেরামতি, এক পয়সা পূজারী ব্রাহ্মণ, এক পয়সা পাণ্ডা ঠাকুর অবশিষ্ট পয়সাটি দেবতার সেবার জন্য জমা হইয়া থাকে।

শ্রীমন্দিরের প্রবেশ দ্বারের একপার্শ্বে বিদেশী ভাষায় যে একটী শ্লোক খোদিত আছে, পাণ্ডাদিগের নিকট উহার মর্ম্মটী উপদেশ পাইলাম, "কেশরীবংশীয় রাজা ললাটেন্দু কেশরীর রাজত্বকালে এই ত্রিলোকপূজ্য পবিত্র মন্দিরটী বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছে"। বলা বাহুল্য এই অত্যুচ্চ প্রাচীন মন্দিরের কারুকার্য্য দর্শনে আত্মহারা হইতে হয় এবং স্বয়ং বিশ্বকর্ম্মা যে অদ্ভুত শিল্পকর ছিলেন, তাহা এই শ্রীমন্দিরের শিল্প নৈপুণ্য দেখিলেই প্রমাণ পাওয়া যায়। পাঠকবর্গের প্রীতির নিমিত্ত স্থানীয় মন্দির সমূহের একখানি চিত্র প্রদত্ত হইল।

মন্দির প্রাঙ্গণের চারি পার্শ্বেই নানা দেবদেবীর বিগ্রহমূর্ত্তি বাঙ্গালীর কুলতিলক সমাজচ্যুত "কালাপাহাড়" কর্ত্তৃক হস্তপদ বিহীন বা ভগ্নাবস্থায় অবস্থান দেখিয়া, তাহার অত্যাচারের বিষয় চিন্তা করিতে করিতে মর্ম্মাহত হইলাম। আবার এই প্রাঙ্গণ স্থানের একপার্শ্বে একটী মন্দির মধ্যে সাক্ষাৎ বিশ্বকর্ম্মাদেবের বিগ্রহমূর্ত্তির দর্শন করিয়া নয়ন ও জীবন চরিতার্থ বোধ করিলাম।

ভগবান ভুবনেশ্বরজীউর শ্রীমন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, ইহার মধ্যভাগটী অন্ধকারে পরিপূর্ণ। পাণ্ডাঠাকুর একটী বড় প্রজ্জলিত প্রদীপ সাহায্যে সেই অন্ধকার স্থানের উচুনীচু স্থান সকল পার করাইয়া আপন যাত্রীদিগকে লইয়া গর্ভগৃহে উপস্থিত হন। এই গর্ভগৃহের মধ্যেই সেই ত্রিলোকপূজ্য ভগবান ত্রিভুনেশ্বরজীউর সুবৃহৎ পবিত্র লিঙ্গমূর্ত্তির পূজার্চ্চনা করিয়া ভক্তগণ, আপনাপন ব্রত উত্থাপন করেন, তৎসঙ্গে ভক্তিদান করিয়া মুক্তির পথ প্রশস্ত করেন, কারণ কথিত আছে—ভক্তি বিনা কিছুতেই মুক্তি পাওয়া যায় না।

লিঙ্গরাজ ভুবনেশ্বরজীউর এই প্রস্তরময় মুর্ত্তিটীর ব্যাস প্রায় নয় ফিট, ইহার চতুর্দ্দিক কৃষ্ণ প্রস্তর দ্বারা বাঁধান, আবার সেই বেদীটি সুবর্ণমণ্ডিত। বেদীর একপার্শ্ব প্রদীপের মুখের ন্যায় সূক্ষ্মভাব—তাহার শীর্ষস্থানে একটী শ্বেত-রেখার চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। দেবালয়ের একপ্রান্তে ভগবানের নন্দীমূর্ত্তিটী (বৃষ) আপন শোভা বিস্তার করিয়া দর্শকদিগকে চমৎকৃত করিতেছে।

একাম্রকাননের এই পবিত্র স্থানে—মহারাজ ললাটেন্দুর বর প্রার্থনায়, ভগবান ভুবনেশ্বরের আশীর্ব্বাদে এ তীর্থে প্রসাদে জাতিভেদ অন্তর্হিত হইয়াছে, অর্থাৎ এখানে মহাপ্রসাদে জাতিভেদ নাই। ব্রাহ্মণ শূদ্রের মুখে এইরূপ আবার শূদ্র অবাধে ব্রাহ্মণের মুখে প্রসাদ দিয়া ভগবানের মহিমা প্রকাশ করিয়া থাকেন।

প্রভাতে চিরপ্রথানুসারে এ তীর্থে ভগবানের নিদ্রাভঙ্গের জন্য দুন্দুভিধ্বনি হয়। দেবতা জাগ্রত হইলে যথা নিয়মে পূজারীগণ আরতি করিয়া থাকেন; তৎপরে যথানিয়মে ঘণ্টায় ঘণ্টায় ভগবানের ভোগ হইয়া দিবা এগার ঘটিকার সময় যে শেষ মধ্যাহ্ন বা বিরাট ভোগ হয়, সেই ভোগ—অন্ন, ব্যঞ্জন, মালপোয়া প্রভৃতি প্রদানে দেবতার পূজার্চ্চনা

হইয়া থাকে, এবং প্রত্যহই যথানিয়মে যাত্রীদিগের উদরপূরণের জন্য সেই বিরাট ভোগ নির্দ্দিষ্ট বাজারে বিক্রয় হইয়া থাকে, এতদ্ভিন্ন অন্য কোন ভোগের প্রসাদ, ভাল পাণ্ডার সাহায্য ব্যতীত যাত্রীদিগের নিকট আসে না। ভগবান ভুবনেশ্বরদেবজীউর সমস্ত দিনের মধ্যে নানাবিধ প্রকারে চৌদ্দবার ভোগ হইয়া থাকে।

মূল মন্দিরের উত্তর পশ্চিম কোণে ভগবতীর মন্দির অবস্থিত। এই মন্দিরটী আয়তনে ছোট হইলেও গঠনকার্য্যে যাবতীয় শিল্পনৈপুণ্য দেখিতে পাওয়া যায়। মন্দিরাভ্যন্তরে কৃষ্ণপ্রস্তর-খোদিত দেবীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত।

ইতিহাস পাঠে উপদেশ পাওয়া যায় যে পূর্ব্বে অর্থাৎ মুসলমানদিগের প্রাদুর্ভাব-কালে এই স্থান তাঁহাদের অধীনে থাকে, কিন্তু কেশরীবংশীয় রাজা যযাতি কর্ত্তৃক সেই মুসলমানেরা বিতাড়িত হইলেপর, তিনি এই স্থানেই তাঁহার রাজ্য স্থাপিত এবং ৫৮৮ খৃষ্টাব্দে ভুবনেশ্বরের শ্রীমন্দিরটী নির্ম্মাণ করাইতে আরম্ভ করেন, অবশেষে তাঁহার প্রপৌত্র লল্লাটেন্দু কেশরী ৬১৭ খৃঃ ইহার নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ করিয়া দেবতার লিঙ্গমূর্ত্তিটী প্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক পূর্ব্বপুরুষদিগের মান বাজায় রাখেন, অধিকন্তু এ ক্ষেত্র ঐ দেবতার নামানুসারে প্রসিদ্ধ করিয়া আপন কীর্ত্তি স্থাপিত করেন।

কথিত আছে, মহারাজ লল্লাটেন্দু কেশরী ৬২৩ হইতে ৬৭৭ খৃঃ পর্য্যন্ত এই ভুবনেশ্বরে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তৎপরে তাঁহার বংশধরেরা ৯২৩ খৃঃ পর্য্যন্ত এইস্থানে রাজত্ব করিয়া ৯৪০ খৃঃ মহারাজ নৃপতি কেশরী কোন বিশেষ কারণ বশতঃ কটক নগরে তাঁহার রাজসিংহাসন স্থানান্তরিত করেন। তদবধি কটক এক সমৃদ্ধিশালী নগর এবং ভুবনেশ্বর অরণ্যে পরিণত হইল।

এইরূপে কিছুকাল অতীত হইলে পর সন ১১০৪ সালে সেই নৃপতি কেশরীর বংশধরগণ ভুবনেশ্বরের মন্দিরটী সংস্কার করিতে মনস্থ করিলেন। তাঁহাদেরই কৃপায় সেই জঙ্গলাবৃত স্থান আবার নগরে পরিণত হইল। আমাদের বাঙ্গলা দেশে যেরূপ বৈশাখ মাস হইতে বৎসরের প্রথম মাস গনণা করা হয়, এখানকার এই উৎকলবাসীদের সেইরূপ অগ্রহায়ণ হইতে প্রথম মাস আরম্ভ হইয়া থাকে।

যাত্রীগণ প্রথম দিবস এ তীর্থে আসিয়া যাহাকে পাণ্ডাপদে মান্য করেন, সে দিবস তিনি নিজ ব্যয়ে তাঁহার অধীনস্থ শিষ্যগণকে প্রসাদ সরবরাহ করিয়া থাকেন। আমাদের পাণ্ডা অনন্ত মহাপাত্র ছাপান্ন ভোগীর নিকট উপদেশ পাইলাম, এই সুবৃহৎ ভুবনেশ্বরের শ্রীমন্দিরটী উচ্চতায় ১৬৫ ফিট। মন্দির গাত্র যে সকল কারুকার্য্যে পরিপুর্ণ, উহাতে অগণিত দেবদেবী মূর্ত্তি ব্যতীত কতকগুলি অশ্লীল মূর্ত্তিও দেখিতে পাওয়া যায়। এ প্রাঙ্গণে যতগুলি দেবদেবীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে, তন্মধ্যে নীল প্রস্তরের দ্বিভুজা সাবিত্রী, নরসিংহমূর্ত্তি ও দারুময় পতিতপাবন মূর্ত্তিই প্রধান। মন্দির-সংলগ্ন অলিন্দগুলিতে একটী করিয়া সুন্দর কৃষ্ণপ্রস্তরের বিগ্রহমূর্ত্তি কালাপাহাড় কর্ত্তৃক অঙ্গহীন অবস্থায় অবস্থান করিতেছেন। এই অত্যুচ্চ প্রাচীন কারুকার্য্য-বিশিষ্ট মন্দিরটী বহুকালাবধি সংস্কারাভাবে ক্রমশঃই শ্রীহীন হইতেছে। দুঃখের বিষয় প্রত্যহই এখানে যথানিয়মে মন্দির সংস্কারের চাঁদা সংগ্রহ হয়, কিন্তু কখন কেহ ইহাকে মেরামত করিতে দেখিতে পান না।

এইরূপে সদলে শ্রীমন্দিরের শোভা দর্শনান্তে বিন্দুসরোবরের পূর্ব্ব-তীরে অনন্ত বাসুদেবের মন্দিরের ঈশানকোণে শ্রীশ্রীমুক্তেশ্বরের মন্দিরে উপস্থিত হইলাম। এ মন্দিরটীও নানা কারুকার্য্যে শোভিত—দর্শনে আত্মহারা হইতে হয়। তৎপরে শ্রীশ্রীকেদারেশ্বরের মন্দির। এখানে

ভগবান কেদারেশ্বর সদাসর্ব্বদা জলমগ্ন অবস্থায় অবস্থান করিতেছেন; তাহার পর কপিলেশ্বরের মন্দিরে উপস্থিত হইলে—তথায় মহামুনি কপিল ও তাঁহার আরাধ্যদেবকে দর্শন করিয়া নয়ন ও জীবন সফল বোধ করিলাম। এই সকল মন্দির ও দেবতাদিগের দর্শনান্তে ইহার অনতি-দূরে গৌরীকুণ্ডের সন্ধান পাইয়া তথায় গমন ও যথানিয়মে সেবার্চ্চনা পূর্ব্বক সেই কুণ্ডের পবিত্র বারিস্পর্শ করিয়া মহাব্রত উদ্যাপন এবং বিশ্রামের জন্য স্থানীয় বাসাবাটিতে সদলে উপস্থিত হইলাম।

পূর্ব্বেই উল্লেখ হইয়াছে যে—আমরা এখানে বিন্দুসরোবরের তীরের উপরিভাগে দারগা বাবুর বসতবাটিতে বিশ্রামস্থান ঠিক করিয়াছিলাম; তথায় বিশ্রামের পর পাণ্ডার নিকট সুফল গ্রহণ পূর্ব্বক উদয়গিরি ও খণ্ডগিরি নামক পর্ব্বতশ্রেণীর শোভা দর্শনের জন্য প্রস্তুত হইলাম। বিন্দুসরোবরের তীর হইতে এই গিরিদ্বয় প্রায় দুই ক্রোশ দূরে অবস্থিত।

খণ্ডগিরি ও উদয়গিরি।

এই গিরিদ্বয় একটী পাহাড় হইতে দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পৃথক পৃথক নাম ধারণ করিয়া বিরাজ করিতেছে। ইহাদের সোপানশ্রেণীর উপর দিয়া শিখরদেশে যতই উঠা যায়, ততই সেই গিরিদ্বয়ের মধ্যে নানা ধরণের বিবিধ প্রকার কূপ ও গুহা সকলের স্থাপত্য-কৌশল দেখিতে দেখিতে মোহিত হইতে হয়। পুরাকালে বৌদ্ধদিগের প্রাদু-র্ভাব-সময়—কত অর্থ, কত বুদ্ধি-সংযোগে তাঁহারা এই সকল ভয়ঙ্কর পাহাড় হইতে বাসোপযোগী গুহাগুলি নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, উহা একবার চিন্তা করিলে আত্মহারা হইতে হয়; পাহাড় ভেদ করিয়া

তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত একতল, দ্বিতল ও ত্রিতল প্রকোষ্ঠের পর প্রকাণ্ড বারান্দা, সেই বারান্দা অদ্যাপি ধ্বংসাবস্থায়ও নয়নগোচর হইলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। এখানকার এই খণ্ডগিরিতে যে প্রাচীন গুহা এখনও বর্ত্তমান আছে, তন্মধ্যে "রাণীহংসপুর" নামক গুহাই সর্ব্বাপেক্ষা সুশ্রী। ইহার শিখরদেশে জৈনদিগের একটী প্রাচীন মন্দির অদ্যাপি দণ্ডায়মান থাকিয়া অতীত ঘটনার বিষয় সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এইরূপে খণ্ডগিরির শোভা সন্দর্শন পূর্ব্বক নিকটস্থ উদয়-গিরির শোভা দেখিতে যাত্রা করিলাম।

খণ্ডগিরির পার্শ্ববর্ত্তী যে গিরিরাজ মস্তক উন্নত করিয়া দণ্ডায়মান আছেন, উহাই উদয়গিরি নামে প্রসিদ্ধ। এই উদয়গিরির উপরে উঠিলেও অসংখ্য বৌদ্ধভিক্ষুদিগের আশ্রমস্থান দেখিতে পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য পুরাকালে এই সকল আশ্রমে বুদ্ধ-তাপসগণ বাস করিয়া দেশ-বিদেশে গমন করতঃ সময় মত তাঁহাদের ধর্ম্মমত প্রচার করিতেন; কেননা উহাই তাঁহাদের একমাত্র জীবনের ব্রত ছিল। দুঃখের বিষয়, সেই বিখ্যাত গুহাগুলি বর্ত্তমান-কালে সংস্কারাভাবে শ্রীহীন অবস্থায় ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হইয়া কেবল বন্যজন্তুদিগের আবাসস্থলরূপে অবস্থান করিতেছে। ইহাতেই অনুমান হয় পূর্ব্বকালে সেই তাপসগণের অবস্থান সময় এই সমস্ত আশ্রমগুলির দৃশ্য কতই না সুন্দর ছিল। উদয়গিরির মধ্যে যত গুহা বর্ত্তমান আছে, তাহার প্রত্যেকটীর দেওয়ালে—নর, নারী, সৈনিক প্রহরী ও নানাবিধ খোদিত প্রতিমূর্ত্তির অবয়ব দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপে গিরিদ্বয়ের শোভা দেখিবার পর আমরা সকলে এখান হইতে ভগবান সাক্ষীগোপালের পবিত্র মূর্ত্তি দর্শন আশে ষ্টেশনাভিমুখে যাত্রা করিলাম।

প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে কলিঙ্গজয়ের পর মহারাজাধিরাজ

অশোক যখন ভুবনেশ্বর ও উদয়গিরির মধ্যবর্ত্তী প্রশস্ত মালভূমিতে সৈন্যকটক সংস্থাপন করিয়াছিলেন, সেই সময় এখানে তাঁহার বিজয় বাহিনীর জয়োল্লাস এবং উহার উপকণ্ঠপ্রস্থে খণ্ডগিরি ও উদয়গিরি— এই উভয় গিরি মধ্যেই বৌদ্ধ এবং ভিক্ষুণীদিগের নির্ব্বাণ সাধনা স্থান বর্ত্তমান ছিল।

এইস্থানে রাজাধিরাজ মহারাজ অশোকের কিছু পরিচয় দিব। "রাজা বিন্দুসার" চম্পা নগরীর এক পরমাসুন্দরী ব্রাহ্মণ কুমারীর অপরূপ রূপে মুগ্ধ হইয়া, তাঁহাকে বিবাহ করেন, সেই ব্রাহ্মণীর গর্ভে যে মৌর্য্য-কুলতিলক পুত্র উৎপন্ন হয়, তিনিই ভারতবিখ্যাত মহা-রাজাধিরাজ মহাত্মা অশোক।

কালাপাহাড়।

কালাপাহাড়ের প্রকৃত নাম, কালাচাঁদ রায়। বর্দ্ধমানের অন্তঃপাতী বীরজাতন গ্রামে তিনি বাস করিতেন। তাঁহার পিতা নয়ানচাঁদ রায় গৌড়বাদশাহের রাজসরকারে ফৌজদারী বিভাগে কার্য্য করিয়া সঙ্গতিপন্ন হন। পরোপকার—নয়ানচাঁদের জীবনের একমাত্র ব্রত ছিল। ইহার ফলে ভাগ্যলক্ষ্মী তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, নয়ানচাঁদের এই মহৎ গুণে মুগ্ধ হইয়া গ্রামস্থ সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় অল্প বয়সেই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া সকলকে আন্তরিক দুঃখে কাতর করিয়াছিলেন। যে সময় নয়ানচাঁদের মৃত্যু হয়, সেই সময় তাঁহার একমাত্র পুত্র কালাচাঁদ, অত্যন্ত শিশু ছিলেন। কালাচাঁদের মাতামহ এই শিশুটীকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন, ফলতঃ এই নিঃসহায় অবস্থায় তিনি সেই শিশুটীকে আপন আলয়ে লইয়া গিয়া যত্নের সহিত লালনপালন এবং সাধ্যমত বাঙ্গলা ও পার্শী ভাষা শিক্ষাদানে সুপণ্ডিত করেন। কালাচাঁদ অতিশয় মিষ্টভাষী, বুদ্ধিমান, বলবান্ ও সুশ্রী পুরুষ ছিলেন। তাঁহার আচার ব্যবহার সমস্তই স্বর্গীয় পিতার ন্যায় হওয়াতে, সকলে তাহাকেও তাহার পিতার ন্যায় শ্রদ্ধা করিতে লাগিলেন।

কালাচাঁদের মাতামহ যথাকালে শ্রীরামপুর নিবাসী মাননীয় রাধামোহন লাহিড়ী মহাশয়ের সুন্দরী কন্যাদ্বয়ের সহিত তাঁহার বিবাহ দিয়া কালাচাঁদকে সংসারী করিলেন। যে সময়ের বিষয় উল্লেখ হইতেছে, তখন কুলীন ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে একের অধিক বিবাহ প্রচলিত থাকায়, ইহা দোষনীয় হয় নাই। এই বিবাহের পর হইতে সংসার খরচের ব্যয় বৃদ্ধি হওয়ায়, কালাচাঁদ বাধ্য হইয়া অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টায় বহির্গত হইলেন; এবং পৈতৃক মনিব "গৌড়ের বাদশাহ" সম্রাট সলিমান শাহের নিকট যথানিয়মে চাকরীর প্রার্থনা করিলেন।

এদিকে সম্রাট কালাচাঁদের পরিচয়ে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন, অধিকন্তু তাহাকে সুশ্রী, বলিষ্ঠ এবং পার্শী ভাষায় সুপণ্ডিত অবগত হইয়া সন্তুষ্টচিত্তে গৌড় নগরেই এই যুবককে ফৌজদারপদে নিযুক্ত করিয়া আপন মহত্ব প্রকাশ করিলেন। এইরূপে কালাচাঁদ চাকরী প্রাপ্ত হইয়া তিনি প্রত্যহ কর্ম্মস্থানে যাতায়াতের সুবিধার জন্য, সম্রাটশাহের বাটীর সন্নিকট, একস্থানে আপন বাসাবাটী ঠিক করিয়া লইলেন। বলা বাহুল্য, কালাচাঁদ অভ্যাসমত প্রত্যহ প্রত্যুষে রাজবাটীর সংলগ্ন একটি হ্রদে স্নান আহ্নিক সম্পন্ন করিতেন এবং যথাসময়ে চাকরীস্থানে উপস্থিত হইয়া আপন কর্ত্তব্যকর্ম্ম পালন করিতেন। গৌড়-সম্রাটের আদেশমত হিন্দু-কর্ম্মচারীদিগকে ধুতির উপর চাপকান এবং মাথায় পাগড়ী পরিধান করিয়া রাজ-কার্য্যে নিযুক্ত হইতে হইত আর মুসলমানদিগকে ইজের পরিয়া কাছারীতে হাজির হইতে হইত, সুতরাং কালাচাঁদকেও বাধ্য হইয়া এই নিয়মের অধীন হইতে হইল।

সম্রাট সলিমান শাহার একটী সুন্দরী যুবতী কন্যা ছিলেন, সুপাত্র অভাবে এতাবৎকাল তাঁহার বিবাহ হয় নাই। সেই কন্যারত্ন একদা

প্রত্যুষে দাসীগণসহ যখন অট্টালিকার ছাদে প্রফুল্ল মনে সুবিমল বায়ু সেবন করিতেছিলেন, যৌবন চাঞ্চল্যস্বভাব বশতঃ সেই সময় তিনি এই কালাচাঁদকে স্নানের পর আহ্নিক করিবার অবস্থায় তাঁহার শ্রীমুখে পবিত্র মন্ত্রপাঠ শ্রবণে মুগ্ধ হইয়া মনে মনে এই সুন্দর যুবা পুরুষকেই আত্মসমর্পণ করিলেন। এইস্থানে একটী কথা বলিবার আছে— সম্রাট দুহিতা সেই যুবকের গলে যজ্ঞপবীত দেখিয়া তাহাকে—উচ্চ বংশোদ্ভব, হস্তে সুবর্ণ কোশা থাকায়—ধনী, এবং বিশুদ্ধ মন্ত্র উচ্চারণ শব্দ শ্রবণে বিদ্বান বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য কালাচাঁদ এবিষয়ে কিছুই অবগত ছিলেন না, সুতরাং তিনি যথাসময়ে আহ্নিক কার্য্য সমাপনান্তে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

অপরদিকে দাসীগণ—সম্রাট দুহিতার মনোভাব স্থির অবগত হইয়া গুপ্তভাবে সম্রাজ্ঞীর নিকট যথাযথ প্রকাশ করিলে তিনি কাহাকেও কিছু না বলিয়া এই রহস্য ভেদ করিবার অভিলাষে স্বয়ং এই সুন্দর যুবা কালাচাঁদের জাতি, কুল প্রভৃতির বিষয় সন্ধান করিয়া সুখী হইলেন, কেননা তিনি মনে মনে স্থির করিলেন যে এতদিন পর বিধি সদয় হইয়া তাঁহার উপযুক্ত কন্যার যোগ্য স্বামীর সন্ধান করিয়া দিলেন; সুতরাং এক্ষণে তিনি প্রফুল্ল মনে স্বীয় কন্যার অভিলাষ পূর্ণ করিবার নিমিত্ত সম্রাটকে অনুরোধ করিলেন।

সম্রাট সলিমান শাহ সম্রাজ্ঞীর নিকট সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। পরদিবস যথাসময়ে কাছারী বন্ধ হইলে পর, তিনি কৌশল বিস্তার পূর্ব্বক কালাচাঁদকে নির্জ্জন কক্ষে আনাইয়া এই বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। কালাচাঁদ জাতিনাশ ভয়ে উহাতে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন—সম্রাট বারম্বার তাহাকে প্রলোভনে বশীভূত করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু এই দৃঢ়ব্রত যুবককে কিছুতেই

আয়ত্ব করিতে না পারিয়া শেষে জীবনের ভয় পর্য্যন্ত প্রদর্শন করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না, ইহাতেও যখন তাহার মতিগতি ফিরাইতে অসমর্থ হইলেন, তখন বাদশাহ এই অপমানের প্রতিশোধ লইবার নিমিত্ত ক্রুদ্ধমনে কালাচাঁদের প্রতি শূলের আদেশ প্রদান করিয়া সকল দুঃখের অবসান করিলেন।

সলিমান শাহের এই গর্হিত অত্যাচারের বিষয় মুহূর্ত্তমধ্যে সহর ও প্রত্যেক পল্লীতে পল্লীতে প্রচারিত হইল, এমন কি সম্রাট দুহিতাকেও এই অশুভ সংবাদে মর্ম্মপীড়ায় কাতর করিয়া তুলিল; কারণ তিনি তাঁহার জীবনের সকল আশাই নির্ম্মূল হইতেছে স্থির জানিয়া আপন অদৃষ্টের বিষয় চিন্তা করিতে করিতে মান অভিমান সমস্ত জলাঞ্জলি দিয়া উন্মাদিনীর ন্যায় শূলের নির্দ্দিষ্ট দিনে সেই বধ্যভূমি—যথায় কালা চাঁদ বন্দীভাবে অবস্থান করিতেছিলেন, তথায় উপস্থিত হইলেন, এবং কালাচাঁদের পদতলে পতিত হইয়া বিনীতভাবে প্রার্থনা করিলেন, "ব্রাহ্মণ! আপনি আমায় বিবাহ করিবার সম্মতিদানে আসন্ন বিপদ হইতে মুক্তিলাভ করুন"।

যে সময় কালাচাঁদ প্রতি মুহূর্ত্ত মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন, ঠিক সেই সময় এই অসম্ভব ব্যাপার দর্শনে তিনি হতবুদ্ধি হইলেন। সম্রাটদুহিতা এবার কালাচাঁদের মুখের ভাব অবলোকন করিয়া বুঝিলেন যে, তিনি তাহার প্রস্তাবে অসম্মত, সুতরাং ভগবানের পবিত্র নাম একবার উচ্চারণ করিয়া, হতাশপ্রাণে ঘাতকদিগকে কালাচাঁদের পূর্ব্বে তাহাকেই হত্যা করিতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। আহা! প্রেমের কি আকর্ষিণী শক্তি! যে সম্রাটদুহিতার কোমল মুখ—সূর্য্যদেব পর্য্যন্ত দেখিতে অবসর পান নাই, এক্ষণে ভালবাসার দায়ে সেই সম্রাটদুহিতার উন্নতশির নত হইয়া

কালাচাঁদের পদে লুন্ঠিত দেখিয়া কাহার প্রাণে না ক্ষোভ উপস্থিত হয়! জল্লাদেরা এই সমস্ত রহস্য ভেদ করিতে না পারিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বাদশার নিকট গমন করতঃ যথাযথ নিবেদন করিল। তখন সম্রাট স্বয়ং একবার বধ্যভূমে এই প্রহসন দেখিবার মনস্থ করিলেন।

এদিকে কালাচাঁদ—আসন্ন বিপদ হইতে মুক্তিলাভের আশায় সম্রাটদুহিতার উপদেশই শিরোধার্য্য করিলেন, অর্থাৎ এই নবযৌবন সম্পন্না সৌন্দর্য্যময়ী স্থিরা সৌদামিনী সদৃশ সম্রাটদুহিতার অপরূপ রূপ দর্শনে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করিতে সম্মত হইলেন। অপরদিকে সম্রাট বধ্যভূমে উপস্থিত হইয়া কালাচাঁদ—তাঁহার স্নেহের দুহিতাকে বিবাহ করিতে সম্মত হইয়াছেন অবগত হইয়া প্রফুল্ল মনে তাহার শূলাজ্ঞা রদ করিলেন, এবং সেইদিনই ধর্ম্মসাক্ষ্য করিয়া সর্ব্বসমক্ষে আপন দুহিতাকে কালাচাঁদের করে সমর্পণ পূর্ব্বক পূর্ব্ব ক্রোধের শান্তি করিলেন; অধিকিন্তু সম্রাট কালাচাঁদকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, "কালাচাঁদ! ইতিপূর্ব্বে আমার প্রলোভন বাক্যে যখন তুমি বশীভূত হও নাই, তখন হইতেই আমি তোমায় "কালা" বলিয়া স্থির করিয়াছিলাম, এক্ষণে আবার এই সঙ্কটময় সময়েও তুমি পাহাড়ের ন্যায় অবস্থান করিয়া আপন জীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলে, এই কারণে আমার আদেশ মত তুমি আজ হইতে জনসমাজে "কালাপাহাড়" নামে পরিচিত হও।

কালাচাঁদ এখানে প্রাণের দায়ে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন, কিন্তু এই বিবাহহেতু তাঁহাকে সমাজচ্যুত হইতে হইল। কালাচাঁদের মাতা—পুত্রের মায়া ত্যাগ করিতে না পারিয়া উপস্থিত বিপদে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা লইলেন, কিন্তু সমাজ শাসন

হইতে তিনি কিছুতেই পরিত্রাণ পাইলেন না; সুতরাং কালাচাঁদকে একঘরে হইয়া অবস্থান করিতে বাধ্য হইতে হইল।

এইরূপে কিছুদিন মনোদুঃখে কালযাপন করিবার পর—একদা কালাচাঁদের হৃদয়ে কলির সেই একমাত্র ত্রাণকর্ত্তা শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবজীউর মাহাত্ম্য স্মরণ হইল। তখন জাতি হইতে উদ্ধার হইবার মানসে এই পতিতপাবন জগদ্বন্ধুর শরণাপন্ন হইয়া শ্রীক্ষেত্রে উপস্থিত, এবং যথানিয়মে ভগবানের পবিত্র স্থানে হত্যা দিলেন। এইরূপে একমনে একপ্রাণে শুদ্ধচিত্তে অনাহারে একাধিক্রমে ছয় দিবস অতীত হইলেও যখন ভগবানের কোন প্রত্যাদেশ হইল না দেখিলেন, তখন তিনি হতাশ প্রাণে আপন অদৃষ্টের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন, অধিকন্তু স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, কলিকালে হিন্দু-দেবতাদিগের ক্ষমতা অন্তর্হিত হইয়াছে। ইত্যবসরে স্থানীয় পাণ্ডারা কালাচাঁদের বর্ত্তমান পরিচয় পাইয়া, প্রধান পাণ্ডার আদেশ মত তাঁহারা তাহাকে শ্রীমন্দিরের সীমা হইতে অপমান পূর্ব্বক বাহির করিয়া দিলেন।

কালাচাঁদ এতাবৎকাল কেবল জাতি হইতে উদ্ধারকল্পে নানাপ্রকার চেষ্টাই করিতেছিলেন, কিন্তু এক্ষণে এখানকার এই অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া, গৌড়নগরে পুনর্ব্বার উপস্থিত হইলেন এবং সম্রাট সলিমান শাহার উপদেশ মত মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। বলা বাহুল্য কালাচাঁদ এবার হিন্দু দেবদেবীর বিগ্রহমূর্ত্তি এবং পুরুষোত্তমের পাণ্ডাদিগের প্রতি অত্যাচার করিবার সহায়তা লাভের অভিপ্রায়েই স্বেচ্ছায় ধর্ম্মচ্যুত হইলেন। সম্রাট জামাতা কালাচাঁদ—কালাপাহাড় নামে পরিচিত হইয়া সলিমান শাহকে উৎকল বিজয়ের জন্য বারম্বার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। বাদশাহও এই নব জামাতার উত্তেজনায় উৎসাহিত হইয়া মনে মনে:

অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন, এবং পুরস্কারস্বরূপ কালাচাঁদকে তাঁহার দ্বিসহস্র সেনার অধিনায়ক করিয়া দিলেন। এইরূপে কিছুদিন অতিবাহিত হইবার পর, একদা সম্রাট অনুসন্ধানে জানিতে পারিলেন যে—কালা-পাহাড় এই অল্প সময় মধ্যে নিজগুণে সমস্ত সেনার শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছেন। এই অদ্ভুত ক্ষমতা দর্শনে তাঁহার আনন্দের পরিসীমা রহিল না।

যে সময়ের কথা উল্লেখ হইতেছে, সেই সময়—গঙ্গাবংশীয় মহা-পরাক্রান্ত উড়িষ্যার শেষ রাজা মুকুন্দ দেব উৎকলরাজ্য শাসন করিতেন। ইতিপূর্ব্বে মুসলমানেরা সম্রাটের আদেশে যতবার বীরদর্পে উড়িষ্যা দেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন, এ জাতি ততবারই এই মুকুন্দ দেবের অদ্ভুত রণকৌশলের নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন। এই কারণে গৌড়াধিপতি সম্রাট সলিমান শাহা এবার কালাপাহাড়কে তাঁহার অসংখ্য অজেয় সেনার অধিনায়ক করিয়া উড়িষ্যা বিজয়ে প্রেরণ করিলেন।

মুসলমান-সৈন্যেরা এতদিন পর মনের মত সেনাপতি লাভে নব উল্লাসে বীরদর্পে সেই অজেয় উড়িষ্যা দেশ আক্রমণ করিলে—মহাবীর মুকুন্দ দেব পূর্ব্বের ন্যায় যবনদিগকে তাচ্ছল্য বোধ করিয়া সামান্যমাত্র তাঁহার রক্ষী সৈন্য সমভিব্যাহারে রণক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন, কিন্তু তিনি সেই অসংখ্য যবন চমূ ভেদ করিবার সময়, ইহাদিগের দ্বারা অবরুদ্ধ হইলেন। বলা বাহুল্য এই সঙ্কটময় কালে তিনি প্রাণের আশা পরিত্যাগ করিয়া সম্মুখস্থ যবনসৈন্যগণকে সাধ্যমত নিপাত করিতে করিতে যথার্থ বীরের ন্যায় স্বীয় জীবন বিসর্জ্জন দিয়া স্বর্গে গমন করিলেন; তৎসঙ্গে উড়িষ্যার ভাগ্যলক্ষ্মীও অন্তর্হিত হইলেন। এইরূপে উড়িষ্যা মুসলমানদিগের অধীন এবং বাঙ্গলাদেশের অংশীভূত হইল।

বিজয়ী কালাচাঁদ এক্ষণে শ্রীমন্দিরের পাণ্ডাগণের সেই অপমান স্মরণ করিয়া, উহাদের প্রতি ভয়ঙ্কর অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিলেন। এই সময় পাণ্ডারা পরামর্শ করিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন যে—কালাচাঁদ যেরূপ উপদ্রব আরম্ভ করিয়াছে, তাহাতে সে জগন্নাথ দেবের দারুমূর্ত্তির উপর অত্যাচার করিতেও কুণ্ঠিত হইবে না ; সুতরাং তাঁহারা প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া গুপ্তভাবে সেই দারুমূর্ত্তি, শ্রীমন্দির হইতে বাহির করিয়া চিল্কাহ্রদ মধ্যে উহা প্রোথিত পূর্ব্বক নিশ্চিন্ত মনে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এদিকে কালাপাহাড়ও সাধ্যমত চেষ্টা করিয়া সেই পবিত্রমূর্ত্তির সন্ধান এবং বাহির পূর্ব্বক সমুদ্রতীরে উহাকে ভস্মে পরিণত করিয়া পূর্ব্বক্রোধের শাস্তি করিলেন। তাহার পর এখান হইতে সদলে জৌনপুর, কাশীধাম, আরও বহুবিধ হিন্দুদিগের প্রসিদ্ধ তীর্থ স্থানে উপস্থিত হইয়া ক্রমান্বয়ে আট বৎসর কাল ইচ্ছামত তিনি হিন্দু দেবদেবীর বিগ্রহমূর্ত্তির উপর অমানুষিক অত্যাচার করিয়াছিলেন।

কথিত আছে যে সময় কালাপাহাড় কাশীতে সদলে উপস্থিত হইয়া অত্যাচার করিতে আরম্ভ করেন, সেই সময় দেবদেবীর বিগ্রহমূর্ত্তি ব্যতীত কাহার আদেশে, তাহারই অধীনস্থ লোক দ্বারা এক যুবতীর উপর অমানুষিক অত্যাচার করা হয়। প্রবাদ—এই যুবতী কালাচাঁদ রায়ের মাতুলানী। তিনি যে এখানে অবস্থান করিতেছেন, ইতিপূর্ব্বে কালাচাঁদ তাহার কোনরূপ সন্ধান করিতে না পারাতেই এইরূপ প্রমাদ ঘটিয়াছিল। যখন এই নিগৃহীতা রমণী রোদন করিতে করিতে কালাচাঁদের নিকট আত্মপরিচয় দানে, তাহারই সম্মুখে আত্ম-হত্যা করিলেন, তখন এই লোমহর্ষণ দৃশ্যে কালাচাঁদ আন্তরিক দুঃখিত হইয়া যাবতীয় অত্যাচার বন্ধ করিতে আদেশ প্রদান করিলেন ; তাহার অদ্ভুত ক্ষমতার গুণে আজ্ঞামাত্র উহার শান্তি হইল। কিন্তু

কালাচাঁদ এই মর্ম্মান্তিক দুঃখে কাতর হইয়া সেই রাত্রিতেই সন্ন্যাসী-বেশে কোথায় নিরুদ্দেশ হইয়া গেলেন, তাহার আর কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। ইহার ফলে—কাশীতীর্থে একমাত্র প্রাচীন আদি লিঙ্গ "কেদারেশ্বরের" পবিত্র মূর্ত্তি রক্ষা হইয়াছিল। ভক্তগণ! কাশী তীর্থে উপস্থিত হইয়া অদ্যাপি সেই প্রাচীন অনাদি লিঙ্গমূর্ত্তির পূজার্চ্চনা করিয়া আপনাদিগকে চরিতার্থ বোধ করিয়া থাকেন। বর্ত্তমানকালে আমরা কাশীতে যে সমস্ত লিঙ্গমূর্ত্তির দর্শন পাইয়া থাকি, এক ভগবান বিশ্বেশ্বর ও কেদারেশ্বর ব্যতীত সকল মূর্ত্তিগুলিই কালাপাহাড়ের অত্যাচার সময়ের পর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।



শ্রীশ্রীসাক্ষীগোপালজীউর দর্শন যাত্রা।

ভুবনেশ্বর ষ্টেশন হইতে ভগবান সাক্ষীগোপালজীউর দর্শনেচ্ছুক যাত্রীদিগকে সাক্ষীগোপাল নামক যে ষ্টেশন আছে, তথায় অবতরণ করিতে হয়। কলিকাতা হইতে সাক্ষীগোপাল ৩০০ মাইল এবং ভুবনেশ্বর হইতে ২৯ মাইল দূরে অবস্থিত। ষ্টেশনের অনতিদূরে ভগবান সাক্ষীগোপালজীউর পবিত্র মন্দিরটী এক উদ্যানের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত। এই দেবালয়ের দ্বারদেশে প্রবেশ করিবামাত্র একটী প্রস্তরময় স্তম্ভ দেখিতে পাওয়া যায়। মন্দির প্রাঙ্গণে এক স্বচ্ছসলিলা পুস্করিণী আছে, তাহার মধ্যস্থলে একটী ক্ষুদ্র দেবমন্দির প্রতিষ্ঠিত। এই প্রতিষ্ঠিত মন্দিরের মধ্যেই যথাসময়ে ভগবানের চন্দন যাত্রা উৎসব সম্পন্ন হইয়া থাকে। প্রধান মন্দিরের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের পবিত্রমূর্ত্তির দর্শন পাওয়া যায়। এই শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তিই এ তীর্থে সাক্ষীগোপাল নামে খ্যাত।

সাক্ষীগোপাল সম্বন্ধে জনশ্রুতি এইরূপ ;—

পুরাকালে কোন এক সময়, দুই ব্রাহ্মণ শুভলগ্নে শুভদিনে তীর্থ পর্য্যটনে শুভ যাত্রা করেন। ইহাদের মধ্যে একজন বৃদ্ধ, অপরটী যুবাপুরুষ। তাঁহারা উভয়ে যথাক্রমে নানাতীর্থস্থান পরিভ্রমণ করিয়া সর্ব্বশেষে শ্রীধাম বৃন্দাবন (নিত্যধাম যাহা ব্রহ্মাণ্ডের উপর

অবস্থিত) তথায় উপস্থিত হইলে—বৃদ্ধটী পীড়াক্রান্ত হন। যুবাপুরুষটী এই সময় আপন সাধ্যানুসারে বৃদ্ধের সেবা করিয়া তাঁহাকে রোগ হইতে মুক্ত করিলেন। বৃদ্ধ—এই অপরিচিত স্থানে নিঃসহায় অবস্থায় যুবার সেবায় মুগ্ধ হইলেন, কারণ তিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন যে—এই যুবা আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া প্রাণপণে তাঁহার শুশ্রূষা করিয়াছে। জগতে এমন কি কার্য্য আছে, যদ্দারা যুবকের উপকার প্রতিদান করা যায়, সুস্থ হইয়া তিনি এই চিন্তাতেই অধীর হইলেন। অবশেষে মনে মনে নানা তর্কবিতর্কের পর, তিনি তাঁহার প্রাণস্বরূপা একমাত্র আত্মজাকে যুবার করে সমর্পণ করিতে মনস্থ করিলেন। ইহার কারণ এই যে, তিনি মনে মনে যুক্তি করিলেন, এই যুবা আমার স্বজাতি হইলেও কুলমর্য্যাদাতে আমাপেক্ষা বহু নিকৃষ্ট, যদি আমি উহাকে আমার কন্যা সম্প্রদান করি, ইহাতেই ইহার গৌরব বৃদ্ধি পাইবে, তাহা হইলেই আমার দ্বারা এই যুবার বিশেষ উপকার দর্শিবে। এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া বৃদ্ধ—যুবাকে শ্রীহরির সম্মুখে তাঁহার একমাত্র কন্যা সম্প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। এবার যুবা,—বৃদ্ধকে পুণ্য তীর্থস্থানে ভগবান শ্রীগোপালজীউর সম্মুখে অঙ্গীকার করিবার পূর্ব্বে একবার ভালরূপ বিবেচনা করিয়া শপথ করিতে অনুরোধ করিলেন, তখন বৃদ্ধ গম্ভীরস্বরে উত্তর করিলেন, তোমার বলিবার পূর্ব্বে আমি উত্তম রূপ বিবেচনা করিয়াছি এবং পুনর্ব্বার দেবস্থানে শ্রীগোপাল জীউর সম্মুখে অঙ্গীকার করিতেছি যে, "এখান হইতে স্বদেশে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক আমি আমার একমাত্র দুহিতাকে তোমার করে সম্প্রদান করিব।" এইরূপে উভয়ে প্রতিজ্ঞাসূত্রে আবদ্ধ হইয়া আরও বিস্তর তীর্থসেবা করিতে করিতে যথাসময়ে নির্ব্বিঘ্নে স্বদেশে উপস্থিত হইলেন।

কিছুকাল পরে একদা এই যুবক, উক্ত বৃদ্ধের বাটীতে গমন করিয়া তাঁহার পূর্ব্ব অঙ্গীকার স্মরণ করাইয়া বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করিলে—বৃদ্ধ তাঁহার আত্মীয় কুটুম্বদিগকে পূর্ব্ব ঘটনা ও শ্রীগোপালের সম্মুখে শপথের বিষয় প্রকাশ করিলেন; তখন তাঁহার আত্মীয়গণ যুক্তিপূর্ব্বক স্থির করিলেন, বৃদ্ধ দায়গ্রস্ত হইয়া এইরূপ আশ্বাস দিয়াছিলেন মাত্র, তা বলিয়া নীচবংশে কোনরূপেই কন্যা সম্প্রদান করা যাইতে পারা যায় না। বলা বাহুল্য বৃদ্ধও আত্মীয়স্বজনের অমতে কিরূপে অঙ্গীকার পালন করিবেন, উহাই এক মনে চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়—এই যুবা দুঃখিত মনে গ্রামস্থ লোকদিগের আশ্রয় লইয়া পুণ্যময় তীর্থস্থানে শ্রীগোপালের সম্মুখে এই বৃদ্ধের সত্যবন্ধনের বিষয় প্রকাশ করিলেন। স্বভাবসিদ্ধ অহঙ্কারপূর্ণ কুলীনগণ—এবার একযোগে এই যুবাকে অবজ্ঞাসহকারে বিতাড়িত করিবার উপায় স্থির করিয়া বলিলেন, "তুমি বলিতেছ তীর্থস্থান বৃন্দাবনধামে এই বৃদ্ধ—শ্রীগোপালের সম্মুখে কন্যা সম্প্রদান করিবার জন্য সত্যবন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছেন, যদ্যপি তুমি উহা আমাদিগের নিকট প্রমাণ করিয়া দিতে পার অর্থাৎ যদ্যপি তুমি তোমার শ্রীগোপালকে বৃন্দাবন হইতে এই গ্রামে সাক্ষীরূপে হাজির করিতে পার, তাহা হইলে আমরা সকলে মান অভিমান সমস্ত জলাঞ্জলি দিয়া তোমায় কন্যাদান করিতে পারি"। এই সকল কুলীনপুত্রগণের এইরূপ বলিবার উদ্দেশ্য ছিল যে, বৃন্দাবন হইতে শ্রীগোপালজীউ এ গ্রামে সাক্ষীদান করিতে আসিবেন না, আর আমরাও মৌলিক ব্রাহ্মণকে কন্যাদান করিব না।

যুবা এই অসম্ভব বাক্যে হতাশ হইবার পরিবর্ত্তে বরং দ্বিগুণ উৎসাহে তাঁহাদিগকে বিনীতভাবে বলিলেন, "ভদ্রমহোদয়গণ! আপনাদের, বিচারে যদ্যপি এইরূপই স্থির হয়, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই পুনরায়

বৃন্দাবন যাত্রা করিয়া ভগবানকে আপনাদের নিকট এখানে সাক্ষী-স্বরূপ হাজির করিব।” তিনি সগর্ব্বে এইরূপ চীৎকার করিয়া পুনর্ব্বার বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন।

কথিত বিপ্র—এদিকে গোপালরূপ শ্রীহরির শ্রীচরণ একমনে এক প্রাণে ধ্যান করিতে করিতে যথাসময়ে বৃন্দাবনে উপস্থিত হইলেন, এবং করযোড়ে তাঁহার আরাধ্যদেব ভগবান শ্রীগোপালজীউর নিকট আপন অভিযোগ জ্ঞাপন করিলেন, অধিকন্তু তিনি গ্রামস্থ শ্রেষ্ঠ কুলীন দিগের ব্যবহারে আন্তরিক দুঃখিত হইয়া শ্রীগোপালের নিকট নিবেদন করিলেন, “হে প্রভো! এ জগতে ধনীর সহায় সকলেই হয়, কিন্তু গরীবের প্রতি কেহই কৃপা করেন না, আপনি আশ্রিতজনের প্রতি সদয় হইয়া, সত্যবাদীগ্রামে গমন পূর্ব্বক বিবাহের সেই সত্য বন্ধনের বিষয় যথাযথ সাক্ষ্য প্রদান না করিলে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের ধর্ম্মরক্ষা হয় না। আবার বলি—হে ধর্ম্মাবতার! হে আমার হৃদয় সর্ব্বস্ব! আপনি যদ্যপি এ বিষয় অবগত হইয়াও সাক্ষ্য না দেন, তাহা হইলে এই পাপের জন্য আপনাকে সম্পূর্ণ দায়ী হইতে হইবে।”

ভগবান শ্রীহরি—এই সরল হৃদয় ব্রাহ্মণের ভক্তিতে বাঁধা পড়িয়া, তাহাকে মধুর বচনে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক বলিলেন, “হে বিপ্র! তোমার অভিযোগের বিষয় আমি সমস্তই অবগত আছি এবং এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেও প্রস্তুত আছি—কিন্তু মনে রেখো, যখন আমি তোমার সহিত পশ্চাদগামী হইয়া তথায় গমন করিব, তৎকালীন তুমি আমার প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে পারিবে না, যদ্যপি সন্দেহচিত্তে দৈবাৎ ইহার কোনরূপ ত্রুটি হয়—তাহা হইলে নিশ্চয় জানিবে যে আমি সেই স্থানেই অবস্থান করিব, অর্থাৎ আর এক পদও তথা হইতে অগ্রসর হইব না। আর এক কথা—আমি যাইতেছি কিনা ইহার প্রমাণ স্বরূপ তুমি

আমার চরণের নুপূরধ্বনি শুনিতে পাইবে।" এক্ষণে ব্রাহ্মণ শ্রীগোপালের সকল আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া প্রফুল্লমনে স্বদেশাভিমুখে প্রত্যাগমন করিলেন।

এইরূপে ভগবানের কৃপায় ব্রাহ্মণ নির্ব্বিঘ্নে সত্যবাদী গ্রামের নিকটবর্ত্তী হইলে, তিনি আর শ্রীগোপালের নুপূরধ্বনি শুনিতে পাইলেন না, কারণ বালুকারাশি নুপূর মধ্যে প্রবেশ করিয়া ঐ শব্দ বন্ধ হইয়াছিল, ইহার ফলে ব্রাহ্মণ ভগবানের নুপূরের রুণু রুণু শব্দ শুনিতে না পাইয়া বিকলচিত্তে যেমন পশ্চাদ্ভাগে মুখ ফিরাইলেন, সেই সময় ভগবান শ্রীগোপাল তাহাকে পূর্ব্ব অঙ্গীকার স্মরণ করাইয়া অনুমতি করিলেন—"ব্রাহ্মণ! আমি এই স্থান হইতে আর এক পদও অগ্রসর হইব না। তুমি আমার আদেশ মত সেই বৃদ্ধ ও তাঁহার আত্মীয় স্বজনকে এই স্থানে আমার আগমন বার্ত্তা জ্ঞাপন কর, তাহা হইলেই তোমার আশা পূর্ণ হইবে।"

আজ্ঞাপ্রাপ্তে ব্রাহ্মণ, তাঁহার আদেশ পালন করিলেন। তখন গ্রামবাসীরা তাহার বাক্যে আশ্চর্য্যান্বিত, এবং প্রীতমনে সদলে এইস্থানে উপস্থিত হইয়া যথানিয়মে শ্রীগোপালের পূজার্চ্চনা করিলেন এবং আপনাপন ত্রুটি মার্জ্জনা করিয়া উক্ত ব্রাহ্মণকে সেই বাকদত্তা কন্যাটী সম্প্রদান করাইয়া বৃদ্ধকে পূর্ব্ব অঙ্গীকার হইতে মুক্ত করাইলেন।

ভগবান শ্রীগোপালজীউ বৃন্দাবন হইতে এইস্থানে সাক্ষীরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন বলিয়া,—এই দেব এ তীর্থে সাক্ষীগোপাল নামে খ্যাত হইয়াছেন। কথিত আছে—ভক্তিপূর্ব্বক এই শ্রীমূর্ত্তির দর্শন করিলে—বৃন্দাবনের শ্রীগোবিন্দজীউর স্বরূপ দর্শন ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। এইরূপে সাক্ষীগোপালজীউর পবিত্র মূর্ত্তি দর্শন করিয়া এখান হইতে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবজীউর দর্শনের জন্য প্রস্তুত হইলাম।

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবজীউ।

সাক্ষীগোপাল ষ্টেশন হইতে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবজীউর শ্রীচরণ বন্দনা করিতে ইচ্ছা করিলে, যাত্রীদিগকে পুরী নামক বিখ্যাত ষ্টেশনে অবতরণ করিতে হয়। কলিকাতা হইতে পুরী ৩১১ এবং সাক্ষী-গোপাল ষ্টেশন হইতে মাত্র ১১ মাইল দূরে অবস্থিত। পূর্ব্বেই উল্লেখ হইয়াছে যে—পুরী উড়িষ্যাদেশের একটী জেলা মাত্র। ইহা সমুদ্র তীরের উপরিভাগে মস্তক উত্তোলন পূর্ব্বক আপন শোভা বিস্তার করিয়া আছে; সুতরাং বলাই বাহুল্য যে এই স্থানটী স্বাস্থ্যপ্রদ। বহু ঘুসঘুসে জ্বরাক্রান্ত ব্যক্তিরা ইহার তীরে বাস করিয়া উক্ত ব্যাধি হইতে পরিত্রাণ পাইয়া থাকেন।

পুরী সীমামধ্যে পুলিস ষ্টেশন, বিচারালয়, পণ্যদ্রব্য, গাড়ী, পাল্কী ও পসারীদিগের দোকান সকল বর্ত্তমান থাকায়, এ দেশবাসীদিগকে কোন বিষয়ে কোনরূপ অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না। সরকার বাহাদুরের আদেশে এখানে পাঁচ আইন প্রবল থাকায় বিদেশী যাত্রীদিগকে সময় সময় অত্যন্ত কষ্টভোগ করিতে হয় অর্থাৎ রাস্তার নির্দ্দিষ্ট স্থান ব্যতীত কেহ প্রস্রাব বা অপরিষ্কার জল ত্যাগ করিলে, স্থানীয় চৌকী-দারেরা তাহাকে ধরিলেই কিছু না কিছু জরিমানা দিতে হয়।

ভগবান জগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরটী ভারতের এক শিল্পনৈপুণ্যের দিগন্তবিস্তারী কীর্ত্তিস্তম্ভ। ইহা পূর্ব্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত এবং চারিভাগে

বিভক্ত, যথা ;—ভোগমন্দির, জগমোহন, নাটমন্দির ও পীঠস্থান বা রত্নবেদী। কথিত আছে এই রত্নবেদীটী লক্ষশালগ্রামশিলার উপর নির্ম্মিত হইয়াছে। শ্রীমন্দিরের তলদেশ হইতে অগ্রভাগ পর্য্যন্ত সমস্তই প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত। ভারত বিখ্যাত ভগবানের এই শ্রীমন্দিরটী উচ্চতায় ১২৬হস্ত বা১৮৯ফিট। ইতিপূর্ব্বে আমি ভুবনেশ্বরের অত্যুচ্চ মন্দির দর্শনে মনে মনে স্থির করিয়াছিলাম, ইহার ন্যায় উচ্চমন্দির ভারতবর্ষে আর দ্বিতীয় নাই, কিন্তু সেই ভুবনেশ্বরের মন্দিরের উচ্চতা ১৬৫ ফিট মাত্র। এক্ষণে জগন্নাথদেবের যে মন্দির দর্শন পাইলাম—উহার উচ্চতা ১৮৯ ফিট, সুতরাং এই উভয় মন্দিরের উচ্চতা একত্রে হিসাব করিয়া তুলনা করিলে জানিতে পারা যায় যে—ভুবনেশ্বরের মন্দির অপেক্ষা পুরীর শ্রীমন্দিরটী ২৪ ফিট অধিক উচ্চ। ইহার শিখরদেশে নীলচক্র নামে যে এক চক্র শোভা পাইতেছে—পুরীবাসী পাণ্ডাদিগের নিকট উপদেশ পাইলাম, সেই নীলচক্রটী অতিক্রম ওজনে পাঁচ মন, কিন্তু সমতলভূমি হইতে উহা নিরীক্ষণ করিলে, ইহার উচ্চতাহেতু কিছুতেই ইহাকে এত অধিক ভার বলিয়া বোধ হয় না। প্রবাদ—দুর্ব্বৃত্ত কালাপাহাড় এখানে অত্যাচার করিবার সময় ঐ নীলচক্রটী ভগ্ন করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু ভগবানের মাহাত্ম্যগুণে তিনি কোনক্রমেই উহা কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

কথিত আছে ভগবান শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের দারুমূর্ত্তি, একবার ভক্তি-ভাবে রত্নবেদীর উপর দর্শন করিতে পারিলে—পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণের দশ অবতারের দর্শন ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। এইহেতু কলিকালে সকল তীর্থের সার—শ্রীক্ষেত্র এবং সকল দেবের শ্রেষ্ঠ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব।

জগদ্বন্ধুর এই শ্রীমন্দিরের চারিদিকে চারিটী দ্বার শোভা পাইতেছে। উত্তরদিকের দ্বারে—দুইটী হস্তিমূর্ত্তি স্থাপিত থাকায়, উহার নাম হস্তি-

দ্বার হইয়াছে। দক্ষিণদিকের দ্বারে—দুইটি অশ্বমূর্ত্তি থাকাতে, উহা অশ্বদ্বার নামে খ্যাত হইয়াছে। পশ্চিম দ্বারটী খঞ্জদ্বার নামে প্রসিদ্ধ। পূর্ব্বদ্বারে—দুইটী সিংহমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া, এই দ্বারটী সিংহদ্বার নামে বিখ্যাত হইয়াছে। সিংহদ্বার—অপরাপর তিনটী দ্বার অপেক্ষা শিল্পকার্য্যে শোভিত এবং এই দ্বারটীই ভগবানের দর্শন পথের প্রধান পথরূপে অবস্থান করিতেছে।

সিংহদ্বারের সম্মুখভাগে রেলিং ঘেরা যে একটী চতুষ্কোণাকৃতি উচ্চ স্তম্ভ দেখিতে পাওয়া যায়—উহার নাম অরুণস্তম্ভ। এই অরুণস্তম্ভের মূলদেশটী চতুষ্কোণ বিশিষ্ট গ্রেনাইট প্রস্তরের, কিন্তু ইহার উপরিভাগটী কৃষ্ণ প্রস্তর নির্ম্মিত আবার তাহার গাত্রে পলতোলা আছে—স্তম্ভটী উচ্চতায় অন্যূন ত্রিশ ফিট এবং পরিধি প্রায় পাঁচ ফিট স্থান অধিকার করিয়া আছে। আমরা সদলে পুরীতে উপস্থিত হইয়া "শ্রীলক্ষ্মণ ঘুটে" নামক জনৈক পাণ্ডাকে তীর্থগুরু পদে মান্য করিয়াছিলাম। এক্ষণে সেই লক্ষ্মণঘুটে গত সন ১৩০৭ সালে স্বর্গারোহণ করাতে তাঁহার অবর্ত্তমানে তদীয় পুত্র শ্রীভগবতী ঘুটে সেই স্থান অধিকার করিয়াছেন। তাঁহার ঠিকানা—সিংহদ্বার পোঃ আঃ হরচণ্ডীসা, পুরী। এই নূতন পাণ্ডাটী তাঁহার পিতার ন্যায় মিষ্টভাষী এবং যাত্রীদিগের বিশেষ যত্ন লইয়া থাকেন। পাণ্ডাঠাকুরের নিকট উপদেশ পাইলাম যে—সর্ব্বপ্রথমে এই সুন্দর স্তম্ভটী কোনার্ক নামক সমুদ্রতীরস্থ জগদ্বিখ্যাত সূর্য্যদেবের মন্দিরের পূর্ব্বভাগে অবস্থিত ছিল, কালক্রমে সেই প্রসিদ্ধ মন্দিরটী সংস্কারাভাবে শ্রীহীন হইলে, স্থানীয় পাণ্ডারা পরামর্শ করিয়া সাধারণকে ইহার সৌন্দর্য্য দেখাইবার জন্য তথা হইতে ইহাকে এইস্থানে স্থাপিত করিয়াছেন।

এই সিংহদ্বারেরই সম্মুখভাগে যে প্রশস্ত পাথর বাঁধা রাস্তা দেখিতে

পাওয়া যায়, উহা বড়দাঁড় রাস্তা নামে খ্যাত। পুরী সীমার মধ্যে এরূপ প্রশস্ত রাজপথ আর দ্বিতীয় নাই, আবার ইহার উভয় পার্শ্বে স্থানীয় দোকানী সকল আপনাপন দোকানগুলি সুসজ্জিত করাতে ইহার সৌন্দর্য্য আরও বৃদ্ধি হইয়াছে। আষাঢ় মাসে ভগবানের রথ-যাত্রা উৎসবের সময় এই প্রশস্ত রাস্তার উপর সারি সারি তিনখানি সুবৃহৎ রথ পাশাপাশি সজ্জিত হইয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা দেবীর জন্য অপেক্ষা করিতে থাকে। ইহা হইতেই এই রাস্তা কিরূপ প্রশস্ত—সুধীবৃন্দ তাহা অনুমান করুন। পুরী ষ্টেশন হইতে শ্রীমন্দিরের পদপ্রান্তে পৌঁছিতে যাত্রীদিগকে কমবেশ দেড় মাইল পিলগ্রিমেজ নামক রাস্তার উপর দিয়া অগ্রসর হইয়া তৎপরে বড়দাঁড় নামক এই প্রধান পথে আসিতে হয়। এই প্রশস্ত প্রধান রাস্তাটী সিংহদ্বার হইতে বরাবর গুণ্ডিচাবাটী পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়াছে। বলাবাহুল্য বড় দাঁড় নামক রাস্তাটী প্রস্থে কমবেশ এক শত ফিট।

যাত্রীগণ এই সিংহদ্বারে প্রবেশ করিলেই সর্ব্বপ্রথমে প্রাচীর গাত্রের নিম্নদেশে এক প্রতিষ্ঠিত জগন্নাথমূর্ত্তির দর্শন পাইয়া থাকেন—সেই প্রতিষ্ঠিত পবিত্রমূর্ত্তিটী এখানে "পতিতপাবনজীউ" নামে প্রসিদ্ধ। কথিত আছে সমাজচ্যুত ব্যক্তি এবং অহিন্দুগণ স্থানীয় নিয়মানুসারে শ্রীমন্দির মধ্যে প্রবেশাধিকার পান না। এই স্থানে ভক্তিপূর্ব্বক তাহারা যথানিয়মে ঐ পতিতপাবনজীউকে দর্শন করিলে নিঃসন্দেহে রত্নবেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত মূর্ত্তিত্রয়ের দর্শন ফল প্রাপ্ত হইয়া অন্তিমে মোক্ষপদ লাভ করিতে সক্ষম হন।

দ্বারদেশে পতিতপাবনজীউর প্রতিষ্ঠা হইবার কারণ এই যে;—

পুরাকালে পুরীর জনৈক রাজা চরিত্র দোষে সমাজচ্যুত হন।

পতিত জনের শ্রীমন্দির মধ্যে প্রবেশ নিষেধাজ্ঞা থাকায়,—তিনি পরকালের মুক্তির আশায় বহু অর্থ ব্যয় সহকারে পণ্ডিতমণ্ডলীর ব্যবস্থানুযায়ী এইস্থানে সেই কলির একমাত্র ত্রাণকর্ত্তা "জগন্নাথদেবের" এই পবিত্র মূর্ত্তিটী প্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক আপন পথ পরিস্কার করেন; অধিকন্তু এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে—যদি ধরায় আমার ন্যায় আর কোন অভাগা বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে সে আমার প্রতিষ্ঠিত এই ভগবান পতিতপাবনজীউর পবিত্র মূর্ত্তিটী দর্শন করিয়া আপন মুক্তির পথ প্রশস্ত করিতে সক্ষম হইবে।

তীর্থযাত্রীগণ সর্ব্বপ্রথমে এই সিংহদ্বারে ভগবান পতিতপাবনজীউর পবিত্র মূর্ত্তি দর্শন করিয়া, তৎপরে দ্বাবিংশটী প্রশস্ত প্রস্তর-সোপান অতিক্রম করিলে—প্রথম, তোরণ পার হইয়া দ্বিতীয় তোরণে পৌছিতে পারিবেন। যে ভূখণ্ডের উপর শ্রীমন্দিরটী নির্ম্মিত, উহাই নীলাচল পর্ব্বত। নীলাচল পর্ব্বতটী সমতলভূমি হইতে ২২ ফিট উচ্চ। এই উচ্চ ২২ ফিট স্থান অতিক্রম করিবার সুবিধার নিমিত্ত এখানে ২২টী সোপান প্রস্তুত হইয়াছে। বলা বাহুল্য এই ২২টী ধাপ অতিক্রম করিতে না পারিলে মন্দির-প্রাঙ্গণে উপস্থিত হওয়া যায় না। নীলাচল নামক পর্ব্বত অর্থাৎ শ্রীমন্দিরের প্রাঙ্গণভূমি—দীর্ঘে ৬৬৫ ফিট এবং প্রস্থে ৬৪৪ ফিট। মন্দির প্রাঙ্গণের চতুর্দ্দিক "মেঘনাদ" নামক ২৪ ফিট উচ্চ প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত।

দ্বিতীয় তোরণে জগন্নাথদেবের মাহাত্ম্য দর্শনে আনন্দে অধীর হইতে হয়, কেননা এখানে আনন্দনাড়ু ও শুস্ক মহাপ্রাসাদের সারি সারি দোকান সকল শোভা পাইতেছে, এই সকল দোকানীদিগের উড়ে বুলি এবং ভাবভঙ্গি দেখিলে কত আনন্দ অনুভব করিবেন তাহার ইয়ত্তা নাই। পাণ্ডাঠাকুরের নিকট উপদেশ পাইলাম, সাধারণে এখানে

এই মহাপ্রসাদ বিক্রয় করিবার অধিকার পায় না, যাহারা বংশানুক্রমে ইহা বিক্রয় করিতেছে, তাহারাই এই শুষ্ক মহাপ্রসাদ বিক্রয় করিবার অধিকার পাইয়া থাকেন, কিন্তু ইহা বিক্রয় অধিকার লাভের জন্য তাহাদিগকে পুরী রাজের নিকট বিস্তর অর্থ ব্যয় করিয়া ছাড়পত্র লইতে হয়। এই দ্বিতীয় তোরণের পূর্ব্বধারে—আনন্দবাজার ও স্নানমঞ্চ আপন শোভা বিস্তার করিয়া আছে।

আনন্দ বাজার যেমন নামে শ্রবণ মধুর, দর্শনেও সেইরূপ—প্রীতি-প্রদ। এই আনন্দ বাজারে ছোট বড় সকল প্রকার "আট্‌কেভোগ" পাওয়া যায়। এ তীর্থে অন্ন, ডাল, খেচারন্ন, ব্যঞ্জন প্রভৃতি সমস্ত ভোগই মহাপ্রসাদ নামে খ্যাত, অর্থাৎ যে সকল আহার্য্য সামগ্রীতে শ্রীশ্রীজগন্নাথ, বলভদ্র ও সুভদ্রা দেবীর ভোগ হয়—সেই সমস্তই মহা-প্রসাদ নামে প্রসিদ্ধ। যে সকল পাত্রে এই মহাপ্রসাদ রন্ধন হইয়া প্রস্তুত হয়, উহাই এ তীর্থে আট্‌কে নামে বিখ্যাত। সাধারণতঃ এখানে দেখিতে পাওয়া যায় যে—যে সকল ডাইল বা আনাজপত্র সহজে পাক হইতে পারে, সেইরূপ দ্রব্যেই ভগবানের ভোগের প্রসাদের ব্যঞ্জনরূপে ব্যবহার হইয়া থাকে। স্থানীয় পাণ্ডাদের মতে "আলু" অপবিত্র, এই নিমিত্ত ভগবানের ভোগে ইহা ব্যবহার হয় না। অড়হর ডাইলই—এখানকার সর্ব্বাপেক্ষা সুস্বাদু।

গঙ্গাজল যেরূপ চণ্ডালস্পর্শে অপবিত্র হয় না, এই মহাপ্রসাদও সেইরূপ কিছুতেই অপবিত্র হয় না। ইহা ক্রয় বিক্রয় উভয় বিষয়ে দোষ স্পর্শে না। কথিত আছে বহু দূরদেশ হইতে ইহা শুস্কাবস্থায় আসিলেও শুদ্ধ অর্থাৎ মহাপ্রসাদ যে অবস্থায় যেখানেই পাওয়া যায়, ভক্তচিত্তে সেই অবস্থায়ই উহা গ্রহণ করা উচিত। এই মহাপ্রসাদ ভক্তিসহকারে ভক্ষণ করিলে, জগন্নাথ দেবের কৃপায় দেহস্থ যাবতীয়

[illegible] হইয়া থাকে। এ তীর্থে কোন যাত্রীকে রন্ধন করিয়া [illegible] নাই, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই দেখিতে পাওয়া যায় —যাত্রী এখানে যত অধিক হউক না কেন, মা লক্ষ্মীর কৃপায় কখন কাহাকেও মহাপ্রসাদের জন্য ভাবিতে হয় না। তাই আবার বলি—ধরামাঝে ইহার সমকক্ষ তীর্থ আর দ্বিতীয় নাই। ধন্য জগন্নাথদেব! ধন্য তোমার মাহাত্ম্য!!

যাত্রীগণ আনন্দ বাজারে উপস্থিত হইয়া মনের সুখে এই মহাপ্রসাদ খরিদ করিবার সময় দেখিতে পাইবেন—কত ব্রাহ্মণ স্বেচ্ছায় কত হিন্দু বৈশ্য ও শূদ্রদিগের মুখে কিছু অর্থ লাভের আশায় সেই মহাপ্রসাদ তুলিয়া দিতেছেন এবং তাঁহাদের প্রদত্ত এই প্রসাদ আহ্লাদের সহিত ভক্ষণ করিতেছেন। কেহ আপত্তি করিলে,তাঁহাদের নিকট উপদেশ পাইবেন—রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের প্রতি জগন্নাথদেব সদয় হইয়া বরদানে প্রস্তুত হইলে, তিনি তাঁহার নিকট এই প্রার্থনা করিয়াছিলেন "পুরীতীর্থে আগত যাত্রীরা যেন পরস্পর পরস্পরে বিদ্বেষ ভাব হৃদয় হইতে অপসারিত করিয়া এক মনে এক প্রাণে জাতিভেদ ভুলিয়া একের উচ্ছিষ্ট প্রসাদ নির্ব্বিকারচিত্তে সহাস্যে অপরের মুখে তুলিয়া দিয়া আপনার মহত্ব প্রকাশ করিতে সক্ষম হয়।" রাজার প্রার্থনায় ভগবান তাঁহার আশা পূর্ণ করিয়াছিলেন, তদবধি এ প্রথা এখানে বিলুপ্ত হয় নাই, কলিকালে —কখনও যে ইহার ব্যতিক্রম ঘটিবে এরূপ ধারণা হয় না। আবার ভক্তচূড়ামণি রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের আদেশে এই ক্ষেত্রসীমা মধ্যে কোন যাত্রী রন্ধন করিতে অধিকার পান না।

আনন্দ বাজারের পূর্ব্বধারে "স্নানমঞ্চ" নামে যে একটী উচ্চ বাঁধান বেদীর দর্শন পাওয়া যায়, স্নানযাত্রার নির্দ্দিষ্ট সময়ে—রত্নবেদী হইতে

যথানিয়মে ত্রিমূর্ত্তিকে এই স্থানে আনয়ন পূর্ব্বক অতি সমারোহে উৎসব সম্পন্ন হইয়া থাকে।

এইস্থানে একটী কথা বলিবার আছে—যাত্রিগণ! যখন এখানকার শ্রীমন্দির মধ্যে প্রবেশ করিবেন, তখন কর্ত্তব্যবোধে চামড়ার মণিব্যাগ, হাড়ের বাঁটের ছুরি প্রভৃতি অস্পৃশ দ্রব্যগুলি নিকটে থাকিলে উহা বাহিরে রাখিয়া যাইবেন, কারণ স্থানীয় নিয়মানুসারে এইরূপ অস্পৃশ দ্রব্য, কোন পাণ্ডা, কোন যাত্রীর নিকট দেখিতে পাইলে, সেই দ্রব্য স্পর্শে দেবতার ভোগ পর্য্যন্ত অস্পৃশ্য হইল বিবেচনা করিয়া তাঁহার লাচ্ছনা ভোগ করিয়া থাকেন।

দ্বিতীয় তোরণের পর ভোগ মন্দিরে উপস্থিত হওয়া যায়। এই ভোগ মন্দিরেই ভগবানের যথানিয়মে ভোগ হইয়া থাকে। যে সকল ভোগ—ভক্তগণ দ্বারা প্রদত্ত হয়, সেই আট্‌কিয়া ভোগ এই মন্দির মধ্যেই হইয়া থাকে, আর পুরীরাজ প্রদত্ত যে ভোগ দেওয়া হয় উহা মন্দির মধ্যেই সম্পন্ন হয়। ভোগমন্দিরের দুই ধারে দুইটী দ্বার আছে। সেই দ্বার দুটী সদাসর্ব্বদা বন্ধ থাকে, কারণ সহসা কোন যাত্রী ইহার মধ্যে প্রবেশ করিলে উক্ত ভোগ নষ্ট হইয়া যায়।

ভোগমন্দিরের নানাবিধ সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে করিতে আমরা সদলে গরুড়স্তম্ভ নামক ফটক দিয়া বরাবর রত্নবেদী দর্শন করিবার অভিলাষে অগ্রসর হইতে লাগিলাম, এইরূপে এক সুবৃহৎ ফটকে প্রবেশ করিবামাত্র তাহার সম্মুখভাগে যে গোলাকৃতি প্রশস্ত স্তম্ভ দেখিতে পাইলাম—উহাই গরুড়স্তম্ভ নামে খ্যাত। এই বিশাল স্তম্ভের উপরিভাগে—নারায়ণ বাহন "গরুড়"একমনে একপ্রাণে তাঁহার শ্রীচরণ ধ্যান করিতেছেন। এ মূর্ত্তি যিনিই দেখিবেন, তিনিই মুগ্ধ হইবেন সন্দেহ নাই। ভক্তগণ প্রতি সন্ধ্যার সময় যথানিয়মে এই স্তম্ভের পদপ্রান্তে

[illegible] জ্বালাইয়া আপনাদিগকে চরিতার্থ বোধ করিয়া থাকেন।

গরুড়স্তম্ভের পরই নাটমন্দির আপন শোভা বিস্তার করিয়া আছে। এই নাটমন্দিরের দেওয়ালে নানাপ্রকার চিত্র সকল অঙ্কিত থাকায় ইহা এক অপূর্ব্ব শোভায় শোভিত হইয়াছে। তাহার পর অংশর পিণ্ড, অর্থাৎ এই নির্দ্দিষ্ট স্থানেই যথাসময়ে যথানিয়মে মূর্ত্তিত্রয়ের অঙ্গরাগ হইয়া থাকে। নাটমন্দিরের শেষসীমায়, যথায় কাষ্ঠের রেলিং ঘেরা আছে, ভক্তগণ—আপনাপন পাণ্ডার সাহায্যে সেই স্থান হইতে ধূলাপায়ে ভগবানের ঝাঁকি দর্শন পাইয়া চরিতার্থ বোধ করিয়া থাকেন।

এই রেলিং ঘেরা স্থান হইতে রত্নবেদী বহুদূরে অবস্থিত এবং অন্ধকারময়, কেবলমাত্র একটী সুবৃহৎ প্রজ্জ্বলিত প্রদীপের আলোক থাকায়, তখন মূর্ত্তিগুলির ভালরূপ দর্শন ঘটে না, কিন্তু রাত্রিকালে রত্নবেদীর চারিধারে সমস্ত আলোকমালা যখন প্রজ্জ্বলিত হয়, তখন সেই পবিত্র মূর্ত্তিগুলির সুচারুরূপে দর্শনলাভ হইয়া থাকে।

পাণ্ডার উপদেশ মত আমরা সদলে ধূলাপায়ে প্রথমে এই রেলিং ঘেরা স্থান হইতে ভগবানের দর্শন করিবার সময় দেখিলাম—আমাদের ন্যায় আরও কতজন এইস্থানে হাটু গাড়িয়া পাপ হইতে মুক্তি পাইবার আশায় "জয় জগবন্ধু" ! স্বরে যুক্তকরে তাঁহার স্তব করিতেছেন। বলা বাহুল্য এই পবিত্র স্থানে উপস্থিত হইবামাত্র সকলেরই মনোমধ্যে কি এক অনির্ব্বচনীয় পবিত্র ভাবের উদয় হয়, উহা লেখনীর দ্বারা ব্যক্ত করা যায় না। এইরূপে প্রথম দিনে ভগবানের ঝাঁকি দর্শন লাভে পথভ্রমণের যাবতীয় কষ্টের অবসান করিয়া বিশ্রামের জন্য বাসাবাটীতে যাত্রা করিলাম।

পরদিবস যথাসময়ে স্নান আহ্নিক সমাপনান্তে [illegible] পরিধান করিয়া পাণ্ডার সাহায্যে রত্নবেদীর উপ[illegible] করিয়া যে কত আনন্দ অনুভব করিলাম, উহা লেখনার দ্বারা ব্যক্ত করা অসাধ্য। যে দেবের দর্শনের কাঙ্গাল হইয়া কত অর্থব্যয়, কত কষ্ট সহ্য করিয়া করুণাময়ের কৃপায়—সংসারের কত বিঘ্ন ও মায়া ছিন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম, তজ্জন্য তাঁহার শ্রীচরণে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া মহাব্রত উদযাপন করিলাম, এবং মনে মনে ভাবিলাম পূর্ব্বজন্মের তপস্যা বা পুণ্যবলে আজ সাক্ষাৎ কলির একমাত্র ত্রাণকর্ত্তা জগন্নাথদেবের দারুমূর্ত্তি দর্শন পাইলাম। এখানে যাহার যেরূপ অভিলাষ তিনি সেইরূপই মানত করিতে থাকেন, আমি আর কি মানত করিব—কেবল প্রাণ ভরিয়া সেই দেবমূর্ত্তিগুলি দর্শন করিতে করিতে প্রার্থনা করিলাম, "ভগবান্! যেন শ্রীচরণে সদাসর্ব্বদা সুমতি থাকে।"

অনেকেই জগন্নাথ দেবের পবিত্র বিরাট মূর্ত্তির দর্শন করিয়া থাকেন, কিন্তু কখন কি কেহ এ মূর্ত্তির ভাব হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন? এ দেবের কৃষ্ণবর্ণ বিশাল বদনখানি নীলাকাশের সহিত তুলনা হয়, তাঁহার গোল গোল সমুজ্জ্বল চক্ষুদ্বয়, কর্ণহীন মুখশ্রী, আবার অঙ্গুলী বিহীন অবস্থায় বাহুমাত্র রাখিয়া অবস্থান করিতেছেন, অবয়বের মধ্যে প্রকাণ্ড উদর ভিন্ন শ্রীচরণ দর্শন পাইবার উপায় নাই। ইহাতেই প্রকাশ পাইতেছে—বহু তপস্যার ফলে যে চরণ দর্শন লাভ হয়, সেই পাদপদ্ম দর্শন কি সহজসাধ্য! ভগবানের চরণ দর্শন পাইবামাত্র প্রাণী যে—উদ্ধার হইবে, তখন তাহার কর্ম্মফল কে ভোগ করিবে? এই কারণে তিনি উহা লুকাইয়া রাখিয়াছেন। পূর্ণব্রহ্ম দারুরূপ জগন্নাথ দেব, কলিকালে স্বেচ্ছায় ধরায় এই মূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হইয়া অবোধ মানবদিগকে উপদেশ দিতেছেন—"তোমরা দিবারাত্র যাহা কিছু করিতেছ, চক্ষু

তৎসমুদয়ই আমি দেখিতে পাইতেছি।
তিনি বলিতেছেন—আমি মনুষ্যদিগকে
বিশিষ্ট সৃজন করিয়াছি, উহাদের
দ্বারা তাহারা আপনাপন কার্য্য উদ্ধার করিয়া লয়। আমার হস্তের অঙ্গুলী না থাকায়, আমার দ্বারা তোমাদের কোন কার্য্য হইবে না; যে ব্যক্তি যেরূপ কার্য্য করিবে, সে সেই রূপই ফলভোগ করিবে অর্থাৎ পুণ্যকর্ম্মকর—পুণ্যের ফল পাইবে, পাপকার্য্যকর—পাপের প্রতিফল পাইবে। কর্ণ না থাকার কারণ এই যে, তিনি পাপীদিগের—পাপ ভোগের ক্রন্দন শ্রবণ করিতে অনিচ্ছুক। ভববানের দারুমূর্ত্তির প্রকাণ্ড উদর প্রকাশ করিতেছে—আমার উদর মধ্যেই জগৎব্রহ্মাণ্ডকে স্থান দিয়াছি। ইতিপূর্ব্বে অর্থাৎ দ্বাপরযুগে গোকুল নগরে শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়া আমি আমার ক্ষুদ্র মুখ মধ্যে যশোদা দেবীকে ব্রহ্মাণ্ড দর্শন করাইয়াছিলাম আর এক্ষণে সেই ব্রহ্মাণ্ডকে যদি কেহ দর্শন করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে আমার উদর মধ্যেই দেখিতে পাইবে। পাপ-পুণ্য ভোগকারী হিন্দু নরনারীদিগকে শিক্ষা দিবার নিমিত্তই তিনি রত্নবেদীর উপর এইরূপ মূর্ত্তিতে অবস্থান করিতেছেন।

মায়াময়ের প্রধান মায়া "আমার" এই আমার নামক মহামায়ায় জীবমাত্রেই সমাচ্ছন্ন। প্রমাণস্বরূপ দেখুন—আমার ধন, আমার পুত্র, আমার কন্যা, যে আমার শব্দের তুলনা নাই, কিন্তু "আমি যে কাহার" সে বিষয় কি একবার কেহ চিন্তা করিতেছেন?

কলীপাবন মহাত্মা শ্রীরামকৃষ্ণদেব স্বয়ং বলিয়াছিলেন, মানুষের "আমার ও আমি" ক্ষুদ্র হইয়াও প্রবল শক্তিশালী—ইহাদের কবল হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে, পরের সঙ্গে আপনার বিনিময় করিতে হয়। আমরা তাহা পারি নাই বলিয়াই এই ক্ষুদ্র "আমার ও আমি"

লইয়া অভিমানের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন
আমাদের চতুর্দ্দিকে এত চরম অনর্থের সৃষ্টি দ্ধিময় জগতে—পরম দারিদ্র ভোগ করিয়া আমরা পদে পদেই বিড়ম্বিত। এই সর্ব্বনাশকর আমারত্বের বা আমিত্বের অহঙ্কার বিসর্জ্জন না দিতে সক্ষম হইলে কেহই কখন সুখী হইতে সক্ষম হয় না। সে যাহা হউক, পাণ্ডার উপদেশ মত এই রত্নবেদীটী তিনবার প্রদক্ষিণ করিবার সময় কলির একমাত্র ত্রাণকর্ত্তা "জগন্নাথ" দেবের নিকট কায়মনচিত্তে অভিলষিত মানত প্রার্থনা পূর্ব্বক যখন সহযাত্রীদিগের ঠেলায় অস্থির হইয়া বাহিরে আসিতে বাধ্য হইলাম, তখন সাধ্যমত এই সকল দারুব্রহ্মরূপ মূর্ত্তিগুলির পুনঃপুনঃ দর্শন করিতে লাগিলাম—কেননা এ রূপের তুলনা নাই—এ দর্শনতৃষ্ণা কিছুতেই পরিতৃপ্ত হয় না।

রত্নবেদীটী দীর্ঘে ১৬ ফিট এবং উর্দ্ধে ৪ ফিট, ইহার উপর পূর্ব্বমুখে সারি সারি মূর্ত্তিত্রয় স্থাপিত হইয়াছে। সর্ব্বপ্রথমে—সুদর্শন, তৎপরে জগন্নাথ, তাহার পর সুভদ্রা, সর্ব্বশেষে বলভদ্রদেবের মূর্ত্তি বিরাজমান। এই রত্নবেদীর বহির্ভাগে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গজীউর চরণ পাদুকা, শয্যা, কমুণ্ডলু ও নানাবিধ পবিত্র চিহ্নগুলি স্থানীয় পূজারীরা যাত্রীদিগকে দর্শন করাইয়া—তিনি যে নানা তীর্থ পর্য্যটন পূর্ব্বক শেষে এই স্থানে জগবন্ধুর শ্রীঅঙ্গে মিলিত হইয়াছেন, উহাই প্রমাণ করাইয়া থাকেন।

প্রত্যহ চারিবার এখানে যথানিয়মে জগন্নাথদেবজীউর ভোগ হইয়া থাকে। প্রথম ভোগের নাম—বাল্যভোগ। দ্বিতীয় ভোগের নাম—খেচরান্ন ভোগ। তৃতীয় ভোগের নাম—সন্ধ্যাধূপ। এবং চতুর্থ ভোগটী—বড়শৃঙ্গার নামে খ্যাত।

প্রাতঃকালে যথানিয়মে দুন্দুভিধ্বনি করিয়া দেবতাকে নিদ্রা হইতে উঠান হয়। তৎপরে দন্তধাবন জন্য দণ্ডকাঠি দেওয়া হয়, তাহার পর

চির প্রথানুসারে বিগ্রহমূর্ত্তিদিগকে চন্দনাদি লেপন সহকারে বস্ত্র পরান হইয়া থাকে। উপরোক্ত নিয়মগুলি সমাপ্ত হইলে—সর্ব্বপ্রথমে বাল্য ভোগ, তাহার পর দ্বিতীয় ভোগ হয়। এই দ্বিতীয় ভোগের সময়—অন্ন ব্যঞ্জনাদির সহিত পৃথক খিচুরীভোগ দেওয়া হইয়া থাকে, এই নিমিত্ত দ্বিতীয় ভোগটী—খেচরান্ন ভোগ নামে খ্যাত। উপরোক্ত নিয়মগুলি যথাসময় যথানিয়মে পালন হইলে পর, দেবতার আরতি হইয়া বিশ্রামের জন্য মন্দির দ্বার বন্ধ হইয়া থাকে। এইরূপে অপরাহ্ন চারি ঘটিকা পর্য্যন্ত বিশ্রামের পর আবার অতি সমারোহে "বৈকাল-ভোগ" হইয়া থাকে। বৈকাল ভোগে—খাজা, গজা, দধি, পকান্ন (পান্তভাত) প্রভৃতি সংযোগে ভোগ হইয়া থাকে।

এই স্থানে একটী কথা বলিবার আছে—কি মধ্যাহ্ন ভোগ, কি শৃঙ্গার ভোগ, এই উভয় ভোগের সময় চিরপ্রথানুসারে স্থানীয় নটীরা নৃত্যগীত সহকারে দেবতার মাহাত্ম্য প্রকাশ করিতে থাকে, তৎপরে পাণ্ডাগণও চামর ব্যজন করিতে করিতে সুমধুর স্বরে জগবন্ধুর স্তবগুণ এবং সুবৃহৎ কাঁসরধ্বনিতে মন্দির প্রতিধ্বনিত করিয়া থাকে। ইহা এক অপূর্ব্ব দৃশ্য!!

রাত্রিকালে দেবতার যে শেষ ভোগ হইয়া আরতি হয়—উহাই শৃঙ্গার ভোগ, আর যে আরতি হয়, তাহাই শৃঙ্গার বেশ নামে কথিত। শৃঙ্গারবেশকালে মূর্ত্তিত্রয়কে বিবিধ বেশভূষায় সজ্জিত করাইয়া নানা-প্রকার আহার্য্য সামগ্রীতে ভোগ প্রদান হইয়া থাকে। এ তীর্থে আসিয়া যিনি ভগবানের শৃঙ্গারবেশ দর্শন না করিয়াছেন, তাহার সকল অর্থই বাজে খরচ হইয়াছে বলিতে হইবে।

পুরীতীর্থের আনন্দ বাজারে—যে সকল আট্‌কে ভোগের বর্ণ ময়লা ও মোটা চাউলে প্রস্তুত, উহাই জগন্নাথ দেবের ভোগ, আর যে সকল

ভোগ সাদা ধপ্‌ধপে ও সরু চাউলের প্রস্তুত—উহা বলভদ্রদেবের ভোগ বলিয়া জানিবেন, সুভদ্রাদেবীর ভোগও ঠিক বলরামের ভোগের ন্যায় সুশ্রী।

রত্নবেদী দর্শনের পর আমরা পাণ্ডার সহিত সদলে পশ্চিম দ্বার দিয়া অক্ষয় বটবৃক্ষ তলে উপস্থিত হইবামাত্র দেখিলাম—অনেক বন্ধ্যানারী ফল পতনের আশায় ইহার তলে আপনাপন অঞ্চল বিস্তার করিয়া অপেক্ষা করিতেছেন। কথিত আছে যাহার অঞ্চলে এই বৃক্ষ হইতে ফল পতিত হইবে—স্থানমাহাত্ম্য গুণে তিনি পুত্র লাভ, যাহার অঞ্চলে ফলিকা (কুশী) পতিত হইবে—তিনি কন্যারত্ন লাভ করিবেন, কিন্তু যাহার অদৃষ্ট অত্যন্ত মন্দ, তিনি এই দুয়ের মধ্যে কোনটীই প্রাপ্ত হইবেন না।

বাহির প্রাঙ্গণ হইতে শ্রীমন্দিরের দৃশ্য অতি উত্তমরূপে দর্শন পাওয়া যায়। পূর্ব্বেই উল্লেখ হইয়াছে যে এই মন্দির ভারতের শিল্পনৈপুণ্যের এক দিগন্তবিস্তারী কীর্ত্তিস্তম্ভ। ইহার বিশেষত্ব এই যে—বিশ্বকর্ম্মা এই শ্রীমন্দিরটী এরূপ প্রণালীতে নির্ম্মাণ করিয়াছেন যে, মন্দিরের ছায়া ইহার গাত্র মধ্যেই পতিত হয়, অন্য কোন স্থানে দেখিতে পাওয়া যায় না। মন্দিরের পূর্ব্বদিকে অর্থাৎ পশ্চাদ্ভাগের নিম্নদেশে একাদশী দেবী একমনে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্তব করিতেছেন। এ ক্ষেত্রে ভক্তি পূর্ব্বক এই দেবীকে দর্শন করিলেই জগবন্ধুর কৃপায় একাদশী নামক মহাব্রতের সমস্ত ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই কারণে এ তীর্থে একাদশীর উপবাস নাই।

শ্রীমন্দিরের উত্তর ও দক্ষিণদিকের উপরিভাগে উত্তমরূপে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে, অনেকগুলি বৃহদাকার অশ্লীল মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়; এতদ্ভিন্ন বিস্তর দেবদেবী ও সাধু সন্ন্যাসীদিগের প্রতিমূর্ত্তির দর্শন

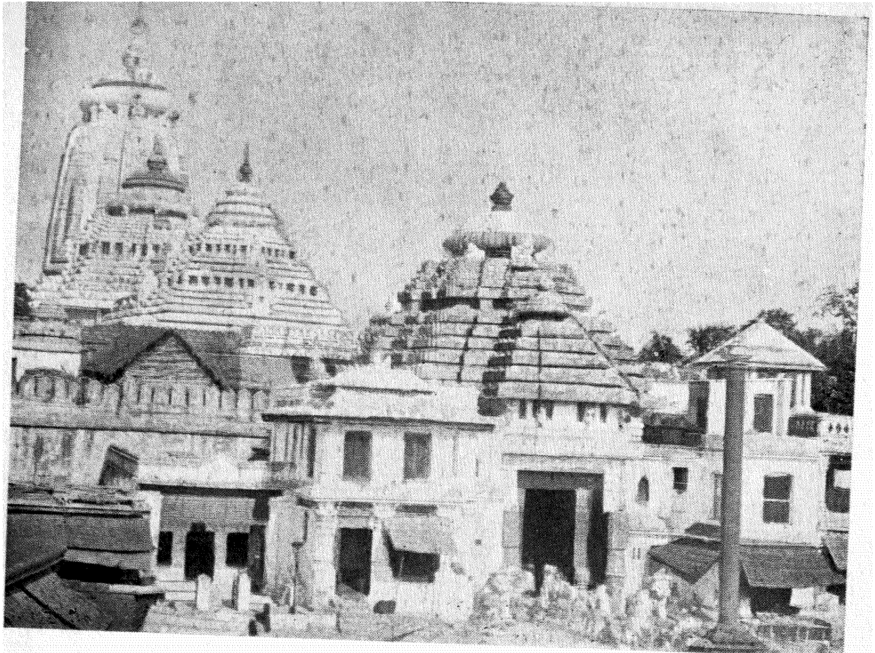
পাওয়া যায়। এই পুণ্যময় পবিত্র স্থানে মন্দির গাত্রে এরূপ অশ্লীল মূর্ত্তি-গুলি স্থাপিত দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম এবং পাণ্ডাঠাকুরকে ইহার বিষয় জিজ্ঞাসা করাতে যে উপদেশ পাইলাম উহাতেই স্তম্ভিত হইলাম। আমাদিগকে আশ্চান্বিত দেখিয়া তিনি স্বেচ্ছায় উপদেশ দিলেন—"শিষ্যগণ! অধীর হইওনা, শ্রীমন্দিরের সহিত এই জগৎসংসারের সমস্তই সংস্রব দেখিতে পাইবে, তাই—এ মন্দির গাত্রে কতকগুলি অশ্লীল, কতকগুলি ভগবানের অবতার ও কতকগুলি সাধুসন্ন্যাসী ও ঋষি মূর্ত্তির দর্শন পাওয়া যায়।

সাধু সংসর্গ ব্যতীত ভগবানের দর্শন পাওয়া যায় না। সংসার মাঝে জগৎ স্রষ্টার—সৃষ্টিলীলা সমস্তই বর্ত্তমান। স্ত্রী পুরুষের সংযোগ ভিন্ন মানবদিগের সৃষ্টি হয় না, তজ্জন্যই মন্দির গাত্রে অশ্লীল সংযোগ চিত্র দেখিতে পাইতেছেন। এইরূপ আবার সাধু সন্ন্যাসীর যাতায়াত ভিন্ন সংসারের উন্নতি সাধন হয় না, এই জন্য ইহাতে সাধু সন্ন্যাসীদিগের মূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছে। জগৎপাতা জগদীশ্বরকে সময় সময় দুষ্টদিগকে দমন করিবার জন্য অবতাররূপে ধরায় অবতীর্ণ হইতে হয়, সেই কারণ মন্দির গাত্রে—তাঁহার অবতার মূর্ত্তি যথা;—বামন, নরসিংহ, শ্রীরামলক্ষ্মণ ও শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতির দর্শন পাইতেছেন।

সন্ন্যাসী—যাঁহারা সুস্বাদুভক্ষ্য ভোজন করেন না, বা দৈবাৎ ভোজন করেন, যাঁহারা স্ত্রীলোকের সহিত সহবাস দূরের কথা তাহাদের মুখ পর্য্যন্ত দর্শন করেন না, যাঁহারা গৃহীর নিকট হইতে—বাঞ্ছিত ও ভক্ষ্যবস্তু প্রার্থনা করেন না, অর্থাৎ যাঁহারা ব্রতী—তাঁহারাই সন্ন্যাসী। এইরূপ আবার ঋষি শব্দের অর্থ—মন্ত্রদ্রষ্টা। বেদমন্ত্র ব্রহ্মার মুখ নিঃসৃত হইয়া যাঁহাদের হৃদয়ে অবতরণ করিয়াছিল, তাঁহারাই ঋষি

নামে খ্যাত। যন্ত্রের অন্তর্ভূত সত্যের সাক্ষাৎ দর্শন—ঋষিত্বের একমাত্র নিদান। ফলকথা—শ্রীমন্দিরটী ভক্ত এবং অভক্ত উভয়েরই পরীক্ষাস্থল; যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে একবার মাত্র ভগবানের দারুমূর্ত্তি দর্শন করিবেন, তিনি নিঃসন্দেহে সকল পাপ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া অন্তে বৈকুণ্ঠে স্থান প্রাপ্ত হইবেন। দিনান্তে এখানে কত লোক জগন্নাথ দেবকে দর্শন করিয়া উদ্ধার হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই, কিন্তু ঐ সকল দর্শকদিগের মধ্যে কে ভক্ত এবং কে অভক্ত উহা পরীক্ষার নিমিত্তই এই সকল কুরুচিপূর্ণ অশ্লীল চিত্রমূর্ত্তি অঙ্কিত করা হইয়াছে। শ্রীমূর্ত্তি দর্শনের পূর্ব্বে যে কেহ এই সকল চিত্র দেখিয়া দেবতার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করেন তিনি পুণ্যের পরিবর্ত্তে কেবল পাপ সঞ্চয় করিয়া থাকেন, অর্থাৎ ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে কিছুতেই তিনি শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিতে পারেন না। এই নিমিত্ত যাত্রীগণ আমাদের নিকট আসিলেই সর্ব্বাগ্রে আমরা দারুমূর্ত্তির দর্শন করাইয়া তৎপরে তাহাদিগকে এখানকার অপরাপর দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখাইয়া থাকি। কেননা—ইন্দ্রিয় দমন করিতে পারিলেই চিত্তে আপনাপনি প্রসন্নতা লাভ হয়, তদ্দ্বারা ভগবানের দর্শন পাওয়া যায়। কথিত আছে, ইন্দ্রিয়ের বিষয় প্রথমে চিন্তা করিতে করিতে আসক্তি জন্মে—আসক্তি হইতে কামনার উৎপত্তি হয়; সেই কামনা হইতে যদি কেহ সিদ্ধির ব্যাঘাত করে, তবে ক্রোধ জন্মে। ক্রোধ হইতে সন্দেহ হয়, সন্দেহ হইতে স্মৃতিভ্রংশ হয় আবার সেই স্মৃতিভ্রংশ হইতে বুদ্ধিনাশ হয়, বুদ্ধি নাশের ফলে মানবের বিনাশ হইয়া থাকে।

দেহাদি বিষয় অপেক্ষা ইন্দ্রিয়গণ শ্রেষ্ঠ! এই ইন্দ্রিয়গণ অপেক্ষা মন শ্রেষ্ঠ, আবার মন অপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, যিনি সেই বুদ্ধি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তিনিই আত্মা! যে ব্যক্তি এই আত্মাকে বশীভূত করিয়াছেন,



শ্রীমন্দির সহ নাট, ভোগ ও জগমোহনের দৃশ্য। [৮৭ পৃষ্ঠা]

Sulov Press, Calcutta.

তিনি রাগ দ্বেষ বর্জ্জিত আত্মবশীভূত, অর্থাৎ তিনিই ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা বিষয়োপভোগ করিয়া শান্তি লাভ করিতে সমর্থ হয়: আত্মপ্রসাদ থাকিলে সকল দুঃখ বিনষ্ট হয়। প্রসন্নাত্মার বুদ্ধিই নিশ্চল হইয়া থাকে।

মন—মানব দেহের দশ ইন্দ্রিয়-শক্তির কর্ত্তা। মনের আবার দুই অংশ; যেটী বাহিরের ইন্দ্রিয়ের সহিত যুক্ত—সেটীর নাম কামনা। এই কামনার নিবাস বাহিরে, সুতরাং ইন্দ্রিয়ের দ্বারায় ইন্দ্রিয়ের দেহস্থ তাবৎ শক্তিকেই দোহন করিয়া বাহিরে আনয়ন করিয়া থাকে, এবং শেষে শক্তিকে পর্য্যন্ত হরণ করিয়া থাকে, কারণ ইহাই ইহার কর্ত্তব্য কার্য্য। এইরূপ আবার কামনা—বহ্মাণ্ডের তাবৎ বস্তু লাভ করিলেও তাহার আশা কিছুতেই মিটে না।"

শিষ্য—যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় যাঁহাকে গুরু পদে মান্য করিয়া তাঁহার শাসনাধীনে থাকেন, তিনিই শিষ্য নামে কথিত।

পুরীধামের এই মন্দির প্রাঙ্গণের চতুর্দ্দিকেই নানা দেবদেবীর দেবালয় প্রতিষ্ঠিত আছে। এ তীর্থে যে কোন দেবতার দর্শন লাভ হয়, তৎসমুদয়ই কৃষ্ণবর্ণ, অর্থাৎ কালিকাদেবী মূর্ত্তির বর্ণ—কৃষ্ণ আর সরস্বতী দেবী মূর্ত্তিও কৃষ্ণবর্ণ। বিষ্ণুচক্রে বিচ্ছিন্ন সতীর নাভিদেশ এখানে পতিত হওয়ায়—জগজ্জননী বিমলা নামে খ্যাত হইয়া প্রসন্ন মনে ভগবান জগন্নাথ দেবের সহিত অবস্থান পূর্ব্বক পুরী পবিত্র করিতেছেন। যাত্রীগণ—কর্ত্তব্য বোধে এখানকার এই বিমলা দেবীর যথানিয়মে পূজার্চ্চনা করিতে অবহেলা করিবেন না। পাঠকবর্গের প্রীতির নিমিত্ত শ্রীমন্দিরসহ নাট, ভোগমন্দির ও জগমোহনের একখানি চিত্র প্রদত্ত হইল।

পাণ্ডার সাহায্যে আমরা সাধ্যমত মন্দির প্রাঙ্গণের বিগ্রহমূর্ত্তি

সকল দর্শনান্তে যথাসময়ে রোহিনীকুণ্ডে উপস্থিত হইলাম। এই রোহিনীকুণ্ডে ভুষণ্ডিকাকের প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। এই ভুষণ্ডিকাকই ব্রহ্মার নিকট রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের পক্ষ হইয়া সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছিল; এই কারণে বিদ্যাপতির অনুরোধে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন কর্ত্তৃক এখানে এই কুণ্ড ও কাকমূর্ত্তিটী স্থাপিত হইয়াছে। কথিত আছে এই কাকই নীলাচলের রোহিণীকুণ্ডে স্নান করিয়া চতুর্ভুজ হইল দেখিয়া, ব্রাহ্মণ বিদ্যাপতিও ইহাতে স্নান করিবার অভিলাষ করিয়াছিলেন, তখন এই কাক তাঁহাকে উপদেশ দিয়া নিবৃত্ত করিয়াছিল। এ বিষয় পরে একটী উপাখ্যান প্রকাশিত হইয়াছে।

রোহিণীকুণ্ডের দর্শনান্তে আমরা সদলে উত্তর দ্বার দিয়া বাসাবাটীতে নিষ্ক্রান্ত হইবার সময় পথিমধ্যে একস্থানে পাতালপুরীর সন্ধান পাইয়া তথায় গমন করিলাম এবং বৈষ্ণবচূড়ামণি বলিরাজের পাতালপুরীতে তাঁহার দর্শন করিয়া জীবন সার্থক বোধ করিলাম; তৎপরে এই উত্তর দ্বারের সোপান শ্রেণীর উপরিভাগে বৈকুণ্ঠপুরীর শোভা দর্শন পূর্ব্বক বিশ্রামের জন্য বাসাবাটীতে গমন করিলাম। যাত্রীগণ—আপনাপন পাণ্ডার উপদেশ মত এই বৈকুণ্ঠপুরীতে নিশ্চিন্ত মনে আট্‌কে বন্ধন করিয়া থাকেন। আবার এই স্থানেই স্নানোৎসবের পর শ্রীমূর্ত্তিত্রয়ের নবযৌবন উৎসব অর্থাৎ শ্রীমূর্ত্তিগুলি বিচিত্রিত হইয়া থাকে। বৈকুণ্ঠপুরীর পশ্চিমদিকস্থ চত্বরে বিগ্রহদেবের কলেবর যথানিয়মে প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই সমস্ত পবিত্র স্থান একে একে দর্শন শেষ করিয়া যখন উত্তর দ্বার দিয়া বাহির হইলাম, তখন এই দ্বারের উপরিভাগে বাদুর কূলের বাসা ও তাহাদের কিচিরমিচির শব্দে ইতস্ততঃ বিচরণ করা দেখিয়া আহ্লাদিত হইলাম।

পুণ্যধাম শ্রীক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া যাত্রীগণ কর্ত্তব্যবোধে নীলচক্রের

উপর ধ্বজা বন্ধন করিয়া আপনাদিগকে চরিতার্থ মনে করিয়া থাকেন। ইহার প্রধান কারণ এই যে—পিতৃপুরুষগণ সদাসর্ব্বদা দেবস্থানে প্রার্থনা করেন, আমার বংশে কেহ যেন এই পুণ্যধামে আসিয়া নীলচক্রের উপর ধ্বজা প্রদান করিয়া—কূলকে গৌরবান্বিত করে। নীলচক্রে যথানিয়মে একটী ধ্বজা দিতে হইলে ন্যূনকল্পে ১।/৫ আনা খরচ লাগে।

প্রতি একাদশী তিথিতে—এখানকার এই শ্রীমন্দিরের শিখরদেশে স্বর্গীয় রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের আত্মার মঙ্গল কামনায় অদ্যাপি তাঁহার বংশধরেরা একটী করিয়া বাতি (রংমশাল) প্রজ্জ্বলিত করিয়া থাকেন। সেই বাতিদানের সময়—যে ব্যক্তি সমতলভূমি হইতে সর্ব্বসমক্ষে শ্রীমন্দিরের পার্শ্বদেশ বাহিয়া লৌহশিকল সাহায্যে ইহার শিখরদেশে উঠেন এবং বারম্বার "জয় মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নকী জয়" শব্দে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত করিতে থাকেন, তাহার সাহসকে তখন কেহ প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিবেন না।

এক্ষেত্রে এক শ্রীমন্দির ব্যতীত যেখানে যত দেবালয় ও শিবলিঙ্গ মূর্ত্তির দর্শন পাওয়া যায়, সে সমস্তগুলি সদর রাস্তা হইতে বহু নিম্নে অন্ধকার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত দেখা যায়।

একাদশী বৃত্তান্ত।

শান্তা নামে এক বিধবা বিপ্রকন্যা কায়মনচিত্তে সদাসর্ব্বদা শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের দারুব্রহ্মরুদ্রমূর্ত্তির দর্শন বাসনা করিতেন। একদা ভগবানের রথযাত্রা উৎসবের পূর্ব্বে সেই বিপ্রকন্যার রথোপরি বামনরূপ মূর্ত্তি দর্শন বাসনা বলবতী হইলে—তিনি সংসারমায়া ছিন্ন করিয়া একাকিনী পদব্রজে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবেরই শ্রীচরণ ধ্যান করিতে করিতে বাটী হইতে বহির্গত হইলেন এবং যথাক্রমে বহুদূর—পুরীধামে নির্ব্বিঘ্নে

উপস্থিত হইয়া রথোপরি সেই "বামন দারুরুদ্রব্রহ্ম" মূর্ত্তি দর্শন করিয়া বহু দিবসের আশা পূর্ণ করিলেন।

রথযাত্রা উৎসবের পর শয়ন একাদশী তিথিতে তিনি নিরম্বু উপবাস পূর্ব্বক ব্রত পালন করিবার সময় এই ক্ষেত্রসীমার একস্থানে ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া স্বীয় বস্ত্রাঞ্চল বিস্তার পূর্ব্বক তদোপরি শয়ন করিলেন। অন্তর্য্যামী ভগবান ইহা অন্তরে অবগত হইয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন যে—এই পুণ্যক্ষেত্রে বিপ্রকন্যা আমারই ভক্ত হইয়া পুণ্য উপার্জ্জন কারণ কতই না কষ্ট সহ্য করিতেছে। ভক্তের ক্লেশ আমার হৃদয়ে শেলসম আঘাত করিতেছে; এরূপ কঠিন ব্রত এ ক্ষেত্রে শোভা পায় না। জগচ্চিন্তামণি এইরূপ চিন্তা করিয়া স্বয়ং দ্বিজরূপ ধারণ করতঃ সেই ব্রাহ্মণীর নিকট উপস্থিত হইলেন এবং মধুর বচনে সম্বোধন করিয়া তাহাকে বলিলেন, "মাতঃ! তুমি এই পুণ্যক্ষেত্রে এরূপ কাতর অবস্থায় পতিত হইয়া হরি দর্শনের ফল নষ্ট করিতেছ কি নিমিত্ত?" তখন ব্রাহ্মণী সবিনয় বচনে উত্তর করিলেন, মহাশয়! "আমি হরি দর্শনের ফল নষ্ট করি নাই, একাদশী নামক মহাব্রত স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়া উহা সাধ্যমতে পালন করিতেছি।"

ছদ্মবেশধারী ব্রাহ্মণ পুনর্ব্বার তাহাকে বলিলেন—"তুমি এই পুণ্যধামে উপবাস করিয়া সমস্ত পুণ্যই নষ্ট করিতেছ।" এবার ব্রাহ্মণী ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, "আপনার গলে যজ্ঞোপবীত দেখিতেছি, এক্ষণে আপনার মুখে একাদশী ব্রতের এরূপ নিন্দা শ্রবণ করিয়া আমি আশ্চর্য্যান্বিতা হইলাম, কারণ যে দেবী—স্ত্রী বা পুরুষ এবং সকল জীবের দশ ইন্দ্রিয় ও মন—তিনিই একাদশ মূর্ত্তিমতী একাদশী দেবী। যে দেবীকে—পণ্ডিতগণ জ্ঞান-ব্যাপিনী গঙ্গাস্বরূপিণী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, যাঁহার জ্ঞান

জ্যোতিঃকে প্রসন্ন করিতে পারিলে—কি ব্যবহারিক, কি পরমার্থিক উভয় কার্য্যই সিদ্ধি হয়, যে দেবীর কণামাত্র কৃপা হইলে সকল ব্রতই ফলবতী হয়, যাঁহার নিন্দা শ্রবণে কোনরূপ প্রায়শ্চিত্তের বিধান নাই, সেই মহাদেবীর নিন্দা করিতে কি আপনার লজ্জা বোধ হইতেছে না? এই ব্রত—আমাদিগের কুলে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া জানি, তাহাতে আমি মন্দভাগ্য বিধবা রমণী—আপনি ব্রাহ্মণ হইয়া, আমার ব্রতকথা অবগত হইয়াও কিরূপে "অন্ন" আহার করিতে অনুরোধ করিতেছেন, পুনর্ব্বার আমার নিকট আপনি এরূপ বাক্য উচ্চারণ করিবেন না।"

ছদ্মবেশধারী ব্রাহ্মণ এবার সহাস্যে তাহাকে বলিলেন, "তুমি বিধবা কন্যা—একাদশীর ব্রত এবং রথোপরি বামনরুদ্রব্রহ্মমূর্ত্তির দর্শন করিলে কি ফল লাভ হয়, আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বল দেখি—তোমার পবিত্র রসনায়—আমার একান্ত শ্রবণ করিতে ইচ্ছা হইতেছে।"

বিধবা বিপ্রকন্যার একাদশী-ব্রত-মাহাত্ম্য প্রকাশ।

জীবনাবধি নিরম্বু একাদশী-ব্রত পালন করিলে—অন্তে শ্রীহরির চরণ দর্শন লাভ হয়, এবং কৃপা করিয়া তিনি গোলকে বা বৈকুণ্ঠে স্থান দান করেন। আটাদশী করিলে—আটায় উদর পূর্ণ হয় সত্য, কিন্তু হে বিপ্র! বল দেখি, ভক্তিবৃক্ষ রোপণ করিতে না পারিলে কি আটাতে ফল ধরিতে পারে? যে ব্যক্তি এই ব্রত গ্রহণ করিয়া আটা-রুটী ভক্ষণ করে—তাহাকে যম-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। এইরূপ আবার যিনি শুদ্ধ-চিত্তে এই মহাব্রত পালন করেন, অন্তে তিনি নিশ্চয়ই সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন; শাস্ত্রে এইরূপ উপদেশ পাইয়াছি। এই কথা বলিবামাত্র ছদ্মবেশধারী সাক্ষাৎ নারায়ণ, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি বলিতেছ—জন্মাবধি যথা-নিয়মে

একাদশী-ব্রত পালন করিলে, ভগবানের দর্শনলাভ হয়, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি—সে কথা নিশ্চয় কে বলিতে পারে? এক্ষণে তুমি রথোপরি জগন্নাথরূপ বামন-মূর্ত্তির দর্শন-ফল প্রকাশ করিয়া আমার উদ্বিগ্ন দূর কর, ভগবানের এইরূপ দর্শন-ফল জানিবার নিমিত্ত আমার ইচ্ছা বলবৎ হইয়াছে।"

এক্ষণে ব্রাহ্মণী তাঁহার নিকট ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন—"রথোপরি বামনরূপ বারেক দর্শন করিলে,—তাঁহাকে আর কখন ভব-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না—এ কথা আমি পূজ্যপাদ স্বামীদেবের নিকট স্ব-কর্ণে শ্রবণ করিয়াছি।" তখন সেই ছদ্মবেশধারী দ্বিজ, পুনর্ব্বার তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, যদ্যপি এ কথা সত্য হয়—তাহা হইলে তোমার রথোপরি বামনরুদ্রমূর্ত্তি-দর্শন-লাভে সকল পাপ-বিনাশ হইয়াছে, আর কেন বৃথা ভ্রমে পতিত হইয়া অন্য ব্রতের আশ্রয় লইতেছ? এক্ষণে আমার উপদেশ মত জগন্নাথে মতি রাখিয়া মহাপ্রসাদ ভক্ষণ-পূর্ব্বক সুস্থ হও। এই কথায়—ব্রাহ্মণী ক্রোধে উন্মাদিনীর ন্যায় কাঁপিতে কাঁপিতে বলিতে লাগিলেন—"হে ভণ্ড বিপ্র! যদ্যপি স্বয়ং জগন্নাথদেব নিজ মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক আমার সম্মুখে এইরূপ উপদেশ দেন, তাহা হইলে, আমার বিশ্বাস জন্মাইতে পারে।" করুণাময় জগন্নাথদেব তখন ভক্তের বাসনা পূর্ণ করিবার জন্য দ্বিজরূপ পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় জগন্নাথ-মূর্ত্তিতে এই বিপ্রকন্যাকে অভয়দানে বলিলেন, "হে ব্রাহ্মণি! আমার এই পুণ্যক্ষেত্রে তোমার দুঃখে কাতর হইয়া দ্বিজরূপে তোমার নিকট আসিয়াছি; আমার বাক্য মিথ্যা নহে। ইতিপূর্ব্বে আমার পরম ভক্ত রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের প্রতি সদয় হইয়া এ ক্ষেত্রে একাদশী-ব্রত করিতে নিষেধাজ্ঞা প্রচার করিয়াছি, আর অদ্য তোমার সম্মুখেও পুনর্ব্বার বলিতেছি যে—এ ক্ষেত্রে আমার দর্শনে ভক্তগণের সকল পাপ বিনষ্ট

হইয়া থাকে, কিন্তু এই পুণ্যময় স্থানে অন্য কোন ব্রত পালন করিতে ইচ্ছা করিলে, তাহার সকল পুণ্যফলই নষ্ট হয়। অতএব আমার আদেশমত তুমি মহাপ্রসাদ ভক্ষণ কর। ইহাতে তোমার কোন পাপ স্পর্শিবে না।”

ব্রাহ্মণী সেই জ্যোতির্ম্ময় সাক্ষাৎ ভগবানের স্বরূপ মূর্ত্তি দর্শন করিয়া প্রীতমনে গললগ্নিকৃতবাসে কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার শ্রীচরণে পতিত হইয়া গদগদস্বরে বলিতে লাগিলেন, “হে জনার্দ্দন! হে অগতির গতি! হে কলির একমাত্র ত্রাণকর্ত্তা জগন্নাথদেব! হে পতিতপাবন! আমি মতিহীনা সামান্যা স্ত্রীলোক মাত্র—ভজন সাধন কিছুই জানিনা দয়াময়! শ্রীহরির দর্শন আশে আমি যে ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলাম, এক্ষণে নিজগুণে কৃপা করিয়া সেই মোক্ষরূপ সাক্ষাৎ জগন্নাথ মূর্ত্তিতে দর্শন দানে আমার সকল পাপ বিনাশ করিলেন সন্দেহ নাই। ইহার অপেক্ষা আমার সৌভাগ্য আর অধিক কি হইতে পারে!”

এবার জগন্নাথদেব বিপ্র কন্যাকে আবার বলিলেন—“যিনি ভক্তিসহকারে আমার মন্দির পার্শ্বস্থিত নিম্নভাগে এই একাদশী দেবী মূর্ত্তির দর্শন করিবেন, আমার বর প্রভাবে তিনি নিঃসন্দেহে একাদশীর পূর্ণ ব্রত ফল প্রাপ্ত হইবে।” শ্রীমূর্ত্তি এইরূপ উপদেশ দানে অন্তর্ধ্যান হইলেন। ব্রাহ্মণীও সেই দেবচরণে ভক্তি স্থাপন পূর্ব্বক এবার সন্তুষ্টচিত্তে মহাপ্রসাদ ভক্ষণ করিয়া ভগবানের আদেশ পালন করিলেন।

মহোৎসব।

এ তীর্থে জগন্নাথ দেবের বারমাসই উৎসব হইয়া থাকে—তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য উৎসবগুলি প্রকাশিত হইল।

বৈশাখ মাসে—অক্ষয় তৃতীয়া হইতে বাইস দিনব্যাপী মহা সমারোহে চন্দনযাত্রা উৎসব হয়। অষ্টমী-তিথিতে প্রতিষ্ঠোৎসব হইয়া থাকে। জ্যৈষ্ঠ মাসে শুক্ল একাদশীতে—রুক্মিণীহরণ উৎসব হয়। পূর্ণিমায়—স্নানযাত্রা। আষাঢ় মাসে শুক্ল দ্বিতীয়া তিথিতে—রথযাত্রা উৎসব অতি সমারোহে সম্পন্ন হইয়া থাকে ইহার সমকক্ষ উৎসব এ তীর্থে আর দ্বিতীয় নাই। শয়ন একাদশী তিথিতে—দেবতা শয়ন করেন। শ্রাবণ মাসে—ঝুলনযাত্রা উৎসব হয়। এই উৎসবের সময় বিগ্রহদেব শ্রীমন্দিরের রত্নবেদী হইতে মার্কণ্ড নামক হ্রদের উপর কিয়দাংশ সেতুবন্ধন পূর্ব্বক জলে ঝম্প প্রদান করিয়া "কালীয়" নামক মহাবিষধরকে দমন করিয়া থাকেন। ভগবানের এ লীলাখেলা এক হৃদয়স্পর্শী দৃশ্য! মার্কণ্ড হ্রদের জল সদাসর্ব্বদা সবুজ বর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়, কারণ সেই দুর্দ্দান্ত বিষধরের বিষ সংযোগে এই হ্রদের জল সবুজ বর্ণ ধারণ করিয়াছে, কিন্তু নারায়ণের শ্রীচরণ স্পর্শে সেই অবধি উহা বিষশূন্য হইয়া সাধারণের বিশুদ্ধ পানীয় জলরূপে ব্যবহার হইতেছে।

ভাদ্র মাসে—জন্মাষ্টমী উৎসব হয়। এই সময় দলে দলে ভক্তগণ হরি সংকীর্ত্তন করিতে করিতে তাহাদের বিবিধ বর্ণের পতাকা ও ছত্রসকল উত্তোলন করিয়া মনের আনন্দে শ্রীক্ষেত্রের পথগুলিতে বিচরণ পূর্ব্বক এক অপূর্ব্ব সাজে সজ্জিত করেন। জন্মাষ্টমী উৎসবের পর পার্শ্ব পরিবর্ত্তন উৎসব। আশ্বিন মাসে—সুদর্শনোৎসব। কার্ত্তিক মাসে—উত্থান একাদশী ও রাসযাত্রা উৎসব হইয়া থাকে। অগ্রহায়ণ মাসে—প্রচরণোৎসব। পৌষ মাসে—অভিষেকোৎসব, মকরোৎসব, গুণ্ডিচা উৎসব; এতদ্ভিন্ন মাঘীপূর্ণিমাতে যে উৎসব হয়—সেই সময় বহু দূরদেশ হইতে এখানে কত শত সহস্র যাত্রীর সমাগম হয় উহা বর্ণনাতীত। ইহার প্রধান কারণ এই যে—এই মহোৎসবের সময় "ভগবান জগন্নাথদেবকে, প্রিয়া লক্ষ্মীদেবীর সহিত পাশাক্রিড়া করিতে করিতে গজকচ্ছপের যুদ্ধে—ভক্ত গজকে উদ্ধার করিতেছেন এইরূপ বেশ ধারণ করিতে হয়।" সাধারণতঃ এখানকার এই মূর্ত্তিত্রয়কে হস্তপদ-বিহীন অবস্থায় দর্শন পাওয়া যায় কিন্তু এই উৎসব সময় তাঁহারা হস্তপদ-বিশিষ্ট ও বিবিধ বহুমূল্য অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া দর্শকবৃন্দকে চমৎকৃত করেন, অধিকন্তু রত্নবেদীর নিম্নভাগে গজ ও কচ্ছপ যুদ্ধবেশে অবস্থান করিতে থাকে। এ দৃশ্য এক মহান্ দৃশ্য! ভগবানের এই শৃঙ্গারবেশ যিনি একবার দর্শন করিয়াছেন, ইহজন্মে তিনি কখন উহা ভুলিতে পারিবেন না। মাঘীপূর্ণিমার এই নির্দ্দিষ্ট উৎসবদিন অপরাহ্ন-কাল হইতে এখানে এত যাত্রীর সমাগম হয় যে, তখন স্থানীয় প্রশস্ত মন্দির-প্রাঙ্গণ বা আশে পাশে কোথাও তিলমাত্র স্থান থাকে না। এই সকল যাত্রীদিগের দর্শনের সুবিধার্থে রাত্রি চার ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীমন্দিরের দ্বার খোলা থাকে এবং পুলিশপ্রহরী ও পুরীরাজের লোক সকল নিযুক্ত থাকিয়া মন্দির অধ্যক্ষ রাজকিশোর দাসের সুব্যবস্থায়—সেই

জনতাপূর্ণ স্থানে ভক্তগণকে সুচারুরূপে ভগবানের শ্রীবেশ দর্শন করাইয়া থাকেন। ফাল্গুণ মাসে—দোলযাত্র উৎসব হয়। সেই সময়ও বিগ্রহ-দেব শ্রীমন্দির হইতে বহির্গত হইয়া স্থানীয় নির্দ্দিষ্ট দোলমঞ্চে নানা অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া অবতীর্ণ হন। চৈত্র মাসে—শ্রীরাম নবমী তিথিতে দমনকভঞ্জিকা উৎসব হয়—এই উৎসব-কালে বিগ্রহদেব শ্রীরামরূপ বেশ ধারণ পূর্ব্বক পূর্ব্বের ন্যায় ধনুর্ব্বাণ-হস্তে নানা অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া রাজবেশে ভক্তবৃন্দকে দর্শন-দানে মোহিত করেন।

উপরোক্ত যে সমস্ত উৎসব প্রকাশিত হইল, তন্মধ্যে রথযাত্রা উৎসবে যেরূপ মহামারী কাণ্ড ও যেরূপ যাত্রীসমাগম হয়, এরূপ অপর কোন উৎসবেই হয় না। পূর্ব্বেই উল্লেখ হইয়াছে এ ক্ষেত্রের "রথযাত্রা উৎসব" এক অপূর্ব্ব দৃশ্য! উৎকলবাসীরা এই রথোৎসবকে "পাণ্ডুবিজয়" আবার কেহ বা "ধাড়িপহণ্ডী" নামে কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। শ্রীমন্দিরের সিংহদ্বারের সম্মুখস্থ যে প্রধান প্রশস্ত রাস্তা বর্ত্তমান আছে—এই উৎসব-কালে সেই প্রশস্ত রাজপথের উপর সারি সারি তিনখানি রথ সুসজ্জিত অবস্থায় দেবতাদিগের জন্য অপেক্ষা করিতে থাকে। পাণ্ডাঠাকুরের নিকট উপদেশ পাইলাম, প্রতি বৎসরই এই রথগুলি নূতন করিয়া প্রস্তুত হয়। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব যে রথে আরোহণ করেন—উহার নাম "নন্দীঘোষ"। নন্দীঘোষের উচ্চতা ৩০ হস্ত। দীর্ঘে ও প্রস্থে ২৩ হস্ত, ইহাতে পাঁচ হস্ত পরিমাণ ষোলখানি চাকা সংযুক্ত থাকে। শ্রীশ্রীবল-রাম দেবের রথখানি জগন্নাথ দেবের রথ অপেক্ষা উর্দ্ধে ও দীর্ঘে হস্ত প্রমাণ ছোট। এই রথখানি "তালধ্বজ" নামে খ্যাত। তালধ্বজে—জগন্নাথ দেবের রথের চাকার ন্যায় ১৪ খানি বৃহৎ চাকা শোভা পাইতেছে। সুভদ্রাদেবীর রথখানি "তালধ্বজ" অপেক্ষা সর্ব্বদিকে এক হাত ছোট। ইহা "পদ্মধ্বজ" নামে প্রসিদ্ধ। পদ্মধ্বজে অপরা-

পর রথের ন্যায় ১২ খানি চাকা সন্নিবেশিত থাকে। প্রত্যেক রথগুলির নিম্নতলেই বিস্তর কাষ্ঠের কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু উপরতলে কাষ্ঠের ছাউনীর উপর নানা রঙ্গেরঞ্জিত বনাতে আবৃত এবং জরির কার্য্য দ্বারা সুসজ্জিত। এই রথগুলিতে যে সমস্ত কাষ্ঠের অশ্ব সংযুক্ত থাকে, সেই অশ্বগুলিকে প্রথমে দেখিলেই আমাদের বাঙ্গলা দেশের বৃষকাষ্ঠ বলিয়া ভ্রম হয়।

প্রথমেই বলরাম দেবের রথের টান হয়, তৎপরে সুভদ্রা দেবীর, সর্ব্বশেষে জগন্নাথদেবের রথের টান হইয়া থাকে। এই টানের সময়—সেই জনতাপূর্ণ প্রশস্ত রাজপথে যখন সারি সারি তিনখানি রথ অগ্রসর হইতে থাকে, তখন রাস্তাটী এক অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করে। রথযাত্রা উৎসবের সময় কি পাণ্ডা, কি দোকানী, কি পসারী, কি বাড়ীওয়ালা সকলেই সমাগত যাত্রীদিগের নিকট হইতে দু'পয়সা উপার্জ্জন করিয়া থাকেন। এমন কি, স্থানীয় পূজারীব্রাহ্মণগণও শ্রীমন্দির-নিকটস্থ রাজপথের উভয় পার্শ্বস্থ বাটীর ছাদগুলি আয়ত্ত করেন এবং যাত্রী-দিগকে উহার উপর বসিবার স্থান দিয়া ইচ্ছামত অর্থ উপার্জ্জন করিয়া থাকেন।

পুরীধামে এক স্নানোৎসব ও রথোৎসব ব্যতীত অপর কোনরূপ উৎসবে—মূল বিগ্রহ-মূর্ত্তি স্থাপিত হয় না, অর্থাৎ অপরাপর যে সকল উৎসবের বিষয় বিবৃত হইল, সে সকল জগবন্ধুর প্রতিনিধি স্বরূপ যে মূর্ত্তি বর্ত্তমান আছে, সেই মূর্ত্তি দ্বারাই সম্পন্ন হইয়া থাকে।

রথটানার সময়—প্রত্যেক রথের চতুর্দ্দিকে মোটা কাচি বেষ্টিত থাকে। স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি, পুলিসের উচ্চপদস্থ ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী ও মন্দিরের সেবায়েৎগণ ব্যতীত অপর কেহ সেই কাচি-বেষ্টিত গণ্ডিসীমার মধ্যে প্রবেশ করিতে অধিকার পান না। সমস্ত

আয়োজন প্রস্তুত হইলে—পুরীরাজ তথায় উপস্থিত হন, এবং তাঁহার আদেশে যথানিয়মে শঙ্খধ্বনি, ঘণ্টাধ্বনি ও কাঁশরধ্বনি করিতে করিতে হরি-সংকীর্ত্তনের সহিত সেই টান আরম্ভ হয়।

মূর্ত্তিত্রয়কে রথারোহণ করাইবার সময় পাণ্ডারা চিরপ্রথানুসারে দেবতাদিগকে পটডোরে (নূতন সালুর ফালি) বন্ধন করিয়া বেত্রাঘাত এবং নানাবিধ দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিতে থাকেন। অর্থাৎ দয়িতা পাণ্ডাগণ রমণীর ন্যায়, গামছা দ্বারা আপনাপন বক্ষঃস্থল আবৃত করিয়া গোপীকাবেশে আনন্দাতিশয়ে হাসিতে হাসিতে "পট্ট ডোরী" দিয়া শ্রীভগবানের কটিদেশ বাঁধিয়া ফেলেন; তৎপরে হর্ষ—কোলাহল করিতে করিতে অগ্রে বলরাম, তাহার পর সুভদ্রা, সুদর্শন ও পরিশেষে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে যথানিয়মে রথে চড়ান। এইরূপে তাঁহাদিগকে একে একে স্থাপিত করা হইলে, চিরপ্রথানুসারে বিগ্রহগণের আবার একবার পূজার্চ্চনা হইয়া টান হইতে থাকে। বলাবাহুল্য প্রত্যেক রথগুলি আপনাপন প্রভুকে বক্ষে ধারণ করতঃ গর্ব্বভরে একে একে সিংহদ্বারের সম্মুখস্থ রাজপথ হইতে অগ্রসর হইয়া বরাবর গুণ্ডিচা গৃহে গমন করিতে থাকে।

বৈষ্ণবদিগের মতে—এ উৎসব ভগবানের ঐশ্বর্য্যময়ী রাজধানী দ্বারকা হইতে, লীলাস্থলী প্রকৃতির রম্য উপবন শ্রী-বিভূষিত শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা। অন্য দেশের রথযাত্রা আর পুরীধামের রথযাত্রার পার্থক্য আছে। প্রভুপাদ অতুল কৃষ্ণ গোস্বামীর মতে—ক্রূরমতি কংশ কর্ত্তৃক প্রেরিত "অক্রূর" যেন ব্রজবাসীর জীবন কৃষ্ণধনকে লইয়া রথারোহণ করাইয়া মথুরায় গমন করিতেছেন, আর ব্রজের যাবতীয় নরনারী, পশুপক্ষী, তরুলতা এমন কি নদ-নদী ও ভূমি পর্য্যন্ত তাঁহার নিমিত্ত কাঁদিয়া কাঁদিয়া গগন বিদীর্ণ করিতেছেন, কিন্তু পুরীধামের রথোৎসবের

ভাব যেন বিপরীত,কেননা অন্য স্থানের রথযাত্রা বিষাদের বিষ-তরঙ্গিণী, আর পুরীধামের রথযাত্রা যেন আনন্দের মঞ্জ-মন্দাকিনী। অন্য স্থানের রথযাত্রা করুণা ঔদাস্তের আলেয়া-বেহাগ-রাগশ্রী আর পুরীধামের রথযাত্রা—উজ্জ্বল মধুর রসের সাহানাবাহার। অপর স্থানের রথযাত্রার সহিত ইহার কোন কিছুই মিল নাই, কারণ অন্য স্থানের রথযাত্রা—বিরহের হাহুতাশমাথা নিদাঘ মধ্যাহ্ন, আর পুরীধামের রথযাত্রা মিলনের মঙ্গল গীতি মুখরিত মৃগাঙ্ক কর-বিধৌত মধুযামিনী।

হিন্দুর নানা দেশে নানা দেব-বিগ্রহের ভিন্ন ভিন্ন সময়ে রথযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। আশা করি সকলেই অবগত আছেন যে, ঘোষ পাড়ার রথোৎসব—বৈশাখ মাসে হয়। বৈষ্ণব প্রধান দেশে—কার্ত্তিক মাসের উত্থান একাদশী তিথিতে সম্পন্ন হয়।

মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোণার সুপ্রসিদ্ধ রথযাত্রা উৎসব কার্ত্তিক মাসেই হয়, এইরূপ আবার শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে ও বৃন্দাবনে এই রথযাত্রা উৎসব সেটেদের শ্রীরঙ্গনাথ জীউর—কৃষ্ণনবমী তিথিতে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

পুরীর সিংহদ্বার হইতে গুণ্ডিচা গৃহ অতিকম ১৷৷০ মাইল দূরে অবস্থিত। ইহার অপর নাম মাউসী বাড়ী। এই মাউসী বাড়ী বড়দাণ্ড নামক প্রশস্ত রাস্তার প্রান্তভাগে অবস্থিত। মাউসীবাড়ী বা গুণ্ডিচা গৃহের মণ্ডপের চতুর্দ্দিকে কয়েকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দির আছে। মূল মন্দিরের প্রাচীর গাত্রে দুইটী সুবৃহৎ দ্বার বর্ত্তমান থাকিয়া দেবতাদিগের আগমন প্রতীক্ষা করিতে থাকে। এই দ্বার দুইটীর মধ্যে একটী সিংহদ্বার অপরটী বিজয়দ্বার নামে প্রসিদ্ধ। এখানে বিগ্রহগণ রথ হইতে প্রথমে অবতরণ করিয়া এই গুণ্ডিচা মণ্ডপের সিংহদ্বারে প্রবেশ পূর্ব্বক কিছু দিন মাউসী বাড়ীতে অবস্থানের পর আবার পুনর্যাত্রা উপলক্ষে দশমী তিথিতে

সেই বিজয়দ্বার দিয়া একে একে বাহির হইয়া রথারোহণ করিয়া শ্রীমন্দিরের রত্নবেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত হন।

যে সকল যাত্রী এ ক্ষেত্রে ভগবানের রথযাত্রা উৎসব দর্শন করিতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহারা যেন উৎসবের নিরুপিত সময়ের দুই তিন দিন পূর্ব্বে তথায় গমন করতঃ আপন পছন্দানুযায়ী স্থান অধিকার করিয়া লন, নচেৎ নিরুপিত সময়ে তথায় উপস্থিত হইলে, রেলগাড়ী কিম্বা এই ক্ষেত্রে—যাত্রী সমাগম অধিক হইলে পর বাসা ভাড়া লইবার সময় অত্যন্ত কষ্ট ভোগ করিতে হয়, এমন কি প্রত্যেক যাত্রীকে বাধ্য হইয়া চারি টাকা হইতে সাত আট টাকা পর্য্যন্ত ভাড়া দিয়াও লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়।

পুরীধামে শ্রীশ্রীজগবন্ধুদেবজীউকে দর্শন করিলে তীর্থ নিয়মানুসারে সাধ্য মতে এক দিবস স্থানীয় পাণ্ডা ও ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইতে হয়, কারণ ব্রাহ্মণ ভোজনই সকল তীর্থের মুখ্য। সাধুগণ যজ্ঞাবশিষ্ট ভোজন করিয়া সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে মুক্ত হন, কিন্তু যাহারা কেবল আপনার নিমিত্ত অন্ন পাক করে—তাহারা জীবন ধারণ করিবার জন্য যাবতীয় পাপই ভক্ষণ করিয়া থাকে, অতএব মহাত্মাদিগের উপদেশানুসারে প্রত্যহ অতিথি সৎকার করা একান্ত কর্ত্তব্য। পশ্চিম তীর্থের ন্যায় শ্রীক্ষেত্রে—ব্রাহ্মণ বা পাণ্ডাভোজনের সময় লুচি,পুরি বা সন্দেশের আবশ্যক হয় না। এ ক্ষেত্রে কেবল ভক্তিসহকারে মহাপ্রসাদ ভোজন করাইয়া সাধ্যমত দক্ষিণা দিলেই তাঁহারা সন্তুষ্ট হন। কিন্তু ব্রাহ্মণদিগকে যেরূপ দক্ষিণা দান করিতে হয়, তাহার দ্বিগুণ পাণ্ডাদিগকে দিতে হয় এইরূপ আবার তীর্থ গুরু পাণ্ডার মুখে প্রসাদ দিলে তাঁহাকে সাধ্যমত উচ্চহারে দক্ষিণাসহ সন্তুষ্ট করিতে হয়।

রথযাত্রা উৎসবের সময় বিগ্রহদেব শ্রীমন্দির হইতে মাউসীবাড়ী

যাত্রা করিলে—শ্রীমন্দিরের আনন্দ বাজারে ভোগের আট্‌কিয়া পাওয়া যায় না, এই সময় মাউসীবাড়ীতে যে আনন্দ বাজার আছে, ভগবানের ভোগের পর সেই কয়দিন তথায় মহাপ্রসাদ পাওয়া যায়। যাত্রীদিগের মধ্যে অনেকেই সেই সময় এতদূর কষ্ট স্বীকার করিয়া সেই মাউসীবাড়ীর আনন্দ বাজার যাইতে ইচ্ছা করেন না, সুতরাং তাঁহাদের ইচ্ছামত যাহার ভাগ্যে জগবন্ধু যাহা যোগান, তিনি তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া উদর পুরণ করিয়া থাকেন।

গুণ্ডিচা গৃহ।

মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নের গুণ্ডিচা নামে এক মহিষী ছিলেন। তিনিও রাজার ন্যায় শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে আন্তরিক ভক্তি করিতেন। মহারাজের সুবন্দোবস্ত গুণে যেরূপ শ্রীমন্দিরে প্রত্যহ জগন্নাথ দেবের ভোগ হইয়া থাকে, তিনিও সেইরূপে দেবতাকে ভোগ দিবার অবসর অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে দিনের পর দিন অতীত হইবার পর, ভগবানের রথযাত্রা উৎসব উপস্থিত হইলে—তিনি শ্রীমন্দির হইতে যথানিয়মে জগন্নাথদেবকে আপন আলয়ে আনিয়া ইচ্ছামত ভোগদানে বহুদিনের বাসনা পূর্ণ করিলেন। শ্রীমন্দিরের আনন্দ বাজারে যেরূপ দেবতার ভোগের প্রসাদ বিক্রয় হয়—তিনিও আপন আলয়ে সেইরূপ আনন্দ বাজার বসাইয়া—যে কয়দিন বিগ্রহদেব তাঁহার বাটীতে অবস্থান করেন, তদনুরূপ ব্যবস্থা করিলেন, অর্থাৎ শ্রীমন্দিরে যেরূপ আট্‌কে ভোগ হইয়া যাত্রীদিগের জন্ত সেই ভোগ বিক্রয় হয়, এই মহিষীও আপন আলয়ে সেইরূপ সুবন্দোবস্ত করিয়া আপন কীর্ত্তি স্থাপিত করিলেন। যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন ততদিন প্রতি বৎসরেই রথোৎসব সময় গুণ্ডিচামহিষী জগন্নাথদেবকে

আপন আলয়ে লইয়া আসিয়া ইচ্ছা মত ভোগদানে সন্তুষ্ট হইতেন। সেই স্বর্গীয়া মহিষীর নাম চিরস্মরনীয় রাখিবার নিমিত্ত অদ্যাপি পাণ্ডাগণ, এখানে সেই প্রথা বাজায় রাখিয়া তাঁহারই নামানুসারে এই গৃহের নাম "গুণ্ডিচা গৃহ" বলিয়া প্রসিদ্ধ করিয়াছেন।

সমুদ্র।

শ্রীমন্দিরের নৈঋতকোণে অর্দ্ধ মাইলদূরে মহাসমুদ্র অবস্থিত, অর্থাৎ শ্রীমন্দিরের পার্শ্বস্থিত স্বর্গদ্বার দিয়া বরাবর যে সোজা রাস্তা প্রসারিত হইয়াছে, সেই রাস্তার উপর দিয়া প্রায় এক মাইল পথ অগ্রসর হইলে সমুদ্র তীরে উপস্থিত হওয়া যায়। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের প্রার্থনায়, চতুরানন শ্রীমন্দিরটী প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য ব্রহ্মলোক হইতে প্রথমেই এখানকার এই মন্দির দ্বারে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এই কারণে এ তীর্থে এই দ্বারটী "স্বর্গদ্বার" নামে খ্যাত হইয়াছে। স্বর্গদ্বারে ভগবান জগন্নাথদেবের আদেশে মহাবীর হনুমান সাগর সমীপে কাণ পাতিয়া অপেক্ষা করিতে-ছেন,—যাহাতে সাগর গভীর গর্জ্জন সহকারে তাহার তরঙ্গরাশি উত্তাল করিয়া মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারে? হনুমানজীউ এখানে এই গুরুভার গ্রহণ করিয়া প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্ত আছেন বলিয়া সাধারণে এই হনুমান মূর্ত্তিটীকে "কাণপাতা হনুমান" বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। কথিত আছে এখানে জগন্নাথ ভগ্নী সুভদ্রা দেবী—সমুদ্রের গভীর গর্জ্জন শ্রবণে ভীত হইলে ভ্রাতৃদ্বয় তাঁহাকে অভয় দানে মধ্যস্থলে রাখিয়াছিলেন। এই কারণে আমরা জগন্নাথ ও বলরাম দেবের মধ্যস্থলে সুভদ্রা দেবীর দর্শন পাইয়া থাকি।

সুভদ্রা দেবী সম্বন্ধে মতভেদ আছে—

সুভদ্রা বলিলেই—শ্রীকৃষ্ণের ভগ্নীকে বুঝায়। কিন্তু উৎকলবাসী-

দিগের নিকট উপদেশ পাইলাম—অনন্তদেব বলরামরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং লক্ষ্মী দেবী, সেই বলরাম দেবের রূপ চিন্তা করিয়াছিলেন বলিয়া, রোহিণী গর্ভে বলভদ্রার আকৃতি ধারণ করিয়া ভগ্নীরূপে তিনি ধরায় অবতীর্ণা হন। লৌকিক ব্যবহার হেতু ইনি ভগ্নী স্থানীয়া, কিন্তু এই দেবীই সাক্ষাৎ শক্তিস্বরূপিনী লক্ষ্মী দেবী। ইঁনি ক্ষণকাল নীলমাধবের বিরহ সহ্য করিতে পারেন না।

সমুদ্র পথে অগ্রসর হইবার সময় যাত্রীগণ—শ্বেতগঙ্গার দর্শন পাইবেন। শ্বেতগঙ্গায় যথানিয়মে সঙ্কল্প করিবার বিধি আছে, অর্থাৎ ব্রাহ্মণদ্বারা মন্ত্র উচ্চারণসহকারে ইহাতে স্নান তর্পণ করিতে হয়। শ্বেতগঙ্গা—একটী পুণ্য পুষ্করিণী বিশেষ। ইহার জল ঘোলা ও দুর্গন্ধময়, তথাপি ভক্তগণ মুক্তিলাভের আশায় বিনা আপত্তিতে ইহাতে স্নান বা জল স্পর্শ করিয়া থাকেন। পুরী সীমার মধ্যে এক শ্বেত গঙ্গার ন্যায় আরও পুণ্য পুষ্করিণী দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—মার্কণ্ড-হ্রদ, চন্দনপুকুর, ও ইন্দ্রদ্যুম্নসরোবর।

শ্বেতগঙ্গা নামক পুণ্যপুকুরটী অপরাপর সরোবর অপেক্ষা আয়তনে ছোট এবং চতুর্দ্দিক সোপানশ্রেণীতে সজ্জীকৃত, কিন্তু ইহার মধ্যস্থলটী কলমী দলে পরিপূর্ণ। শ্বেতগঙ্গার তীরের উপরিভাগে শ্বেতমাধবজীউ ও মৎস্যমাধবজীউর মূর্ত্তিদ্বয় প্রতিষ্ঠিত আছে। কথিত আছে—এই শ্বেতমাধবজীউর মানসেই এথানে গঙ্গার আবির্ভাব হয়। এই কারণে এ তীর্থকুণ্ডটী শ্বেতগঙ্গা নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

সিদ্ধ-বকুল।

ভারত—ধর্ম্মপ্রাণ মহাদেশ! এখানে মহাত্মাগণ শত বাধা বিঘ্ন সত্ত্বেও কথন নিজের ধর্ম্ম কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন নাই। অদ্যাপিও

দেখিতে পাওয়া যায়, কত শত যোগী, ঋষি, তপস্বী নিভৃতে—ভগবানের মহত্ব প্রকাশ করিতেছেন। এখনও এই ভারতে অনেক সিদ্ধ পুরুষ আছেন—যাঁহাদের নাম পর্য্যন্ত অনেকে জানেন না। তাঁহারা জগতের কোলাহল, স্বার্থপরতা ও প্রতিযোগীতা হইতে দূরে থাকিয়া, সাধারণের অনুসরণে অতীত হইয়া থাকেন। এই সকল সিদ্ধপুরুষ—তাঁহারা কেবল আত্ম-মুক্তির অভিলাষী, জগতের সঙ্গে তাঁহাদের সম্বন্ধ নাই।

সমুদ্রপথে যেরূপ শ্বেতগঙ্গার দর্শন পাওয়া যায়, সেইরূপ আবার সিদ্ধবকুলেরও দর্শন পাওয়া যায়। প্রশস্ত রাজপথের একটি বাটীর ভিতর এই আশ্চর্য্য বৃক্ষটি অবস্থিত। বৃক্ষটির মূল হইতে অগ্রভাগ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই কোটরময় অর্থাৎ এই বৃক্ষের অভ্যন্তরে কাষ্ঠের সার-ভাগ দেখিতে পাওয়া যায় না; কেবল মাত্র একদিকের ত্বকের উপর ভর দিয়া উপরে সমস্ত বৃক্ষটি আপন শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এই বকুল বৃক্ষ সম্বন্ধে প্রবাদ—চৈতন্যদেব, হরিদাসঠাকুর প্রভৃতি ভক্তমণ্ডলী এই নির্দ্দিষ্ট বৃক্ষতলে বসিয়া ভগবান জগন্নাথদেবের মাহাত্ম্য প্রকাশ করিতেন। কোন এক সময় রথযাত্রা উপলক্ষে নূতন রথ নির্ম্মাণ কারণ, কাষ্ঠের অভাব হয়, এই নিমিত্ত পুরী-রাজের আদেশে স্থানীয় কাঠুরিয়াগণ সেই প্রাচীন বৃক্ষের গুঁড়িতে রথচক্র নির্ম্মাণের জন্য কাষ্ঠ কাটিতে যায়।

এদিকে ভক্তগণ রাজার সেই নিদারুণ আদেশ অবগত হইয়া তাঁহাদের আরাধ্যদেবের নিকট আপনাপন মনোবেদনা নিবেদন করিলেন। মায়াময় জগন্নাথদেব তখন আপন লীলাপ্রকাশচ্ছলে উক্ত রাত্রির মধ্যেই সেই বৃক্ষের নিরেট গুঁড়িটী ফোঁপরা করিয়া দিয়া ইহাকে দুই-ভাগে বিভক্ত করিয়া দিলেন। পর দিবস যথাসময়ে কাঠুরিয়াগণ এখানে

আসিয়া এই অসম্ভব ঘটনা দর্শনে আশ্চর্য্যান্বিত হইল এবং রাজ-সমীপে যথাযথ নিবেদন করিল। তদবধি সকলেই এই বৃক্ষটিকে দেবতার আশ্রমস্থান স্থির-সিদ্ধান্ত করিয়া ভক্তিসহকারে ইহাকে পূজা ও এই বৃক্ষটিকে সিদ্ধ-বকুল বলিয়া থাকেন।

পুরী হইতে মহাসমুদ্র-তীরে যাইবার সময় পথিমধ্যে কত স্থানে কত প্রকার ভিখারী কত ছলে ভিক্ষা করিতেছে দেখিতে পাইবেন তাহার ইয়ত্তা নাই। কেহ দেহের অর্দ্ধেকটা মাটিতে পুঁতিয়া রাখিয়াছে, কেহ বুক চাপড়াইয়া বিকট চীৎকার করিতেছে, কেহ বা আপন মস্তক বালির মধ্যে চাপা দিয়া স্বীয় বুকে অগ্নিপূর্ণ মালসা স্থাপিত করিয়া কেবল হাত পা নাড়িয়া যাত্রীদিগের নিকট ইঙ্গিতে পয়সা প্রার্থনা করিতেছে, আবার কেহ বা কতকগুলি ঘাসের আটি একস্থানে স্থাপন করিয়া, ঐ সকল আটি ঘাস স্থানীয় গাভীগুলিকে খাওয়াইতে অনুরোধ করিতেছে দেখিতে পাওয়া যায়, এতদ্ভিন্ন এ পথে আরও দেখিতে পাওয়া যায় যে, পথের উভয় পার্শ্বে সমুদ্র-পূজার জন্য পক্কফল-বিক্রেতারা তীর্থযাত্রী দেখিলেই তাহাদের ফল খরিদ করিবার নিমিত্ত আগ্রহ প্রকাশ করিতে থাকে। আমরা ইতিপূর্ব্বে কলিকাতায় বসিয়া মনে মনে ভাবিতাম যে—কলিকাতার নিকটবর্ত্তী কালীঘাট নামক তীর্থের কাঙ্গালীদিগের ন্যায় আর কোন তীর্থে কোন কাঙ্গালী এত অধিক কষ্ট স্বীকার করিয়া ভিক্ষা করে না, কিন্তু এখানকার এই সকল ভিক্ষাজীবিকে দেখিয়া আমাদের সে ভ্রম পরিবর্ত্তন করিতে হইল। আহা! ইহাদের নিদারুণ যাতনা ভোগ দেখিলে মনে বড় দুঃখ হয়। এইরূপে কত প্রকার ভিক্ষাজীবিকে এখানে দেখিতে দেখিতে প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পর যথা সময়ে সমুদ্রের বালুকাময় বেলা-ভূমি পাহাড়ের উপর আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

সমুদ্রতীরে যাইবার পূর্ব্বে বাসাবাটী হইতে কর্ত্তব্য-বোধে, নারিকেল, শুপারি, যজ্ঞোপবীত, পঞ্চরত্ন, পঞ্চফল, কাপড় ও স্নানের জন্য গামছা সংগ্রহ করিবেন, কারণ এই সমুদ্রে আসিয়া সাধ্যমত সঙ্কল্পের পর ঢেউ খাইতে হয়। বলা বাহুল্য ঢেউ খাইতে হইলেই স্নান করিতে হয়; সেই সময় বস্ত্রাঞ্চলে এত বালি লাগে যে, উহা অপর স্থানে ধৌত না করিলে কিছুতেই পুনর্ব্বার ব্যবহার করা যায় না। সে যাহা হউক মহাসমুদ্রতীরে উপস্থিত হইয়া স্বীয় পাণ্ডার উপদেশ মত পঞ্চরত্ন, পঞ্চফল, নারিকেল, শুপারী, পয়সা প্রভৃতি দানে আপনাপন মুক্তি কামনায় মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক প্রথমে সঙ্কল্প করিতে হয়, তৎপরে সাধ্যমত দক্ষিণাসহ তীর্থগুরু পাণ্ডাকে সন্তুষ্ট করিতে হয়।

এই মহাসমুদ্রের সীমা নির্ণয় করা সুকঠিন। ইহার তীর হইতে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিলে—কেবল অনন্ত বিস্তারী-নভোমণ্ডল সমুদ্রের চারিধারকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। এক তীর হইতে অপর তীরে দৃষ্টি চলে না।

সমুদ্র সৈকতের বালুকাভূমি অতি বিস্তীর্ণ—তথায় কেবলই বালুকা-রাশি ধূ—ধূ করিতেছে। রবিকিরণে নীলাম্বুরাশি যেন তর তর করি-তেছে। সমুদ্রের ভীষণ গর্জ্জনশীল তরঙ্গমালার ঘাত প্রতিঘাতে কি মনোহর দৃশ্যই দেখায়! আবার ইহার সেই নীল রূপ ও কি মহান দৃশ্য! এ শোভার সীমা নাই, এ যে অনন্ত—অফুরান্ত, মানসপটে যেন উদাস ভাব আনয়ন করে। এখানে অবস্থান কালে সমুদ্রের এই অপূর্ব্ব দৃশ্য দর্শনে ক্ষণেকের জন্য যেন উত্যক্ত জীবন শান্তি লাভ করিল। সেই সময় একবার ভাবিলাম জীবনে আর কখন কি এরূপ শান্তি লাভ পাইব?

সমুদ্রের এই সৈকত-পুলিনে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার সেই

উত্তালতরঙ্গ ও উর্ম্মি-মালার বেলাভূমির চুম্বন দর্শন করিলে—সেস্থান আর ত্যাগ করিতে ইচ্ছা হয় না। এই তটোপরি অজস্র ঝিনুক ও তদ্‌জাতীয় অন্যান্য কত কি মৃত শম্বুকজাতীয়ের শুষ্ক গাত্রাবরণ (খোলা) বক্ষিপ্ত থাকায় সমাগত যাত্রীবৃন্দ আগ্রহের সহিত সেই সকল সংগ্রহ করিতেছেন, দেখিয়া আমরাও তাহাদের সহিত যোগ দিলাম; এমন সময় সমুদ্রের উত্তালতরঙ্গ গর্জ্জন সহকারে দৌড়াইয়া আসিয়া আমাদের মধ্যে অনেকেরই পাদদেশ আর্দ্র করিয়া দিয়া চলিয়া গেল।

এইরূপে কিয়ৎকাল সদলে আমোদ অনুভব করিয়া স্থানীয় নিয়মগুলি পালন সহকারে সঙ্কল্পের পর চিরন্তন প্রথানুসারে ঢেউ খাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া যেন যুপঃকাষ্ঠে আবদ্ধ ছাগ শিশুর ন্যায় অনিমেষ নয়নে সেই তীরের এক স্থানে উপবেশন করিলাম।

তীর্থ যাত্রীর সমাগম দেখিলেই এখানে কতকগুলি বালক ও ইতর শ্রেণীর লোক উপস্থিত হয়—কেহ সমুদ্রের সেই উত্তাল তরঙ্গের মধ্যে এক আধটী পাই পয়সা ফেলিয়া দিলে—তাহারা এই সকল তরঙ্গকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া—সমুদ্রের সেই ভীষণ ঢেউ হইতে উহা তুলিয়া লইয়া নির্ব্বিঘ্নে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া থাকে। ইহাই তাহাদের উপার্জ্জন এবং যাত্রীদিগের আনন্দ লাভ। এইরূপে সমুদ্রের সেবা করিয়া বিশ্রামের জন্য বাসাবাটীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

রন্ধন-শালা।

পুরীধামে এই রন্ধনশালা—একটী দ্রষ্টব্য স্থান। রন্ধনশালায় ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক বৃত্তাকার মহানসের উপর পর পর ৪০।৫০টী আটকিয়া (লম্বাকৃতি মৃণ্ময়স্থালী) এরূপভাবে সজ্জীকৃত হয় যে, সকলগুলিতেই সমভাগে অগ্নির উত্তাপ পায়। এইরূপে এখানে রসুই হইলে—তথা

হইতে ভারবাহীগণ বসনাবৃত বদনে ঐ সকল ভোগ, স্থানীয় ভোগ-মণ্ডপে আনিয়া থাকে। মুখ বসনাবৃত থাকিবার তাৎপর্য্য এই যে—পাছে তাহাদের মধ্যে কেহ কোনরূপ কথা কহিতে গিয়া উক্ত ভোগদ্রব্য নষ্ট করিয়া ফেলে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এখানে একত্রে এত আটকে রন্ধন হইলেও মা লক্ষ্মীর কৃপায় কখন এই সকল রন্ধন বিস্বাদ হইতে দেখা যায় না। যথায় ভোগ রন্ধন হয়, তথায় যাত্রীর প্রবেশ নিষেধাজ্ঞা আছে। পাণ্ডার নিকট উপদেশ পাইলাম এই রন্ধনশালাটী—কলিকাতা নিবাসী স্বর্গীয় রামমোহন দে মল্লিকের উপযুক্ত পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্রনাথ দে মল্লিক মহাশয় নিজ ব্যয়ে নির্ম্মাণ করাইয়া আপন কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন। এই রন্ধন শালার পশ্চাদ্ভাগে যথায় মহাপ্রসাদ শুষ্ক হইয়া থাকে, তথায় গমন করিয়া কি সুন্দর প্রণালীতে—উহা প্রস্তুত হয়, তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপে রন্ধনশালার শোভা দেখিয়া এখান হইতে লক্ষ্মীদেবীর শ্রীচরণ বন্দনা করিতে যাত্রা করিলাম।

শ্রী শ্রীলক্ষ্মীদেবী।

শ্রীমন্দিরের বায়ুকোণে যে একটী মন্দির দেখিতে পাওয়া যায় উহাই লক্ষ্মীদেবীর মন্দির। ইহারও নাটমন্দির, জগমোহন ও ভোগ-মন্দির আছে। লক্ষ্মীদেবীর এখানে পৃথক একটী রন্ধন গৃহ আছে। জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রাদেবী ব্যতীত অন্যান্য বিগ্রহগণের ভোগ এই লক্ষ্মীদেবীর রন্ধনশালা হইতে প্রেরিত হইয়া থাকে।

পুরী সীমার মধ্যে বহুবিধ মঠ দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—নিমাই চৈতন্যের মঠ, বিদুরাশ্রম বা মুলুক দাস বাবাজীর মঠ, স্বর্গদ্বার সাক্ষী মঠ, সুদামপুরী মঠ, নানকপন্থীর মঠ, কবিরপন্থীর মঠ, মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত শঙ্করমঠ ইত্যাদি।

নানক পন্থীয় মঠ সম্বন্ধে একটী প্রবাদ আছে—পঞ্জাব দেশীয় সিদ্ধ পুরুষ "নানক" যখন পুরীতে উপস্থিত হন, তখন তাঁহাকে শ্মশ্রুধারী দেখিয়া স্থানীয় পাণ্ডাগণ এই মহাত্মাকে মুসলমান ভ্রমে শ্রীমন্দির হইতে বহিস্কৃত করিয়া দেন। এইরূপে অপমানিত হইয়া তিনি অতি কাতর ভাবে এই মঠস্থানে আসিয়া জগন্নাথ দেবের আরাধনা করিতে আরম্ভ করেন। ইহার ফলে স্বয়ং ভগবান স্বর্ণথালার উপর প্রসাদ সজ্জিত করিয়া গভীর রাত্রিতে সেই নানকের নিকট স্বরূপে উপস্থিত হন এবং ভক্তের গৌরব রক্ষার্থে পদদ্বারা এই নির্দ্দিষ্ট স্থানে একটী কূপ খনন পূর্ব্বক তথায় গঙ্গাদেবীকে আনয়ন করেন। পরদিবস যথাসময়ে এই রহস্য প্রকাশ হইলে—নানকের এ তীর্থে গৌরব বৃদ্ধি হইল অর্থাৎ সেই অবধি এই স্থানটী একটী পুণ্য তীর্থস্থান বলিয়া গণ্য হইতে লাগিল।

এ ক্ষেত্রে কোন দ্রব্য সামগ্রী খরিদ করিবার সময় স্থানীয় পাণ্ডাদিগের কোন লোক সঙ্গে রাখিবেন না, কারণ এই সকল লোক যাত্রীদিগের সঙ্গে থাকিলে স্থানীয় দোকানীরা তাহাদিগকে দস্তরী দিতে হয় বলিয়া দ্রব্য সামগ্রীর মূল্য বেশি লইয়া থাকেন। শ্রীক্ষেত্রে সকল দ্রব্যই ১০৫৲ ওজনের সেরে খরিদ বিক্রয় হয়।

পঞ্চতীর্থ।

পুণ্যধাম শ্রীক্ষেত্রে আসিলে—স্থানীয় নিয়মানুসারে পঞ্চতীর্থের পূজা করিতে হয়। যথাক্রমে সেই পঞ্চতীর্থের নাম প্রকাশিত হইল, যথা ;—নরেন্দ্র, মার্কণ্ড, সমুদ্র, ইন্দ্রদ্যুম্ন ও চক্রতীর্থ, এই পাঁচটী পুণ্য পুস্করিণী এখানে পঞ্চতীর্থ নামে প্রসিদ্ধ। এই স্থানে একটী কথা বলিবার আছে—পঞ্চতীর্থ সেবা করিবার যাত্রা কালীন প্রত্যুষে গমন করিবেন এবং বেলা ৮।৯ টার মধ্যেই প্রত্যাগমন করিবার

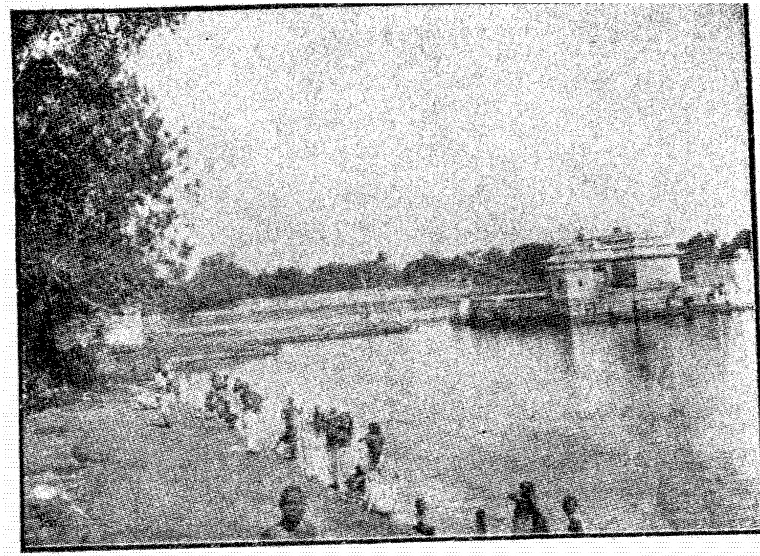
বন্দোবস্ত করিবেন, কেননা এ তীর্থের অধিকাংশ পথই বালুকাময়—রৌদ্রের তাপে সেই বালুকারাশি এত উত্তপ্ত হয় যে মানবের চলাচল রহিত করিয়া দেয়।

নরেন্দ্র সরোবর।

শ্রীমন্দিরের উত্তরদিকে অর্দ্ধ মাইল দূরে নরেন্দ্র সরোবর অবস্থিত। পুরীসীমার মধ্যে ইহাই উৎকৃষ্ট এবং আয়তনে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ সরোবর। ইহার চতুর্দ্দিক প্রস্তর মণ্ডিত সোপান শ্রেণীতে বাঁধান। নরেন্দ্র সরোবরের মধ্যস্থলে ২টী কৃত্রিম দ্বীপ, তদুপরি এক দেবমন্দির বিরাজিত। বৈশাখ মাসে ১৫ দিন ব্যাপী এই স্থানে জগন্নাথ দেবের প্রতিনিধি স্বরূপ মদনমোহনজীউর উৎসব মূর্ত্তির চন্দন যাত্রা হইয়া থাকে। এই কারণে ইহার অপর নাম চন্দনপুকুর। পাঠকবর্গের প্রীতির নিমিত্ত এইস্থানে সেই চন্দনপুকুরের একখানি চিত্র প্রদত্ত হইল।

চক্রতীর্থ।

সমুদ্রতীরে—ষ্টেশনের অর্দ্ধ মাইল দূরে শ্রীমন্দিরের অগ্নিকোণে এই তীর্থটী অবস্থিত। এই স্থানে শ্রীমূর্ত্তি নির্ম্মাণার্থ দারুবৃক্ষ ভাসিয়া আসিয়াছিল। এখানে ভগবান চক্রনারায়ণ ও একটী হনুমান মূর্ত্তির দর্শন পাওয়া যায়। চক্রতীর্থ—সমুদ্র হইতে এক খণ্ড বালুকাময় চড়া, এই স্থানকে পৃথক করিয়াছে। এখানে যথানিয়মে পিতৃগণ উদ্দেশে শ্রাদ্ধ ও বালির পিণ্ডদান করিতে হয়। সমুদ্রের জল লোনা কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই চক্রতীর্থটী সমুদ্রের তীরে অবস্থিত হইলেও ইহার জল আস্বাদে সুস্বাদু। পুরী হইতে এই চক্রতীর্থ সেবা করিতে যাইবার সময় পথিমধ্যে সাবধানের সহিত পদবিক্ষেপ করিবেন, কারণ এখানে বালির মধ্যে স্থানে স্থানে ফণিমোনসার কাঁটাসকল প্রোথিত থাকে।



চন্দন পুকুরের দৃশ্য।

[১১০ পৃষ্ঠা।

মার্কণ্ড হ্রদ।

এই পবিত্র হ্রদটী শ্রীমন্দিরের উত্তর পশ্চিমে প্রায় সিকি মাইল দূরে অবস্থিত। মার্কণ্ডহ্রদের চতুর্দ্দিকেই প্রস্তর নির্ম্মিত বাঁধাঘাট সকল শোভা পাইতেছে। এখানে যতগুলি ঘাট বর্ত্তমান আছে, তন্মধ্যে উত্তরদিকের ঘাটেই যাত্রীসমাগম অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। কথিত আছে এই হ্রদের তীরে মার্কণ্ড ঋষি বসিয়া তপস্যা করিয়াছিলেন, এই কারণে সেই ঋষির নামানুসারে ইহার নাম মার্কণ্ড হ্রদ হইয়াছে। হ্রদের দক্ষিণদিকে ভগবান মার্কণ্ডেশ্বরের মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে। পাণ্ডার নিকট উপদেশ পাইলাম, এই মন্দির ও লিঙ্গমূর্ত্তিটী ৮১১ খৃঃ পুরীরাজ কুন্তনকেশরী কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহার উত্তর ঘাটের সন্নিকটে অষ্টমাতৃকা মূর্ত্তি অর্থাৎ ব্রাহ্মী, মহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, বরাহী, ইন্দ্রাণী, চামুণ্ডা ও চণ্ডিকা দেবীর দর্শন পাওয়া যায়। হ্রদের পূর্ব্বতীরের মধ্যভাগে কালীয় সর্পের উপর দণ্ডায়মান হইয়া শ্রীকৃষ্ণ বংশীবাদন করিতেছেন।

ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর।

শ্রীমন্দির হইতে ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরটী অন্যূন আড়াই মাইল দূরে এবং গুণ্ডিচা গৃহের অনতিদূরে গলিপথে অবস্থিত। ইহা দীর্ঘে ৪৮১ ফিট এবং প্রস্থে ৩৯৬ ফিট। কথিত আছে এই পুণ্যপ্রদ তীর্থে যথানিয়মে সঙ্কল্প এবং দেবতা ও পিতৃপুরুষগণের উদ্দেশে তর্পণ করিলে সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ হইয়া থাকে। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন এই অপূর্ব্ব দীঘিকা প্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক নিজ নামে খ্যাত করেন। এই নিমিত্ত ইহার নাম ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর।

ইন্দ্রসরোবরে—বহুবিধ কূর্ম্ম (কচ্ছপ) দেখিতে পাওয়া যায়। প্রবাদ

যে—মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন শ্রীমন্দিরটী প্রতিষ্ঠা করিবার পর মনে মনে চিন্তা করিলেন—আমার অবর্ত্তমানে যদি আমার বংশধরগণ কর্ত্তৃক দেবতার কীর্ত্তিকলাপ সমস্ত লুপ্ত হইয়া যায়, তাহা হইলে আমার এত পরিশ্রম সকলই ব্যর্থ হইবে। এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি ভগবানের নিকট স্ববংশ নাশের জন্য প্রার্থনা করিলে—শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব সদয় হইয়া তাঁহাকে এই বর প্রদান করিলেন যে, তোমার বংশধরগণ এই সরোবরে কূর্ম্মরূপে পরিণত হউক, তাহাতে তাহারা অমর হইয়া তোমার কীর্ত্তি অক্ষুণ্ণ রাখিবে। সরোবরের এই সকল কচ্ছপগুলি মহারাজের বংশধর বলিয়া—যাত্রীগণের নিকট হইতে তাহারা মুড়ির-মোয়া, খই মুড়কী প্রভৃতি আদরের সহিত পাইয়া থাকে। যাত্রীপ্রদত্ত তীর্থপিণ্ডও তাহাদিগকে ডাকিবামাত্র আসিয়া ভক্ষণ করিয়া থাকে। পুণ্যতোয়া ইন্দ্রদ্যুম্ন নামক সরোবর তীরে যে সকল দোকানীরা খৈয়ের মোয়া বিক্রয় করে, ঐ মোয়াতে নারিকেল কুচা মিশ্রিত থাকায় উহা এক উপাদেয় খাদ্যদ্রব্যে পরিণত হইয়াছে। এখানকার এই মোয়ার আস্বাদ অতি উত্তম।

ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরের দক্ষিণদিকে—সোপানের পূর্ব্বপার্শ্বে নৃসিংহ দেবের ও পশ্চিম পার্শ্বে নীলকণ্ঠেশ্বরের মন্দির বিরাজমান। এই স্থান হইতে আরও কিছু উপরিভাগের উত্তরদিকে নানা দেবদেবীর মূর্ত্তি এবং পঞ্চপাণ্ডবদিগের বনবাস সময়ের প্রতিমূর্ত্তির দর্শন পাওয়া যায়।

আঠারো নালা।

দশের পর আট—এই সংখ্যাবাচক আটারো শব্দের উৎপত্তি, উচ্চারণের দোষে ক্রমে সেই "আটারো শব্দ" আঠারোতে পরিণত

হইয়াছে। ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুগণ এই * আঠারো সংখ্যাটীর উপর গাঢ় ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন; ইহার প্রধান কারণ এই যে—হিন্দুদিগের সম্পূর্ণ বিশ্বাস, তাঁহাদের প্রধান ধর্ম্মশাস্ত্র যাহা পুরাণ নামে খ্যাত—সেই মহাশাস্ত্র পুরাণের সংখ্যা আঠারোখানি, এইরূপ আবার হিন্দু গৃহস্থের একমাত্র আরাধ্যদেব "শালগ্রামশিলা" সেই ত্রিলোক পূজ্য শালগ্রাম-শিলার সংখ্যা আঠারোটী। এতদ্ভিন্ন ধর্ম্মাত্মা ব্যাসদেব—যিনি সাক্ষাৎ নারায়ণের অংশ বলিয়া কথিত, সেই ব্যাসদেব রচিত মহাভারতের পর্ব্ব আঠারোটী। দেশপূজ্য এই পবিত্র গ্রন্থ পাঠে উপদেশ পাওয়া যায় যে—জগদ্বিখ্যাত কুরুপাণ্ডবের মহাযুদ্ধ উপস্থিত হইলে, সেই প্রলয়কর যুদ্ধে আঠারো অক্ষৌহিনী সৈন্যসমাবেশ হইয়া আঠারো দিনে উহার অবসান হয়।

এই আঠারো সংখ্যার কীর্ত্তিকলাপ যাহা কিছু সমস্তই চিরস্মরণীয়। প্রমাণ স্বরূপ দেখুন—পুরাকালে ভারতবর্ষে যে সংস্কৃত, প্রাকৃত, উদীচী, মহারাষ্ট্রী, দ্রাবিড়ী, মাগধী, প্রাচ্য, শকাভীরী, শ্রবন্তী, উৎকলী, বাহ্লিক প্রভৃতি ভাষা প্রচলিত ছিল, তাহাদের সংখ্যা আঠারোটী ছিল।

যমরাজের অনুচর ব্যাধি—সেই ব্যাধির সংখ্যা আঠারো কোটী। এইরূপ আবার আয়ুর্ব্বেদ ও বৈদ্যমতে প্রধান রোগের উপসর্গ ও মহাব্যাধি আঠারো প্রকার।

কোন স্ত্রীলোক ঠিক আঠারো বৎসরে গর্ভবতী হইলে, সে আপন কীর্ত্তি রাখিয়া স্বর্গারোহণ করিয়া থাকে অর্থাৎ তাহাকে আর কোন মতে রক্ষা করিতে পারা যায় না। এতদ্ভিন্ন আঠারো দিন, আঠারো মাস অথবা আঠারো বৎসর অতীত না হইলে—জলাতঙ্ক

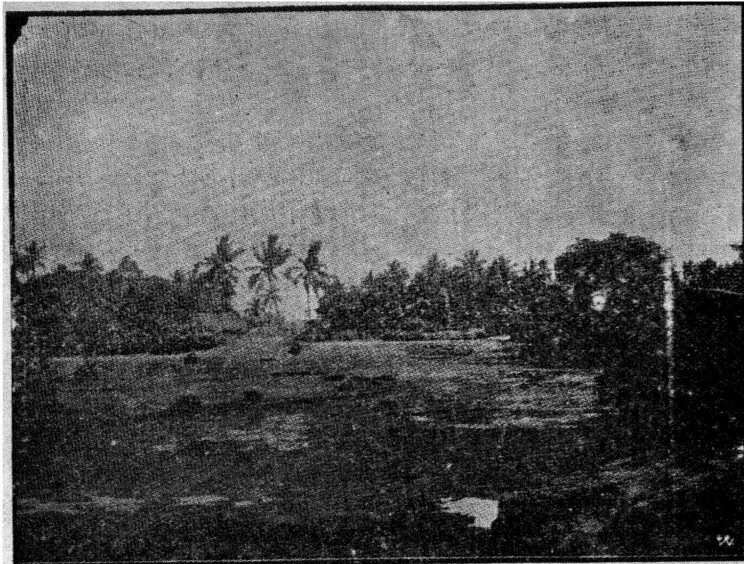
* "বসুধা"—১৩শ বর্ষ আশ্বিন ১৩২০ সাল হইতে সংগৃহীত।

রোগের ফাঁড়া কাটে না, আরও দেখুন কেহ কোন প্রবল শত্রু কর্ত্তৃক উপদ্রুত হইলে তাহাকে সহানুভূতি জানাইবার সময়, সাধারণে উপদেশ দিয়া থাকেন "বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা"।

ধর্ম্মাত্মা মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন এই আঠারো সংখ্যাবাচক শব্দের মাহাত্ম্য বারম্বার চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন, যখন আমার আঠারোটী পুত্র সংসার মাঝে বিরাজমান, তখন কিরূপে ইহাদের নাম চিরস্মরনীয় হইবে—তিনি যতই এই বিষয় লইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, ততই অধীর হইতে লাগিলেন, অবশেষে মন স্থির করিয়া ভগবান জগন্নাথ দেবের শরণাপন্ন হইলে—যে উপদেশ প্রাপ্ত হইলেন, উহাতেই পুরীধামে আঠারো নালার সৃষ্টি হইল।

মহাত্মা চৈতন্যদেব নানা তীর্থ পর্য্যটন করিয়া শেষে যখন তিনি পুরীধামে উপস্থিত হন, তখন স্থানীয় নদীটীতে বন্যাপ্রযুক্ত খরস্রোত বহিতে থাকে, ইহার ফলে তিনি উহা পার হইতে না পারিয়া দুঃখিত মনে সেই নদীতীরের এক স্থানে অবস্থান পূর্ব্বক রাত্রি যাপন করেন। অন্তর্যামী ভগবান জগন্নাথদেব—গৌরাঙ্গের কষ্টে ব্যথিত হইয়া বিশ্ব-কর্ম্মাকে স্মরণপূর্ব্বক সেই স্রোতস্বিনী নদীর উপর সেতু নির্ম্মাণ করিতে আদেশ করিলেন।

এদিকে বিশ্বকর্ম্মা সেতুটী নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিলে, উক্ত নদীর অধিষ্ঠাত্রীদেবী দেবতার আদেশে তাঁহার কার্য্যে নানারূপ বিঘ্ন উপস্থিত করিতে লাগিলেন। মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন পূর্ব্ব উপদেশ মত তখন সেই দেবীকে প্রসন্ন করিবার অভিপ্রায়ে স্বীয় অষ্টাদশ পুত্রের বলিদান করিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করেন এবং বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক যে ১৮টী খিলান, ইহাতে পত্তন হইয়াছিল, তাহার প্রত্যেক নালাটীতে এই সকল পুত্রের মস্তক প্রোথিত করিয়া আপন কীর্ত্তি স্থাপিত করিলেন।



আঠারো নালার দৃশ্য। [১১৪ পৃষ্ঠা।

Sulov Press, Calcutta.

এইরূপে আঠারো নালার সৃষ্টি হইয়াছে। পাঠকবর্গের প্রীতির নিমিত্ত সেই বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মিত আঠারো নালার একখানি চিত্র প্রদত্ত হইল।

নরেন্দ্র সরোবরের পার্শ্বদেশ অতিক্রম করিয়া যে পথটী বরাবর প্রসারিত হইয়াছে, সেই পথের সাহায্যে অতিকম এক পোয়া রাস্তা গমন করিলেই অষ্টাদশ খিলান-যুক্ত যে একটী সেতু দেখিতে পাওয়া যায়, সেই সেতুই এখানে আঠারো নালা নামে অভিহিত।

পুরীতে রেল পথ প্রস্তুত হইবার পূর্ব্বে—পাণ্ডাগণ জাহাজে করিয়া আপনাপন যাত্রীদিগকে প্রথমে জাজপুরে নামাইতেন, তৎপরে পর পর তীর্থগুলির সেবা করাইয়া যথাসময়ে পুরীর এই আঠারো নালা পার করাইয়া এই স্থান হইতেই শ্রীমন্দিরের ধ্বজা দর্শন করাইতেন এবং প্রত্যেক যাত্রীর নিকট হইতে ধুতি চাদর ও ধ্বজা দর্শনীর প্রণামী ১/০ স্বতন্ত্র আদায় পূর্ব্বক যথাসময়ে শ্রীমন্দিরে লইয়া যাইতেন। এক্ষণে রেলপথ প্রস্তুত হওয়াতে, তাঁহাদের সে লাভটী বাদ পড়িয়াছে।

শ্রীশ্রীলোকনাথদেবের মন্দির।

শ্রীমন্দিরের পশ্চিম দিকে অন্যূন এক ক্রোশ দূরে এই দেবালয়টী অবস্থিত। পূর্ণব্রহ্ম শ্রীরামচন্দ্র এই লিঙ্গরাজকে প্রতিষ্ঠা করেন। আমরা পুরী হইতে এই দেবকে দর্শন করিবার সময় গো-শকটের সাহায্য লইয়াছিলাম, কারণ এ তীর্থের রাস্তাগুলি কেবল বালুকাভূমে পরিপূর্ণ। মন্দিরের প্রবেশ দ্বারের সম্মুখেই একটী নির্ম্মল সলিলা পুষ্করিণী দেখিতে পাওয়া যায়। সেই পুষ্করিণীটী পার্ব্বতী সরোবর নামে খ্যাত। যাত্রীদিগকে প্রথমে এই সরোবরে স্নান করিয়া শুদ্ধ কলেবরে দেবস্থানে যাইতে হয়। স্নানের সময় এখানে কোন তৈল পাওয়া যায় না, পূর্ব্বে—পাণ্ডার নিকট এইরূপ উপদেশ পাইয়া আমরা

পুরী হইতে নারিকেল তৈল সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলাম। সে যাহা হউক পার্ব্বতী সরোবরে স্নান করিয়া মন্দির প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিবা মাত্র বিস্তর বানর আমাদিগকে বেষ্টন করিয়া তাহাদের খাবার ভিক্ষা করিতে লাগিল, আমরাও সাধ্যমত উহাদিগকে সন্তুষ্ট করিয়া দেবমন্দিরে প্রবেশ করিলাম।

এই সকল বানরগণের উপদ্রব এ তীর্থে এত ছিল যে, ইহাকে দ্বিতীয় ব্রজমণ্ডলী বলিলেও অত্যুক্তি হইত না। পূর্ব্বে যখন এই পুরীতে স্বায়ত্ব শাসনের ব্যবস্থা ছিল, তখন সেই স্বায়ত্ব শাসনের কর্ত্তৃপক্ষ—বানর হত্যার আজ্ঞা প্রচার করিয়া আপনাদের প্রতাপ অক্ষুন্ন রাখিয়াছিলেন। ইহার ফলে মিউনিসিপাল কর্ম্মচারীর হস্তে নিত্য কত বানর নৃশংস ভাবে প্রাণ দিত, তাহার ইয়ত্তা নাই। ঠিক এই সময় পূজ্যপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় ভারতের বহু তীর্থ পর্য্যটন করিয়া একদা সাম্যমৈত্রীর লীলাভূমি এই পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং স্বচক্ষে এখানকার বানর হত্যার ব্যবস্থা দেখিয়া, মৃত্যুকালীন সেই অসহায় জীবগুলির আর্ত্তনাদ শ্রবণে —তাঁহার করুণ হৃদয় কাঁদিয়া উঠিল। বলা বাহুল্য মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় স্বয়ং বিজ্ঞ, পণ্ডিত এবং অসাধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন লোক ছিলেন, সেই ক্ষমতা বলে তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া স্থানীয় মিউনিসিপালিটীর কর্ত্তৃপক্ষগণকে নানাপ্রকার হিতোপদেশ দানে উহাদের মতিগতি পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক এই নিষ্ঠুর কার্য্য হইতে বিরত করিয়া আপন মহত্ব প্রকাশ করিলেন, তৎসঙ্গে বানর কুলকে অকাল মৃত্যু হইতে রক্ষা করিলেন।

এখানে ভগবান লোকনাথ নামক রামেশ্বরজীউ একটী প্রস্তরময় শিবলিঙ্গমূর্ত্তি—মন্দির মধ্যে তিনি সদাসর্ব্বদা জলে ডুবিয়া অবস্থান

করিতেছেন। স্থানীয় পূজারীদিগের নিকট উপদেশ পাইলাম, এই দেব কেবল শিবচতুর্দ্দশীর দিন জল হইতে বাহির হন, অপর সময় এইরূপ অবস্থায় জলেই ডুবিয়া থাকেন। লোকনাথদেবের পবিত্র মূর্ত্তিটী অতি ছোট আকারের। দেবালয়ের বহির্দ্দেশে একটী ঘণ্টা ঝুলিতেছে। এই মন্দিরের ভিতর একটী জলের উৎস থাকায়, সর্ব্বদা উহা হইতে ধীরে ধীরে জল উঠিয়া থাকে এবং মাপের অতিরিক্ত জল জমিলেই দেবী-পীঠের উপর দিয়া সেই জল বাহির হইয়া যায়। কথিত আছে এই দেব জগন্নাথদেবের তোষাখানার দেওয়ানরূপে এখানে অবস্থান করিতেছেন; তজ্জন্য ইহার ধাতুনির্ম্মিত উৎসব মূর্ত্তিটী প্রতি রাত্রিতেই শ্রীমন্দিরের তোষাখানায় আনীত হইয়া প্রাতঃকালে পুনর্ব্বার উহা এখানে স্থিত হইয়া থাকেন। প্রাঙ্গণের পশ্চিমদিকে দেবতার রন্ধনশালা প্রতিষ্ঠিত। তথায় অন্ন রন্ধন হইয়া প্রত্যহ দেবতার ভোগ হইয়া থাকে। এ ভোগের বিশেষ কিছু ধূমধাম দেখিতে পাওয়া যায় না। আমরা সদলে ভগবান লোকনাথের যথানিয়মে পূজার্চ্চনা সমাপনান্তে সাধ্যমত পূজারীকে কিঞ্চিৎ দক্ষিণাদানে এই মন্দির বাহিরের বাগানে বিশ্রাম পূর্ব্বক আপনাপন গো-শকটে উঠিলাম। তৎপরে অতিকম দুই ঘণ্টা সময় অতিবাহিত করিয়া পুরীর নির্দ্দিষ্ট বাসাবাটীতে উপস্থিত হইয়াছিলাম।

ভগবান শ্রীরামচন্দ্র এই দেবালয়টী প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহার সৈন্য কপিবানরগণকে ইহার প্রহরী নিযুক্ত করেন। এই নিমিত্ত এখানে বিস্তর কপিবানরকে দেখিতে পাওয়া যায়।

পুরীর প্রসিদ্ধ পরিব্রাজক * মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

শান্তিপুরের প্রসিদ্ধ শ্রীমৎ অদ্বৈত প্রভুর পবিত্র বংশে—আনন্দ মোহন গোস্বামীর ঔরসে পুণ্যবতী স্বর্ণময়ী দেবীর দ্বিতীয় গর্ভে ১৮৪১ খৃষ্টাব্দের ঝুলন পূর্ণিমার রাত্রে প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণের জন্ম হয়। বিজয়কৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ—ব্রজগোপাল নামে জনসমাজে পরিচিত ছিলেন। আনন্দ মোহন ও গোপীমাধব ইহারা দুই সহোদর; তন্মধ্যে গোপী-মাধবই জ্যেষ্ঠ। এই আনন্দ মোহন—বিজয় কৃষ্ণের শৈশব অবস্থায়, সকলকে পরিত্যাগ করিয়া অমরধামে গমন করেন। তখন বিজয় কৃষ্ণের জ্যেষ্ঠতাত—গোপীমাধব গোস্বামী মহাশয় নিঃসন্তান অবস্থায় অবস্থান করাতে ভ্রাতৃবধূর সম্মতিক্রমে এই শিশু বিজয় কৃষ্ণকে দত্তক পুত্ররূপে গ্রহণ করেন।

বিজয়কৃষ্ণের পিতৃ পিতামহগণ দীক্ষাগুরু ব্যবসায়ী ছিলেন, অদ্বৈত বংশের গুরু গৌরবে মুগ্ধ হইয়া অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি স্বেচ্ছায় বহু অর্থ ব্যয় স্বীকার করিয়া অদ্বৈতের বংশধরদিগকে দীক্ষাগুরুরূপে মান্য করিয়া আপনাদিগকে চরিতার্থ বোধ করিতেন, এমন কি আনন্দ মোহন ও গোপীমাধব গোস্বামী মহাশয়ের আমল পর্য্যন্ত এই প্রথা প্রচলিত ছিল। এইরূপে বিস্তর আয় থাকায় এই সুবৃহৎ গোস্বামী পরিবার সুখসচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতেন।

গোপীনাথ গোস্বামী মহাশয়ের চেষ্টায় এক্ষণে বালক বিজয়কৃষ্ণের প্রথমে গুরু মহাশয়ের প্রাথমিক শিক্ষা আরম্ভ হয়। তিনি বিজয়কে ধীশক্তি প্রখরা দেখিয়া কিছুদিন পর সন্তুষ্টচিত্তে এই বালককে স্থানীয়

---

* "জীবন-চিত্র" গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত।

একটী টোলে ভর্ত্তি করিয়া দেন, বিজয়কৃষ্ণ এখানে এক বৎসরের মধ্যেই সমস্ত ব্যাকরণ-শাস্ত্র আয়ত্ত করিলে—গোপীমাধব গোস্বামী মহাশয় পুনর্ব্বার তাঁহাকে সাহিত্য ও অলঙ্কার-শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য কলিকাতার সংস্কৃত কলেজে পড়াইবার ব্যবস্থা করিলেন। এই সময় বিজয়কৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ব্রজগোপাল মৃত্যুমুখে পতিত হন।

যে সময় বিজয়কৃষ্ণ সংস্কৃত কলেজে বিদ্যাশিক্ষা করিতেছিলেন, এই নির্দ্দিষ্ট সময়ে কলিকাতার ভদ্র সম্প্রদায়ের ভিতর,ব্রাহ্মধর্ম্ম বিলক্ষণ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল অর্থাৎ শিক্ষিত যুবকমণ্ডলী একে একে নব সংস্কারপূত ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইতেছিলেন। বিজয়কৃষ্ণও যথাকালে কলেজে শিক্ষা লাভ করিতে করিতে ব্রাহ্মধর্ম্মের উদরতায় মুগ্ধ হইয়া, এই ব্রাহ্মধর্ম্মকে ভারতের যুগোপযোগী ধর্ম্ম বলিয়া স্থির করিলেন, সুতরাং তিনি আত্মার আকুল তৃষ্ণা শান্তির আশায়, প্রকাশ্যে ব্রাহ্মসভায় যোগদান করিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে গোপীমাধব গোস্বামী মহাশয় এই সময় সংসারমায়া পরিত্যাগ করিয়া অমরধামে প্রস্থান করেন।

যে বিজয়কৃষ্ণের পিতৃপিতামহগণকে দীক্ষাগুরু পদে মান্য করিয়া সকলে চরিতার্থ বোধ করিতেন, এক্ষণে তাঁহাদের অবর্ত্তমানে, তাঁহাদেরই একমাত্র উত্তরাধিকারী—হিন্দুধর্ম্মের পরিবর্ত্তে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করাতে সকল শিষ্যই অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার সংস্রব পরিত্যাগ করিলেন। ইহার ফলে সুবৃহৎ গোস্বামী পরিবারবর্গের ভরণপোষণের নিমিত্ত তাঁহাকে বিব্রত হইতে হইল।

এদিকে বিজয়কৃষ্ণের ব্রাহ্মবন্ধুগণ, তাঁহার আয়ের পথ রুদ্ধ হইল দেখিয়া বিজয়কৃষ্ণকে চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য উপদেশ দিলেন। তিনিও স্থির করিলেন যে এবার গুরুগিরির পরিবর্ত্তে ডাক্তারী

করিতে পারিলে, সমাজে আর কেহ তাহাকে উপেক্ষা করিতে পারিবেন না—এই বিশ্বাসে তিনিও মন স্থির করিয়া মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি হইলেন।

অক্লান্ত পরিশ্রম ও অসামান্য অধ্যবসায়গুণে অল্পদিনের মধ্যেই তিনি একজন অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্র বলিয়া পরিচিত হইলেন। এইরূপে তিন বৎসর কাল তিনি মেডিকেল কলেজে শারীর-বিজ্ঞান-শিক্ষা করিলে তাঁহার অসাধারণ স্মৃতিশক্তি সকলকে স্তম্ভীত করিয়া তুলিল। এই সময় অদৃষ্টদেবী বিজয়কৃষ্ণের প্রতি অপ্রসন্ন হওয়ায়, কোন বিশেষ কারণ বশতঃ কলেজের অধ্যক্ষের সহিত তাঁহার বচসা হইল, সুতরাং তিনি বাধ্য হইয়া শেষ পরীক্ষা দিবার পূর্ব্বেই আত্মভিমানের আবেগে এই কলেজ পরিত্যাগ করিলেন।

মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের বক্তৃতা করিবার অসাধারণ ক্ষমতা থাকায়, এবার তিনি দ্বিগুণ উৎসাহে ভারতের নানা স্থানে তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র প্রসারিত করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের গূঢ়তত্ত্ব প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে বহুদিবসাবধি ব্রাহ্মধর্ম্ম যাজন করিয়াও যখন তাঁহার অভিষ্ট সিদ্ধ হইল না দেখিলেন, তখন তিনি দেশভ্রমণে বহির্গত হইলেন।

এই দেশভ্রমণ উপলক্ষে একদা এক পরমহংসের কৃপায় তিনি যোগধর্ম্ম শিক্ষালাভ করিতে সমর্থ হইলেন। সাধুসহবাসের অপূর্ব্ব মহিমায় তাঁহার হৃদয়ে যে অভাব বর্ত্তমান ছিল, এক্ষণে তাহা পূর্ণ হইল। ফলতঃ তিনি উপেক্ষিত হিন্দুশাস্ত্রকে অভ্রান্ত আপ্ত বাক্য বলিয়া বিশ্বাস করিলেন এবং সেই পরমহংসের উপদেশ প্রাপ্তে সন্তুষ্টচিত্তে স্বীয় মত পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক আবার স্বেচ্ছায় হিন্দুধর্ম্মকে আলিঙ্গন করিয়া

একজন আদর্শ হিন্দুর মত, সাধারণ হিন্দু নরনারীদিগকে যোগশিক্ষায় দীক্ষিত করিতে লাগিলেন।

এক্ষণে মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণের অদ্ভুত ক্ষমতা দর্শনে ইতিপূর্ব্বে যে সকল পৈতৃক শিষ্য তাঁহাকে হিন্দুধর্ম্মবিদ্বেষী বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহারাই আবার তাঁহার স্নেহের-সঙ্গে ফিরিতে লাগিল।

প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় দেশের জন্য, দশের জন্য বিস্তর পরিশ্রম স্বীকার করিলে—সাধারণে তাঁহার হৃদয় যেন মহত্ত্বের প্রশস্তক্ষেত্র বলিয়া অনুভব করিতে লাগিলেন।

উদার-হৃদয় বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় তৎপরে বহু তীর্থস্থান পর্য্যটন করিয়া শেষে সাম্যমৈত্রীর লীলাভূমি শ্রীক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া একদিকে যেমন নিঃসহায় বানরকুলকে রক্ষা করিলেন, অপরদিকে সেইরূপ পুরীবাসীর দুঃখ দর্শনে বিচলিত হইয়া মুক্ত হস্তে তাঁহার সঞ্চিত ষষ্ঠীসহস্র মুদ্রা অকাতরে বিতরণ করিলেন।

* * * * *

মহাপ্রাণী বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় এইরূপে বহুকালাধিবধি পরোপকার ব্রতে বৃত হইয়া শেষে ১৮৯৯ খৃঃ ২২ শে জ্যৈষ্ঠ রবিবার রাত্রি ৯ ঘটিকার সময় সংসার মায়ার মলিনতা হইতে মুক্ত হইয়া অমরধামে প্রস্থান করিলেন। অদ্যাপি তাঁহার বহুশিষ্য মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণকে দেবতার অবতার জ্ঞানে ভক্তিসহকারে সেই পবিত্র মূর্ত্তির পূজার্চ্চনা করিয়া থাকেন।

যমেশ্বরদেব।

শ্রীমন্দিরের অর্দ্ধ মাইল দূরে দক্ষিণদিকে যমেশ্বরদেবের মন্দিরটী অবস্থিত। কথিত আছে ভগবান শঙ্কর—এই স্থানে যমের সংযম নষ্ট

করিয়াছিলেন। এই যমেশ্বরদেবের যথানিয়মে পূজার্চ্চনা করিলে তাহার আর যমদণ্ডের ভয় থাকে না।

অলাবুকেশ্বর মহাদেব।

যমেশ্বরদেবের মন্দিরের পশ্চিমভাগে অলাবুকেশ্বরের দেবালয়টী স্থাপিত দেখিতে পাওয়া যায়। ৬৫০ খৃঃ মহারাজ ললাটেন্দু কেশরী কর্ত্তৃক এই দেবমূর্ত্তিটী এখানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কথিত আছে এই দেবতাকে যথানিয়মে পূজার্চ্চনা করিলে বন্ধ্যানারী পুত্রলাভ করিতে সমর্থ হন, অধিকন্তু কুরূপা—সুরূপা হইয়া থাকেন।

বিদুরালয়।

বৈষ্ণব চূড়ামণি ধর্ম্মাত্মা বিদুর—এই স্থানে অবস্থান কালীন, একদা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ—তাঁহার নিকট অতিথিরূপে আগত হন। ধর্ম্মপুত্র বিদুরের আলয়ে সে দিবস সামান্য খুদের পিষ্টক ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। এদিকে ভগবানকে অতিথিরূপে সমাগত দেখিয়া তিনি ভক্তিসহকারে সেই পিষ্টক দ্বারাই তাঁহার সেবা করেন। নারায়ণ এই পিষ্টক ভক্ষণ করিয়া সন্তুষ্টচিত্তে "ইহা অক্ষুরান্ত হউক" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। যাত্রীগণ—অদ্যাপি এই বিদুরালয়ে উপস্থিত হইলে, সেই মহাপ্রসাদস্বরূপ খুদের পিষ্টক আস্বাদ করিয়া আপনাদিগকে চরিতার্থ বোধ করিয়া থাকেন।

বিদুরালয়ের সন্নিকটে—একস্থানে ভৃগুপদচিহ্নধারী নারায়ণ মূর্ত্তির দর্শন করিয়া নয়ন ও জীবন সার্থক করিবেন। প্রবাদ—একদা ভৃগু-মণি—নারায়ণের মনোভাব পরীক্ষা করিবার অভিলাষে, যে সময় তিনি কমলাদেবীকে লইয়া অনন্তশয্যায় শায়িত ছিলেন, ঠিক সেই সময় মহামুণিভৃগু, তথায় উপস্থিত হইয়া নারায়ণের বক্ষঃস্থলে পদাঘাত

করিলেন ; মুনির আচরণে কমলাদেবী কুপিত হইলে—তিনি আপন মহত্ত্ব প্রকাশ করিবার নিমিত্ত মুনির ঐ পদচিহ্ন স্বীয় বক্ষঃস্থলে ধারণ করিয়া ঋষিবরের পদসেবায় নিযুক্ত হইলেন, কেননা তিনি এই ভাব দেখাইলেন যে—তাঁহার কঠিন হৃদয়ে পদাঘাত করিয়া না জানি ঋষির কোমল চরণে কতই না ব্যাথা হইয়াছে। এই অদ্ভুত দৃশ্যে মুনির চৈতন্য হইল, তখন তিনি তাঁহার তপস্যায় মনোনিবেশ করিলেন। যাত্রীগণ এ তীর্থে ভৃগুপদ চিহ্নধারী সেই নারায়ণ মূর্ত্তির দর্শন করিয়া নয়ন ও জীবন সার্থক করিতে অবহেলা করিবেন না।

পুরীর দ্রষ্টব্য স্থান।

১। শ্রীমন্দির, ২। স্বর্গদ্বার, ৩। চক্রতীর্থ, ৪। সিদ্ধ-বকুল, ৫। মার্কণ্ডেয়-হ্রদ, ৬। শ্বেত-গঙ্গা, ৭। অলাবুকেশ্বর, ৮। যমেশ্বর, ৯। নরেন্দ্র-সরোবর, ১০। গুণ্ডিচা-গৃহ, ১১। ইন্দ্র-সরোবর, ১২। আঠার-নালা, ১৩। রন্ধনশালা, ১৪। লক্ষ্মীদেবীর মন্দির, ১৫। লোকনাথ, ১৬। সমুদ্র, ১৭। বিদুরালয়, ইত্যাদি।

শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের প্রকাশ সম্বন্ধে কিম্বদন্তী এইরূপ ;—

মালব দেশাধিপতি পরম বৈষ্ণব মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন কর্ত্তৃক দারুমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইলে—সেই পবিত্র মূর্ত্তিই কলির একমাত্র ত্রাণকর্ত্তা "জগন্নাথ" নামে প্রসিদ্ধ হন। মনুষ্যগণও রাজার উপদেশ মত এই জগন্নাথদেবকে পূর্ণব্রহ্ম ভগবানের অন্যতম মূর্ত্তি বলিয়া জানিতে পারিয়া ভক্তিসহকারে তাঁহার যথানিয়মে পূজার্চ্চনা পূর্ব্বক আপনাপন মুক্তির পথ পরিস্কার করিতে লাগিলেন। দিনের পর দিন বৎসরের পর বৎসর এইরূপে অতীত হইলে—একদা রাজার প্রতিষ্ঠিত সেই পবিত্র

দারুমূর্ত্তি কালাপাহাড়ের অত্যাচার সময় স্থানীয় পাণ্ডাগণ কর্ত্তৃক শ্রীমন্দির হইতে চিল্কাহ্রদের মধ্যবর্ত্তী পারিকুদ নামক দ্বীপের একস্থানে গুপ্তভাবে প্রোথিত হইল, কিন্তু দেবদ্বেষী কালাপাহাড়ের নিকট কিছুতেই নিস্তার না পাইয়া উহা সর্ব্বসমক্ষে সমুদ্রতীরে ভস্মে পরিণত হইল। তখন পাণ্ডাগণ যুক্তি করিয়া পুনর্ব্বার নিমকাষ্ঠ দ্বারা শ্রীশ্রী-জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা দেবীর শ্রীমূর্ত্তি প্রস্তুত করাইয়া যথানিয়মে পুরীর ঐ শূন্য মন্দিরে তাঁহাদিগকে প্রতিষ্ঠা করেন। বর্ত্তমান কালে আমরা যে মূর্ত্তিত্রয় দর্শন পাইয়া চরিতার্থ বোধ করিয়া থাকি উহাই পাণ্ডাগণ কর্ত্তৃক সেই প্রতিষ্ঠিত মূর্ত্তিত্রয়।

সাধকগণ কর্ত্তৃক তীর্থস্থান মাত্রেই দেবমন্দির ও বিগ্রহমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহার প্রধান কারণ এই যে—মনুষ্য হৃদয়ে প্রীতি ও ভক্তি ভাবের বীজ বপনের উদ্দেশ্য অর্থাৎ মানবগণকে আমাদের এই জটিল হিন্দুশাস্ত্র ও ভগবানের আকৃতি কিরূপ, উহা বুঝাইবার নিমিত্তই তীর্থ স্থানে একটী না একটী মূল বিগ্রহমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

মহাপুরুষগণ পুরাণ শাস্ত্রে—বার ব্রত, উপবাস প্রভৃতির যে সমস্ত ব্যবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন। তাহার মূল অর্থ এই যে—মনুষ্যগণ অল্প অল্প করিয়া এই সকল বার ব্রত পালন দ্বারা পুণ্য সঞ্চয় করিতে শিক্ষা লাভ করিলে—ধর্ম্মে মতিস্থির রাখিতে পারিবে এবং উপবাসাদি অভ্যাস থাকিলে, তদ্দারা ক্রমে সাধন পথে অগ্রসর হইতে সক্ষম হইবে; নচেৎ একেবারে অনভ্যস্ত দেহ লইয়া এদিকে অগ্রসর হইলে অর্থাৎ সাধন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেই মৃত্যুমুখে পতিত হইবার সম্ভাবনা।

সাধু মহাপুরুষ ব্যতীত মানব কখন ভগবানের স্বরূপ মূর্ত্তির দর্শন লাভ করিতে সমর্থ হন না। ভাগ্যক্রমে যদি কখন কেহ কোন সাধু মহাত্মার কৃপা প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে তাঁহাকে ভগবানের স্বরূপ মূর্ত্তির

বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে—তিনি আপন ইচ্ছানুসারে একটী মূর্ত্তির কল্পনা করিয়া উপদেশ দিয়া থাকেন। যিনি সেই কাল্পনিক মূর্ত্তির উপাসনা করেন, ভক্তবৎসল ভগবান তাহাকে সেই মূর্ত্তিতে দর্শন দানে উদ্ধার করিয়া থাকেন। কথিত আছে—ভগবান নিরাকার, সর্ব্বব্যাপী, চৈতন্যস্বরূপ। তিনি কখন্ কাহার প্রতি সদয় হইয়া কিরূপে অবতীর্ণ হন, তাহা কেহ নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে না। প্রমাণ স্বরূপ বলিতে পারা যায়, একটী অবোধ শিশু—যে কখন"জুজু বা হুতোম পেঁচা"দেখে নাই, তাহাকে যে কোন একটী চিত্রমূর্ত্তি আঁকিয়া দেখাইলে উক্ত মূর্ত্তিটীকেই সে "হুতোম পেঁচা বা জুজু" বলিয়া জানিতে পারে। অবোধ মনুষ্যগণও সেইরূপ সাধু পুরুষদিগের নিকট ভগবানের যেরূপ মূর্ত্তির উপদেশ পান, তিনি সেইরূপই শিক্ষা লাভ করিয়া থাকেন, কেননা লীলাকারী জগৎ-পাতা জগদীশ্বর আপন লীলা প্রকাশ ছলে ধরায় নানা অবতার মূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন।

এস্থলে যে জগন্নাথ মূর্ত্তির বিষয় উল্লেখ হইতেছে, উহা রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন প্রতিষ্ঠিত সেই জগন্নাথদেবের বিষয়ই প্রকাশিত হইল ;—

একদা রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন স্বপ্নে অবগত হইলেন যে, নীলাচল পর্ব্বতের একস্থানে স্বয়ং পূর্ণব্রহ্ম ভগবান পাপীদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য মর্ত্ত্যধামে অবতীর্ণ হইয়া বিরাজ করিতেছেন। সেই স্বপ্নানুসারে রাজা এই বিস্তৃত পর্ব্বতের নানা স্থানে নানাপ্রকার লোকদিগকে তাঁহার সন্ধানে নিযুক্ত করিলেন। এই সকল লোকদিগের মধ্যে বিদ্যাপতি নামে একজন ব্রাহ্মণও ছিলেন। রাজার আজ্ঞানুসারে একদা এই ব্রাহ্মণ সেই নীলাচল পর্ব্বতে ভগবানের সন্ধান করিতে করিতে সন্ধ্যা সমাগত হইয়াছে দেখিয়া ভীত মনে শবর বসু নামক স্থানীয় এক ব্যক্তির কুটীরে অতিথিরূপে উপস্থিত হইলেন।

বিদ্যাপতি যে সময় তথায় উপস্থিত হন, গৃহস্বামী শবর বসু তখন কোন বিশেষ কার্য্য বশতঃ অন্যত্র গমন করিয়াছিলেন। নবযৌবন সম্পন্না এক কুমারী কন্যা ব্যতীত তথায় আর দ্বিতীয় ব্যক্তি কেহই ছিল না। বলা বাহুল্য এই যুবতী কন্যাই শবরের প্রতিনিধি স্বরূপ অতিথি সৎকার করিয়া ধর্ম্ম রক্ষা করিলেন। আগন্তুক বলিষ্ঠ সুন্দর যুবাপুরুষ এবং কুমারী যুবতী থাকায়—অল্প সময়ের মধ্যে তাঁহাদের পরস্পরের মন আকৃষ্ট হইয়াছিল। এদিকে শবর বসু নির্দ্দিষ্ট সময়ে আপন কুটীরে উপস্থিত হইবা মাত্র এই অদ্ভুত ঘটনা অবলোকন পূর্ব্বক আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, কারণ তিনি ভাবিলেন এতাবৎকাল আমি এই নিবিড় নির্জ্জন স্থানে বাস করিতেছি, কিন্তু কখন জনমানবের সাক্ষাৎ এখানে পাই নাই; আজ ভাগ্যক্রমে এই বিপ্রকে অতিথিরূপে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার আনন্দের সীমা রহিল না। বিশেষতঃ তিনি যুবকের পরিচয়ে জানিতে পারিলেন, অদ্যাপি তিনি বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ হন নাই, এদিকে পাত্রাভাবে তিনিও তাঁহার যুবতী কন্যাকে সম্প্রদান করিতে সমর্থ হন নাই। শবর বসু অবসর মত মনে মনে এই বিষয় আন্দোলন করিতেন, একদা তিনি তাহাদের উভয়ের মনের আন্তরিক ভাব বুঝিতে পারিয়া, বিদ্যাপতির সম্মতিক্রমে শুভদিনে শুভলগ্নে তাঁহার একমাত্র দুহিতাকে উক্ত ব্রাহ্মণের করে সমর্পণ করিয়া নিজে কন্যাদায় হইতে উদ্ধার হইলেন।

বিদ্যাপতি এইরূপে এখানে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইয়া কিছুদিন পরম সুখে অতিবাহিত করিলেন। তিনি অভ্যাসমত প্রত্যহ প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করিতেন, কিন্তু সেই সময় কখন শবরবসুকে দেখিতে পাইতেন না! এই নিমিত্ত এক সময় বিদ্যাপতি আগ্রহের সহিত তাঁহার প্রিয়তমাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। বলাবাহুল্য এই অল্প

কালের মধ্যে তাহাদের উভয়ের মধ্যে এরূপ সদ্ভাব জন্মিয়াছিল যে, কোন বিষয় গোপন করিবার ছিল না। সরলহৃদয়া শবরদুহিতা স্বামীর সাদরসম্ভাষণে অকপটচিত্তে বলিলেন,—ভগবান জগন্নাথদেব নীলমাধব রূপে নীলগিরি নামক পর্ব্বতোপরি বিরাজ করিতেছেন, আমার পিতা প্রত্যহ প্রত্যূষে তথায় গোপনে গমন করিয়া তাঁহারই পূজার্চ্চনা করিয়া থাকেন। এই কারণে আপনি সকাল বেলা পিতৃদেবের সাক্ষাৎ পান না।

বিদ্যাপতি ইতিপূর্ব্বে একবার কথন স্বপ্নেও অনুমান করেন নাই, যে তিনি পত্নীর নিকট এরূপ শুভ সংবাদ পাইবেন। এক্ষণে তিনি যে দেবের উদ্দেশে এই নির্জ্জন স্থানে উপস্থিত হইয়া বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইলেন এবং বাধ্য হইয়া বনে বাস করিতে লাগিলেন, ভাগ্যক্রমে আজ তিনি সেই পরম পুরুষ ভগবান জগন্নাথ দেবেরই সন্ধান পাইয়া আনন্দে অধীর হইলেন।

এইরূপে কিছুদিন অতীত হইলে পর একদা মধ্যাহ্নকালে শবর বসু কুটিরে প্রত্যাগমন করিলে—বিদ্যাপতি বিনীত ভাবে তাঁহার নিকট নীলাচলে ভগবান নীলমাধবজীউর মূর্ত্তি দর্শন করাইতে অনুরোধ করিলেন। শবর বসু এই প্রস্তাবে কিছুতেই সম্মত হইলেন না; অবশেষে তাঁহার স্নেহময়ী কন্যার কাতর অনুরোধে, বস্ত্রদ্বারা বিদ্যাপতির চক্ষু বন্ধন করিয়া উহাকে দেবস্থানে লইয়া যাইতে সম্মত হইলেন। এরূপ অবস্থায় গমন করিলে বিদ্যাপতির অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে না স্থির জানিয়া তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং এই বিষয়ই চিন্তা করিতে করিতে অতি কষ্টে দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন। শবর-দুহিতা স্বামীর দুঃখের প্রকৃত কারণ অবগত হইয়া বিনয়-বচনে তাঁহার চরণে নিবেদন করিলেন, "নাথ!

আপনি বৃথা চিন্তা করিয়া মনে দুঃখ পাইতেছেন। আমি এক উপায় স্থির করিয়াছি—বিনাবাক্যব্যয়ে আপনি আমার পিতার প্রস্তাবেই সম্মত হইয়া গমন-কালীন বস্ত্রাঞ্চলে গুপ্তভাবে কিছু সরিষা বাঁধিয়া লইবেন এবং তাঁহার অজ্ঞাতসারে পথিমধ্যে সেগুলি বিক্ষিপ্ত করিতে করিতে যাত্রা করিবেন, যখন ঐ বীজ হইতে গাছ উৎপন্ন হইবে, তখন সহজেই আপনি পথ চিনিয়া লইতে পারিবেন।"

বিদ্যাপতি পত্নীর যুক্তিপূর্ণ বাক্যে আহ্লাদিত-মনে শবর বসুর প্রস্তাবে সম্মত হইলেন, এবং পর দিবস যথা-সময়ে ভগবান নীলমাধব-জীউর দর্শনে শুভযাত্রা করিলেন। তখন শবর বসু পূর্ব্ব-কথিত মত জামাতার চক্ষু বন্ধন পূর্ব্বক গন্তব্যস্থানে গমন করিতে লাগিলেন, বলা বাহুল্য এদিকে বিদ্যাপতিও তাঁহার পশ্চাদ্গামী হইয়া গোপনে পথের উভয় পার্শ্বে স্ত্রীপ্রদত্ত সেই সরিষাগুলি ছড়াইতে ছড়াইতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এইরূপে তাঁহারা নির্দ্দিষ্টস্থানে উপস্থিত হইলে শবর,—জামাতার চক্ষের বন্ধন মোচন করাইয়া তাহাকে জগন্নাথদেবের নীল-মাধব মূর্ত্তি দর্শন করাইলেন।

অনন্তর শবর বিদ্যাপতিকে এক বৃক্ষতলে উপবেশন করাইয়া দেবতার পূজার্চ্চনা করিবার অভিলাষে—ফলমূল সংগ্রহ করিতে গমন করিলেন। ইত্যবসরে বিদ্যাপতি এই অপরিচিত স্থানটী উত্তমরূপে চিহ্নিত করিয়া লইলেন। ঠিক এই সময় তিনি এক আশ্চর্য্য ঘটনা দেখিলেন—এক ভূষণ্ডী-কাক, বৃক্ষশাখা হইতে নিকটস্থ কতিপয় কুণ্ডে পতিত হইবামাত্র চতুর্ভুজ হইল; তদ্দর্শনে বিদ্যাপতি মনে মনে ভাবিলেন, আহা, এই কুণ্ডের কি মাহাত্ম্য! যদি আমি ইহাতে স্নান করি, তাহা হইলে বোধ হয় আমিও ইহার মাহাত্ম্যগুণে নিশ্চয় সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হইয়া বিষ্ণুপদে স্থান পাইব। এই সিদ্ধান্তে উপনীত

হইয়া তিনি কুণ্ডাভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন, এমন সময় ঐ চতুর্ভুজ কাক—বিদ্যাপতিকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিল, "হে ব্রাহ্মণ! তুমি যে কুণ্ডে স্নান করিতে অভিলাষ করিতেছ উহা রোহিণী কুণ্ড নামে খ্যাত। এই রোহিণী কুণ্ডে স্নান করিলে মোক্ষলাভ হয়। যদ্যপি তুমি ইহাতে স্নান কর, তাহা হইলে "জগন্নাথদেব" কিরূপে নরলোকে প্রকাশিত হইবেন, আর তুমি যে দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত আছ, তাহা কি একেবারে ভুলিয়া গিয়াছ?"

বিদ্যাপতি—কাকের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণে হতবুদ্ধি হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। এদিকে শবর বসু নীলমাধবজীউর যথানিয়মে পূজার্চ্চনা সমাপনান্তে, জামাতার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং পূর্ব্বের ন্যায় তাহার চক্ষু বন্ধন করিয়া আপন আলয়াভিমুখে সানন্দে প্রত্যাগমন করিলেন।

এইরূপে কিছুদিন অতীত হইবার পর একদা বিদ্যাপতি সেই সরিসা বীজ হইতে গাছগুলি পথের চিহ্নস্বরূপ উৎপন্ন হইয়াছে দেখিয়া তিনি ঐ সকল গাছের সাহায্যে শবর বসুর অজ্ঞাতসারে দেবস্থানে গমনাগমন পূর্ব্বক সেই অপরিচিত স্থানটী উত্তমরূপে চিনিয়া লইলেন এবং সুবিধা মত স্বীয় পত্নী ও শ্বশুরের নিকট বিদায়গ্রহণপূর্ব্বক স্বদেশে যাত্রা করিলেন। বলা বাহুল্য শবর বসু এ বিষয় বিন্দুমাত্র জানিতে পারেন নাই।

বিদ্যাপতি এক্ষণে নীলমাধবজীউর কৃপায় নির্ব্বিঘ্নে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নের নিকট যথাযথ নিবেদন করিলে—তিনি সন্তুষ্টচিত্তে আপন দলবলসহ এই নীলগিরি পর্ব্বতে উপস্থিত হইলেন। এদিকে মায়াময় জগন্নাথদেবের মায়ায়,তাঁহারা তথায় পৌঁছিয়া কোন দেবতারই দর্শন পাইলেন না; সুতরাং মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন বিদ্যা-

পতিকে মিথ্যাবাদী স্থির করিয়া তাঁহার প্রতি কোপদৃষ্টি সঞ্চালন করিতে লাগিলেন; তদ্দর্শনে বিদ্যাপতি ভীতচিত্তে রাজসমীপে নিবেদন করিলেন, "মহারাজ! আমি নিশ্চয় বলিতেছি, শবর বন্ধু আমাদিগের আগমনবার্ত্তা কোনরূপে সন্ধান পাইয়া ভগবান নীলমাধবজীউকে স্থানান্তরিত করিয়াছেন।" তিনি যে ভুলক্রমে অন্যপথে আসেন নাই, প্রমাণস্বরূপ স্থানীয় সরিসা গাছগুলি তাঁহাকে দেখাইলেন। ইহাতে রাজা বিদ্যাপতির বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া, ক্রোধান্বিত কলেবরে তাঁহার অনুচরবর্গকে উক্ত শবরকে বন্ধন পূর্ব্বক তাঁহার নিকট হাজির করিতে আজ্ঞাদান করিলেন। আজ্ঞাপ্রাপ্তে অনুচরেরা সদলে শবর-কুটীরে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে নির্য্যাতন করিতে লাগিল। শবর এই আসন্ন বিপদে হতবুদ্ধি হইয়া তাঁহার হৃদয়-সর্ব্বস্ব একমাত্র ত্রাণকর্ত্তা জগন্নাথদেবজীউর পদপ্রান্তে মনোবেদনা নিবেদন করিলেন। ভক্তের মর্ম্মভেদী করুণ প্রার্থনায় ভগবান কাতর হইয়া এক আকাশবাণীতে প্রচার করিলেন, "রাজন্! তুমি এক্ষণে আমার দর্শন পাইবে না, অগ্রে এই স্থানে একটী মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া, চতুরানন (ব্রহ্মা) দ্বারা উহা প্রতিষ্ঠা করাও, তাহা হইলেই আমার সাক্ষাৎ লাভ হইবে। তোমার অনুচরেরা বৃথা শবর বন্ধুকে নির্য্যাতন করিতেছে, সে নির্দ্দোষী।" রাজা অকস্মাৎ এইরূপ দৈববাণী শ্রবণ করিয়া শবরের প্রতি অত্যাচার করিতে নিষেধ আজ্ঞা প্রচার করিলেন।

মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন এবার মন্দির নির্ম্মাণার্থে বিশ্বকর্ম্মাকে স্মরণ করিলেন এবং তাঁহার দ্বারা মন্দির-কার্য্য সম্পন্ন করাইয়া, উহা প্রতিষ্ঠা করিবার অভিলাষে ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার নিকট যাত্রা করিলেন। এইরূপে বহুদিন অতিবাহিত করিয়া তিনি যথাসময়ে ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং ভগবান নীলমাধবজীউর আদেশ জ্ঞাপন করিলে—তিনি সন্তুষ্ট-

চিত্তে মন্দিরস্থানে উপস্থিত হইবামাত্র উভয়েই দেখিলেন যে—গলমাধব নামক অপর এক পরাক্রমশালী রাজা কর্ত্তৃক মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নের সেই রাজ্য অধিকৃত হইয়াছে। এক্ষণে গলমাধব ও ইন্দ্রদ্যুম্ন এই উভয় রাজার মধ্যে মহাবাক্‌বিতণ্ডা উপস্থিত হইল। মন্দিরের সত্ব সাব্যস্ত না হইলে—ব্রহ্মা কিরূপে উহা প্রতিষ্ঠা করিবেন, এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় বিষ্ণুমায়ায় ভুষণ্ডীকাক তথায় আসিয়া রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের পক্ষে ব্রহ্মার নিকট সাক্ষ্যপ্রদান করিল এবং মন্দির নির্ম্মাণ-কালে যে সকল কারিকর ও কূর্ম্মপৃষ্ঠে প্রস্তর বহন করিয়া সেই মন্দির-নির্ম্মাণ-কার্য্যে সহায়তা করিয়াছিল তাহারা, আরও স্বয়ং বিশ্বকর্ম্মা—যিনি মন্দিরটী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন এই সকল লোক একত্রে তথায় অকপট-চিত্তে মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নের অনুকূলে ব্রহ্মার নিকট সাক্ষ্যপ্রদান করিলেন। তৎশ্রবণে চতুরানন গলমাধবকে তাঁহার রাজ্য-সংক্রান্ত প্রমাণ দেখাইতে আদেশ করিলেন। রাজা গলমাধব ব্রহ্মার আদেশে কোন কিছু প্রমাণ দেখাইতে না পারাতে—তিনি কুপিত হইয়া গলমাধবকে রাজ্যচ্যুত করিলেন এবং যথানিয়মে মন্দির প্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক ব্রহ্মলোকে প্রস্থান করিলেন।

এইরূপে মন্দির প্রতিষ্ঠা হইলে—রাত্রিকালে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন স্বপ্নে দেখিলেন, স্বয়ং নীলমাধবজীউ যেন জগন্নাথমূর্ত্তিতে তাঁহার শিয়রে দণ্ডায়মান হইয়া বলিতেছেন, "ভক্তরে! তুমি কি পূর্ব্ব আকাশবাণী বিস্মৃত হইয়াছ যে, মন্দির প্রতিষ্ঠা হইলে আমার দর্শন পাইবে? তোমার অচলা ভক্তিতে আমি বাঁধা পড়িয়াছি। কল্য প্রত্যুষে সমুদ্র-তীরে গমন করিবামাত্র আমার দারুমূর্ত্তি স্বরূপ এক খণ্ড কাষ্ঠের দর্শন পাইবে, ঐ দারু হইতে আমার স্বরূপ মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়া মন্দির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিবে।"

মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন স্বপ্নানুসারে পর দিবস যথাসময়ে সদলে সমুদ্রতীরে আসিয়া দেখিলেন—একখণ্ড কাষ্ঠ অনন্ত সলিল-বক্ষে ভাসমান রহিয়াছে; তদ্দর্শনে তিনি আহ্লাদের সহিত ঐ কাষ্ঠখানি তীরে উঠাইবার চেষ্টা করিলেন কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য না হইয়া হতাশ প্রাণে ঐ অনন্ত সমুদ্রে স্বীয় জীবন উৎসর্গ করিতে স্থিরীকৃত হইলেন। এই সময় পুনরায় আর একটী আকাশবাণী হইল। "রাজন্! তুমি বৃথা দুঃখ করিতেছ; শবর বসু ব্যতীত অন্য কেহ আমায় তীরে উঠাইতে পারিবে না।" মহারাজ সেই দৈববাণী অনুসারে তখন যত্নের সহিত শবর বসুকে তথায় আনয়ন করাইয়া তাঁহারই সাহায্যে দারুকাষ্ঠখানি মন্দির-সম্মুখে স্থাপিত করাইলেন।

মহারাজ ইন্দ্র্যদ্যুম্ন এবার ঐ দারুকাষ্ঠ হইতে দেবমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইবার অভিলাষে নানা স্থান হইতে সুদক্ষ সূত্রধরদিগকে আনাইলেন, কিন্তু ভগবানের মায়াপ্রভাবে বহু চেষ্টা করিয়াও কেহ ঐ কাষ্ঠের গাত্রে একটী দাগ পর্য্যন্ত বসাইতে সক্ষম হইল না; তদ্দর্শনে মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন বিষণ্ণ-মনে সেই জগৎচিন্তামণির শ্রীচরণ ধ্যান করিতে লাগিলেন এবং কিরূপে এই দারুকাষ্ঠ হইতে শ্রীমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইবেন এই চিন্তাতেই মগ্ন, ইত্যবসরে এক প্রাচীন সূত্রধর (স্বয়ং জগন্নাথ) ছদ্মবেশে রাজস্থানে উপস্থিত হইয়া ঐ দারু হইতে শ্রীমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিবার ভার প্রার্থনা করিলেন। মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন সেই বৃদ্ধকে সম্মুখে দেখিয়া,—তাহার দ্বারা কার্য্য উদ্ধার হইবে না অনুমান করিয়া, মনে মনে নানাপ্রকার চিন্তা করিতে লাগিলেন। ছদ্মবেশী বৃদ্ধ—রাজাকে চিন্তান্বিত অবলোকন এবং মনের ভাব অবগত হইয়া, তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মহারাজ! আপনি বৃথা চিন্তা করিবেন না, শুনিলাম আপনার নিযুক্ত কোন কারীকরই দেবমূর্ত্তি নির্ম্মাণ

করিতে পারে নাই। আমার বিশ্বাস—চেষ্টা করিলে সকল কার্য্যই সিদ্ধ হয়, আর এক কথা—শাণিত লৌহযন্ত্রের দ্বারা যে—কাষ্ঠ ভেদ হয় না, এতাবৎকাল ইহা আমি কখন শ্রবণ করি নাই, সুতরাং আমার সেই চিরগত বিশ্বাস পরীক্ষা করিতে আসিয়াছি। বৃদ্ধের সেই উত্তেজিত বাক্যে রাজা প্রীতমনে, তাহাকেই দেবমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতে অনুমতি দান করিলেন। বৃদ্ধ এক্ষণে রাজস্থানে অনুরোধ করিলেন, "মহারাজ! আমি যে কার্য্যের ভার লইলাম, ইহাতে অভাবপক্ষে একুশ দিন সময় আবশ্যক হইবে, এই নিদ্ধারিত সময়ের মধ্যে আমি নিশ্চয়ই কার্য্যোদ্ধার করিব, কিন্তু আমার সবিনয় নিবেদন এই যে—এই নিরূপিত সময়ের মধ্যে কেহই মন্দির-দ্বার উদ্‌ঘাটন করিতে পারিবেন না, যদ্যপি ইহার কোনরূপ ব্যতিক্রম ঘটে, তাহা হইলে আমি আর অস্ত্র স্পর্শ করিব না। মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন নিরুপায় হইয়া বৃদ্ধের সেই সমস্ত প্রস্তাবেই সম্মত হইলেন।

একদিকে বৃদ্ধ কাষ্ঠ লইয়া মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিলেন, অপরদিকে রাজাও বহির্ভাগ হইতে মন্দির-দ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন। এইরূপে কিছুদিন অতীত হইবার পর এই নির্দ্ধারিত সময় মধ্যেই ভগবান আপন লীলাপ্রকাশচ্ছলে রাজার মনে সন্দেহ উপস্থিত করিলেন, ইহার ফলে বৃদ্ধ কোনরূপ কার্য্য করিতেছে কিনা, উহা জানিবার নিমিত্ত তিনি ব্যস্ত হইয়া মন্দির-দ্বারে আপন কর্ণ সংলগ্ন করিলে—কোনরূপ শব্দ শুনিতে পাইলেন না, সুতরাং রাজা বাধ্য হইয়া মন্দির-দ্বার উদ্‌ঘাটন করিবামাত্র—হস্তপদ ও কর্ণ বিহীন জগন্নাথমূর্ত্তি রত্নবেদীর উপর বিরাজ করিতেছেন দর্শনে—আনন্দে অধীর হইলেন এবং সেই অসম্পূর্ণ মূর্ত্তিকেই ভক্তি-সহকারে প্রতিষ্ঠা করিয়া আপন বাসনা পূর্ণ করিলেন। দারুব্রহ্ম

জগন্নাথ মূর্ত্তি মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন কর্ত্তৃক এইরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

পুরীধামের যাবতীয় তীর্থ এবং দেবতাদিগের একে একে যথানিয়মে সেবা করিয়া পঞ্চম দিবসে পাণ্ডার উপদেশ মত আট্‌কে বাঁধিবার জন্য পূর্ব্ব-কথিত বৈকুণ্ঠপুরীতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

আট্‌কে বন্ধন।

পুরীধামে আট্‌কে বাঁধিতে হইলে, পাণ্ডার নিকট টাকা না দিয়া যথারীতি লেখাপড়া করা কর্ত্তব্য। এইরূপ লেখাপড়া না করিলে, ভোগের জন্য দেয় অর্থের পরিবর্ত্তে পাণ্ডাঠাকুরের কেবল পেটপূজা হইয়া থাকে। সর্ব্বপ্রথমে দাতা, পাণ্ডা, সাক্ষী ও পঞ্চায়েৎ উপস্থিত হন, তৎপরে এই বৈকুণ্ঠপুরীর উপর বসিয়া যথানিয়মে তালপত্রে আট্‌কে বন্ধনের লেখাপড়া করিতে হয়। এই লেখাপড়ার ফলে—যিনি যত টাকা দান করিবেন, সেই টাকার সুদ হইতে ভগবানের নিত্য ভোগ প্রদত্ত হইয়া থাকে। টাকার পরিমাণে—ভোগের তারতম্য দৃষ্ট হয়। বলাবাহুল্য লেখাপড়ার মধ্যে আট্‌কে বন্ধন করিলে অভাবপক্ষে ১৩২৲ টাকার কম ইহা সম্পন্ন হয় না, অর্থাৎ যাত্রী ১৩২৲ টাকা দান করিলে—প্রতিদিন যথানিয়মে ভগবানের ডাল, ভাত ও তৈল পক্কের ভোগ সম্পন্ন হইয়া থাকে। এইরূপ আবার ৩৬০৲ টাকা দান করিতে পারিলে সহজ খেচরান্ন ভোগ হইয়া থাকে। স্থানীয় নিয়মানুসারে ৪৩৪৲ টাকা দান করিতে পারিলে—বাদাম পেস্তার খেচরান্ন ভোগ হইয়া থাকে। কোন ভক্ত ৫৫০৲ টাকায় আট্‌কিয়া বন্ধন করিলে—সেই টাকায় প্রত্যহ ভগবানের লুচি পুরী ও ক্ষীর ভোগ হইয়া থাকে। যাত্রী ৭৫০৲ টাকা দান করিলে—উক্ত টাকা হইতে প্রত্যহ মালপোয়া ভোগ হয়

কিন্তু ৫৬০০৲ টাকা দান করিতে পারিলে—প্রত্যহ ভগবানের ৫৬ প্রকার খাদ্যের সহিত ভোগ হইয়া থাকে। এই ৫৬০০ শত টাকার অধিক এখানে আটকে বাঁধিবার নিয়ম নাই। ২০৲ টাকা ২৫৲ টাকা বা ৫০৲ টাকায় যে আট্‌কে বাঁধা হয়, তাহার মূল্য কিছুই নাই। অজ্ঞ যাত্রীদিগের নিকট হইতে দেবতার নাম করিয়া—পাণ্ডারা উহা কেবল ঠকাইয়া লন্ মাত্র। এ কার্য্য বেশীর ভাগ স্ত্রীলোকদিগের দ্বারাই সম্পন্ন হয়, কেননা তাহারা জানেন না যে, এই আট্‌কের টাকা প্রকৃত স্থানে পৌঁছিবে না। বৈকুণ্ঠধামে পঞ্চায়েৎ ও সাক্ষীগণের সম্মুখে তালপত্রে যখন আট্‌কে বন্ধনের টাকা লিখিত হয়, তখন দাতার ৪ চারি পুরুষের নামধাম লিখিত হইয়া থাকে। স্ত্রীলোক হইলে—তাঁহার স্বামী শ্বশুর ও নিজের নাম লেখাপড়া হয়। পুরুষ হইলে তাহার পিতা, পিতামহ প্রভৃতির নাম উল্লেখ থাকে।

যাহাদের নিকট উক্ত আট্‌কের টাকা জমা থাকে, তাহাদের শত-করা ১৪৲ টাকা ও লেখাই ১৲ স্বতন্ত্র দিতে হয়। পাণ্ডা প্রতিদিন ঐ টাকার সুদ হইতে জগন্নাথদেবকে ভোগ প্রদান করিয়া তাহা নিজে লইয়া থাকেন বা বাজারে বিক্রয় করিতেও পারেন। ইহাই তাঁহার লভ্য। উপরোক্ত টাকার আট্‌কে বন্ধন ভিন্ন অল্প টাকার আট্‌কে বন্ধন সমস্তই প্রতারণাপূর্ণ বলিয়া জানিবেন। যাত্রীদিগের মধ্যে যদি কেহ এই আট্‌কিয়ার সমস্ত টাকা সেই সময় দিতে না পারেন, তাহা হইলে পাণ্ডারা উহা ধারের টাকা বলিয়া অবসর মত তাঁহার আলয়ে আসিয়া কাবুলীদিগের কিস্তির টাকার ন্যায় তাগাদা করিতে কুণ্ঠিত হন না।

আমরা সদলে শুভলগ্নে শুভদিনে বৈকুণ্ঠপুরীতে সাধ্যমত আট্‌কে বাঁধিয়া, সর্ব্বশেষে স্বীয় পাণ্ডার নিকট সুফল গ্রহণপূর্ব্বক অন্যত্র গমনের জন্য প্রস্তুত হইলাম।

পদ্মক্ষেত্র।

উড়িষ্যার অন্তঃর্গত পুরী হইতে ১৯ মাইল উত্তরে চন্দ্রভাগা নদী তীরে এই পুণ্য তীর্থটী অবস্থিত। কথিত আছে দ্বাপরযুগে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার ষোড়শ শত বনিতাদিগের সহিত সতত প্রফুল্লচিত্তে এই পুণ্যসলিলা নদীতে জলক্রিয়া করিতেন, ইহা হইতেই ইহার মাহাত্ম্য প্রকাশ পাইতেছে।

শ্রীপঞ্চমীপূজার পর মাকরীসপ্তমীর নির্দ্দিষ্ট তিথিতে প্রতি বৎসর এই স্থানে একটী বিখ্যাত মেলা হয়; সেই মেলার সময় নানা জাতীয় অসংখ্য হিন্দু নরনারীর একত্র সম্মিলনে এই ক্ষেত্র এক অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করে। বলাবাহুল্য এই অস্থায়ী মেলায় শান্তিরক্ষা করিবার নিমিত্ত পুলিশপ্রহরী ও উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীগণ, এমন কি স্বয়ং ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয় পর্য্যন্ত তাম্বুমধ্যে দোষীদিগের দণ্ড বিধান করিবার নিমিত্ত অবস্থান করিয়া থাকেন।

যে সকল যাত্রী কলিকাতা হইতে রেলযোগে এ তীর্থে যাত্রা করেন, তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই প্রথমে শ্রীক্ষেত্রে ভগবান জগন্নাথ-দেবের পূজার্চ্চনা শেষ করিয়া তৎপরে শ্রীপঞ্চমীর মধ্যাহ্নকালে আহারাদি সম্পন্ন পূর্ব্বক অবসর মত সুস্থ শরীরে পুরী হইতে গো-শকটের সাহায্যে

মেলা স্থানে শুভযাত্রা করিয়া থাকেন। এই নির্দ্দিষ্ট দিনের অপরাহ্ন কালে চতুর্দ্দিক হইতে অসংখ্য ভক্তগণ এবং গো-শকটগুলির একই পথে অগ্রসর হইবার কোলাহল শব্দের ফলে পুরীর রাস্তা যেন প্রতি-ধ্বনিত হইতে থাকে। এইরূপে পুরী হইতে চন্দ্রভাগা নামক তীর্থ স্থানের প্রশস্ত রাস্তা অতিক্রম পূর্ব্বক যাত্রীগণ পরদিন ষষ্ঠী তিথির সন্ধ্যাকালে নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইয়া থাকেন।

যে সাগরতীর—এখানকার মেলাস্থান বলিয়া খ্যাত, সেই স্থানটী সাধারণ তীরভূমি অপেক্ষা অধিক উচ্চে অবস্থিত। পুরী হইতে চন্দ্র-ভাগার এই প্রশস্ত পথ অতিক্রম করিবার কালে, দিনমানে গাড়ী বা মনুষ্যগণের গতিবিধি থাকে না, ইহার প্রধান কারণ এই যে—এই পথটী প্রায় সমস্তই বালুকাময়; সূর্য্যকিরণে সেই বালুকা-কণাগুলি এত উত্তপ্ত হয় যে, কিছুতেই কোন জীব তাহার উপর দিয়া অগ্রসর হইতে সক্ষম হইতে পারে না; সুতরাং বাধ্য হইয়া রাত্রিকালে কেবল ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় এই দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া থাকে, আর এক কথা, এই নির্দ্দিষ্ট সময় ব্যতীত অন্য সময় দস্যু তস্করাদির ভয়ে কেহ কখন এ পথে অগ্রসর হইতেও সাহস করেন না।

যাত্রীগণ পুণ্য উপার্জ্জন কারণ এত কষ্ট স্বীকার করিয়াও সেই চন্দ্র-ভাগা নদীতীরে উপস্থিত হন এবং মনের আনন্দে যথায় পাঁচী-নদী বঙ্গোপসাগরের সহিত মিলিতা হইয়াছে, সেই সঙ্গম স্থানের অনতিদূরে এক অদ্ভুত কারুকার্য্য বিশিষ্ট সূর্য্যদেবের সুন্দর মন্দিরের শোভা দর্শন করিয়া সকল কষ্টের অবসান করিয়া থাকেন। মন্দিরটী শ্রীকৃষ্ণাত্মজ মহাত্মা শাম্বদেব কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়া কনারক নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। এই প্রাচীন অপূর্ব্ব শিল্পনৈপুণ্যশালী ভানুদেবের শ্রীমন্দিরটী বহুকালা-বধি সংস্কার অভাবে ভগ্নস্তূপ—পর্ব্বতাকারে জঙ্গলাবৃত হইয়া অতীতের

অতুলনীয় গৌরবের প্রশংসা করিতেছিল। সম্প্রতি মাননীয় বড়লাট কর্জ্জন বাহাদুরের অনুকম্পায় তাঁহারই আদেশে সরকার হইতে চারি লক্ষ টাকা ব্যয় মঞ্জুর হইয়া সূর্য্যদেবের এই ভারত বিখ্যাত শ্রীমন্দির—যাহা চারি প্রকোষ্ঠে সজ্জীকৃত অর্থাৎ শ্রীমন্দিরের সংলগ্ন জগমোহন, নাট মন্দির ও ভোগ মন্দির বর্ত্তমান, সাধারণকে তাহার প্রাচীন শোভা দর্শন করাইবার জন্য উপযুক্ত কণ্ট্রাক্টর শ্রীযুক্ত বাবু বিরেশ্বর ঘোষ মহাশয়কে সংস্কারের ভারার্পণ করিয়া ইহার পূর্ব্ব শ্রী ধারণ করাইয়াছেন। ইহাতে হিন্দুমাত্রেরই তিনি শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছেন সন্দেহ নাই। কনারকে এই সূর্য্যদেবের শ্রীমন্দির ব্যতীত মায়াদেবীর মন্দিরটীর সৌন্দর্য্যও দর্শনযোগ্য।

কনারক যদিও উষ্ণপ্রধান দেশে অবস্থিত, কিন্তু এ স্থানটীতে আদৌ উষ্ণভাব অনুভব হয় না। স্থানীয় অধিবাসীদিগের নিকট উপদেশ পাইলাম এখানে বার মাসই বসন্তঋতু বিরাজিত—সদাসর্ব্বদাই সমুদ্রের শীতল বায়ু হু-হু শব্দে বহিয়া থাকে। বলাবাহুল্য আমরা এখানে এই অল্প সময়ের জন্য অবস্থান কালে গরম—আদৌ অনুভব করি নাই। পুরীতে যেমন ধনী লোকেরা সমুদ্রতীরে বাড়ী নির্ম্মাণ করাইয়া, উহাতে অবস্থান পূর্ব্বক গ্রীষ্মের করালগ্রাস হইতে পরিত্রাণ পাইয়া থাকেন, আমার বিবেচনায় এই কনারকও ঠিক সেইরূপ শান্তি-প্রদ স্থান।

এবার পুনর্ব্বার যখন ১৯১৩ খৃঃ এই কনারকে সূর্য্যদেবের নবকলেবর শ্রীমন্দির শোভা দর্শন করিতে গিয়াছিলাম, তখন স্থানীয় পূজারী-দিগের নিকট উপদেশ পাইলাম—গত মে মাসে যে সময় ভগবান ভানু দেবের শ্রীমন্দিরটীর এখানে সংস্কার হইতেছিল, সেই সময় অমেরিকা হইতে ৫টী ইংরাজ ভদ্রলোক তৎসঙ্গে একজন ইংরাজ মহিলা এখানে

মন্দিরের কারুকার্য্য দেখিবার জন্য আসিয়াছিলেন; পরিচয়ে অবগত হইয়াছিলাম তাঁহারা এসিয়াটিক রিসার্চ্চ সোসাইটির প্রফেসর ও মেম্বর। তাঁহাদের কাজ—ভারতবর্ষের কোন্ স্থানে কিরূপ হিন্দুদিগের বিখ্যাত মন্দির আছে, উহা ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখা এবং সাধ্যমত তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়া তাহা লিপিবদ্ধ করা। সেই মহাত্মারা এখানে স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিয়াছেন, "কনারকের শ্রীমন্দিরে যেরূপ কারুকার্য্য এবং শিল্পনৈপুণ্য নয়নগোচর হইল, এমন কি—চিন, জাপান, ব্রহ্মদেশ, আমেরিকা ও ইংলণ্ডের মধ্যে কোথাও এরূপ সৌন্দর্য্যশালী মন্দির আমরা দেখিতে পাই নাই। ইহাতেই এই মন্দির শোভা কিরূপ কারুকার্য্য-বিশিষ্ট পাঠকবর্গ তাহা অনুমান করুন।

কনারকের এই জগদ্বিখ্যাত মন্দিরের প্রথমেই—দেউল, দ্বিতীয়—জগমোহন, তৃতীয়—নাটমন্দির, চতুর্থ—ভোগমন্দির। মন্দিরের প্রাচীর গাত্রে এক্ষণে যে সমস্ত প্রস্তর খোদিত মনুষ্য, পক্ষী, ফল, ফুল ও লতা অঙ্কিত আছে, সে সমস্তগুলির স্থাপত্য কৌশল নয়নগোচর হইলে—শিল্পকারীর শিল্পনৈপুণ্যের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। পুরাকালে আর্য্যনৃপতিগণ আধুনিক বিজ্ঞান বল ব্যতীত কিরূপে বিনা বাষ্পীয় কলের সাহায্যে দূরবর্ত্তী গিরিপ্রদেশ হইতে অতিভার শিলা-খণ্ডগুলি সংগ্রহপূর্ব্বক, কারুকার্য্যে শোভিত করাইয়া, সেতুহীন নদ-নদী সকল অতিক্রম পূর্ব্বক দেবমন্দির বা অত্যুচ্চ অট্টালিকা সকল সুশোভিত করাইতেন, উহা একবার চিন্তা করিলে আত্মহারা হইতে হয়।

ভানুদেবের এই বিখ্যাত দেবালয়ে প্রবেশদ্বারের সম্মুখেই একটী প্রকাণ্ড কৃষ্ণপ্রস্তর নির্ম্মিত উচ্চ স্তম্ভ দেখিতে পাওয়া যায়, এতদ্ভিন্ন ঐ স্থানেই আর একটী অদ্ভুত ও প্রশস্ত প্রস্তর নির্ম্মিত খিলান দেদীপ্যমান; সেই খিলানের উপর এক প্রস্তরের বৃহৎ পাড় আছে,—ঐ

পাড়গাত্রে নানা সম্প্রদায়ের উপাসক, সূর্য্যদেবের পবিত্র মূর্ত্তি ব্যতীত আরও কতকগুলি আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য অদ্ভুত জীবজন্তুর প্রতিমূর্ত্তি খোদিত আছে দেখিতে পাওয়া যায়।

শাম্বপুরাণপাঠে উপদেশ পাওয়া যায় শাম্বদেবের বংশধর—মহাত্মা নৃসিংহদেব পুরাকালে যখন এই প্রাচীন মন্দিরটী সংস্কার করেন, তখন তিনি স্বেচ্ছায় তাঁহার বিশাল রাজত্বের দ্বাদশ বৎসরের সমস্ত আয় ইহাতে ব্যয় করিয়া মন্দিরটী মনের মত সুসজ্জিত করিয়াছিলেন, অধিকন্তু এই মন্দিরের শিখরদেশে চূড়ার উপর একখণ্ড বহুমূল্য বৃহৎ চুম্বক প্রস্তর সংলগ্ন করাইয়া তাহার সৌন্দর্য্য আরও বর্দ্ধিত করেন, কিন্তু সেই প্রস্তর খণ্ডের আকর্ষণ শক্তিতে সমুদ্রগামী জাহাজ সকল সমাকৃষ্ট হইয়া, তীরে আসিবার সময় স্থানীয় চড়ায় ঠেকিবামাত্র ক্ষতিগ্রস্ত হইত, এইজন্য কোন নাবিক ভয়ে এই স্থানের জলপথ দিয়া অগ্রসর হইতে সাহস করিতেন না।

একদা মোগল সম্রাট আকবর শাহের বিখ্যাত মন্ত্রী—মহাবীর আবুল-ফাজিল, হিন্দুদিগের উপাস্য এই সূর্য্যমন্দিরের সম্মুখ ভাগে জলপথ দিয়া পর্য্যটন করিবার সময় স্থানীয় চুম্বক পাথরের আকর্ষণ শক্তির কারণ, অত্যন্ত বিপদগ্রস্ত হন। বহু সন্ধানের ফলে মন্ত্রীবর এই পাথরখানিকেই অনিষ্টের মূল বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন এবং আপন প্রভাব দেখাইবার জন্য অধীনস্থ একজন মুসলমান নাবিককে ঐ সুবৃহৎ চুম্বক খণ্ডখানি শ্রীমন্দিরের শিখরদেশ হইতে বিচ্যুত করিতে আদেশ দান করেন, তৎপরে সর্ব্বসমক্ষে উহা স্বরাজ্যে লইয়া যান। বলাবাহুল্য মন্ত্রীবরের এই গর্হিত ব্যবহারে মন্দিরের পাণ্ডাগণ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইলেন, কারণ তাঁহাদের বিশ্বাস—যবনস্পর্শে ইহা অপবিত্র হইল।

পাণ্ডারা যুক্তি করিয়া মন্দিরটীর পুনর্ব্বার সংস্কারের নিমিত্ত

প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াও যখন ভাগ্যক্রমে কোন ফলোদয় হইল না দেখিলেন, সেই সময় সকলে পরামর্শ করিয়া মর্ম্মাহত হৃদয়ে দেবালয়টী পরিত্যাগ করাই স্থির করিলেন। ইহার ফলে—সেই প্রাচীন মন্দিরটীতে লোকসমাগমাভাবে শোচনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইল ;—কালক্রমে বিগ্রহ মূর্ত্তিটীও অদৃশ্য হইল। বর্ত্তমানকালে অনেকে এ তীর্থের নাম পর্য্যন্ত অবগত নহেন, কেননা সূর্য্যদেবের এই সুন্দর মন্দিরটি পুরী সহরের বহুদূরে এবং দুর্গমস্থানে অবস্থিত।

মহাত্মা কর্জ্জন বাহাদুরের অনুগ্রহে পুরী হইতে কনারক পর্য্যন্ত রেলপথ বিস্তার হওয়াতে, এক্ষণে সাধারণে ইহার শোভা সৌন্দর্য্য অক্লেশেই দেখিতে পাইবেন, সন্দেহ নাই।

ইতি পূর্ব্বে ১৩০৭ সালে আমরা যখন এই স্থানে আসিয়াছিলাম, তখন এই সূর্য্যমন্দিরের শিখরদেশে অবাধে আরোহণ করিয়া এক দিকে পুরীধামের জগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরের ক্ষীণছায়া দর্শন করিয়াছিলাম, এবং অপরদিকে বঙ্গোপসাগরের প্রসারিত নীলাম্বুজ সলিলের তরঙ্গ-রাশি অনন্ত অম্বর-ক্রোড়ে খেলা করিতেছে দেখিয়া কত আনন্দ অনুভব করিয়াছিলাম, কিন্তু দ্বিতীয় বারে এই অদ্ভুত মন্দিরশোভা দর্শন করিয়া প্রফুল্ল মনে আপনাপন অর্থব্যয় ও যাবতীয় কষ্টের অবসান করিলাম।

কনারকের এই শ্রীমন্দিরের অনতিদূরে একখানি প্রকাণ্ড প্রস্তরোপরি নবগ্রহগণের নয়টী খোদিত প্রতিমূর্ত্তি—দর্শকবৃন্দের চিত্ত আকর্ষণ করিয়া থাকে। এই নবগ্রহমূর্ত্তির মধ্যে রাহু ও কেতুর ভয়ঙ্কর প্রতিকৃতি দর্শন করিলে মনে হয় যে, যে গ্রহদ্বয়ের এরূপ অদ্ভুত আকৃতি—না জানি তাঁহাদের ফলভোগের সময় মনুষ্যদিগকে কিরূপ ব্যতিব্যস্ত হইতে হয়, কারণ মনুষ্য মাত্রেই এই নবগ্রহগণ কর্ত্তৃক

পরিচালিত হইয়া থাকেন। এই নবমূর্ত্তি খোদিত প্রস্তরখণ্ডখানি দৈর্ঘ্যে ১২ হস্ত ও প্রস্থে অন্যূন ৬ হস্ত পরিমাণ দেখিতে পাওয়া যায়। সন ১৩০৭ সালে যখন আমরা এখানে আসিয়াছিলাম,সেই সময় এখানি এখানকার শ্রীমন্দিরের উপরিভাগ হইতে নিম্নে প্রশস্ত ভূমে—বিচ্যুত অবস্থায় ছিল; তখন ইহার সম্বন্ধে অবগত হইয়াছিলাম, একদা কতকগুলি পুরাতত্ত্ববিৎ ইংরাজ পুরুষ, এই প্রশস্ত শিলাখণ্ডখানির অদ্ভুত কারুকার্য্য দর্শনে মুগ্ধ হইয়া বহু অর্থ ব্যয়সহকারে, অতি কষ্টে বাষ্পীয় কলের সাহায্যে নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে ইহাকে বিচ্যুত করাইয়া এখানি কলিকাতার যাদুঘরে রাখিবার মনস্থ করেন, কিন্তু তৎকালে নানা স্থানের হিন্দুগণ একত্র হইয়া ইহাতে আপত্তি উত্থাপন করিলে—তাঁহারা ক্ষুব্ধমনে সেই অবস্থাতেই উহার মায়া পরিত্যাগ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করেন। বর্ত্তমান কালে মন্দির সংস্কার সময়, ইহা আবার স্বস্থানে স্থাপিত হইয়া বড়লাট কর্জ্জন বাহাদুরের মহিমা প্রকাশ করিতেছে।

চন্দ্রভাগা বা পদ্মক্ষেত্র—পুণ্যস্থান অবগত হইয়াও যে স্থানে কখন জনমানবের সমাগম হইত না, আজ শাম্বদেবের কৃপায় সেইস্থানে মেলা উপলক্ষে শত সহস্র যাত্রী একত্রিত হইয়া শ্রীহরির উদ্দেশ্যে সংকীর্ত্তনে মত্ত হইয়া নির্ব্বিঘ্নে মনের আনন্দ প্রকাশ করিয়া থাকেন। এইরূপে ষষ্ঠীর সমস্ত রাত্রি একভাবে অতীত হইলে, পরদিবস মাকরী সপ্তমীর প্রত্যূষে ভক্তগণ—ভানুদেবের প্রথম উদয়ে তাঁহার পূর্ণকলেবর দর্শন করিয়া আপনাপন মহাব্রত উদ্‌যাপন করিয়া থাকেন। আহা! এই মহান্ দৃশ্য যিনি একবার দর্শন করিয়াছেন, ইহজন্মে তিনি কখন উহা ভুলিতে পারিবেন না।

প্রভাতে সাগরতীরে বিচরণ করিবার সময় স্থানীয় নির্ম্মল বায়ু সেবন

করিবার সময় চতুর্দ্দিক হইতে হরিধ্বনি হওয়ায় প্রাণ যেন আনন্দে পরিপূর্ণ হইল; ক্রমে গগনপ্রাঙ্গণ লোহিত রঙ্গে রঞ্জিত হইয়া তপন-দেবের আগমনবার্ত্তা ঘোষণা করিবার সময়, তন্মধ্য দিয়া যেন জ্যোতির্ম্ময় রাঙ্গারশ্মি অল্প অল্প করিয়া উঁকি মারিতে লাগিল, ইত্যবসরে ভগবান তপনদেবের সুবর্ণ বর্ণের গোলাকার দেহখানি প্রথমে নীল সলিলোপরি সামান্য দেখা দিল; তৎপরে তিনি যেন লম্ফঝম্ফ সহকারে নৃত্য করিতে করিতে একেবারে বিমানপথে নীলাম্বু পরিত্যাগ করিয়া নর-লোকের মনস্কাম সিদ্ধ করিবার মানসে উর্দ্ধদিকে উঠিয়া স্থির ভাবে অবস্থান করিতে থাকেন, কি মনোহর দৃশ্য!! সেই বালসূর্য্যের কিরণচ্ছটায় পূর্ব্বদিকের লালবর্ণ নভোমণ্ডল ক্রমে উজ্জ্বলতর হইতে প্রখরতর হইতে থাকে, তৎসঙ্গে সেই সুবর্ণ গোলকের প্রতিবিম্ব সাগর সলিলোপরি তরঙ্গে তরঙ্গে বিচ্ছিন্ন হইয়া নীলবর্ণের সহিত লালবর্ণ মিশিলে যে আকার ধারণ করে, নীলাকাশে ঠিক সেই বর্ণ উদিত হইয়া যেন—কাদম্বিনী-বক্ষে সৌদামিনী ক্রীড়া করিতেছেন, এই ভাবে দর্শন দিয়া ভক্তবৃন্দকে চমৎকৃত করেন।

ভানুদেবের এই প্রীতিপদ স্বর্গীয় সুষমা নিরীক্ষণ করিয়া যাত্রীগণ চন্দ্রভাগা নদীর সঙ্গম স্থানে যথানিয়মে স্নান তর্পণ ও সূর্য্যদেবের উদ্দেশে অর্ঘ্য প্রদান এবং সাধ্যানুসারে দানকার্য্য সমাপ্ত করিয়া শেষে এই পবিত্র ক্ষেত্রসীমাটী প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক স্বস্থানে যাত্রা করিয়া থাকেন। কথিত আছে এ তীর্থে শ্রদ্ধাসহকারে নির্দ্দিষ্ট সময়ে স্নান করিলে "ভক্তি ও মুক্তি" উভয় ফলই প্রাপ্ত হওয়া যায়; আবার সূর্য্যদেবের প্রীত্যর্থে এখানে একটী অর্ঘ্য প্রদান করিলে, তাঁহার কৃপায় ভক্তের সকল বাসনা পূর্ণ হয়। শাম্বপুরাণ পাঠে এইরূপই উপদেশ পাওয়া যায়।

সূর্য্যদেব মন্দিরের কিম্বদন্তী।

শ্রীকৃষ্ণপত্নী জাম্ববতী দেবীর গর্ভে শাম্ব নামে এক কন্দর্প সদৃশ রূপবান পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। রূপগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া তিনি সতত অহঙ্কার করিতেন, এমন কি এই রূপের নিমিত্তই তিনি সকলকে অভক্তি করিতেন। একদা নারদঋষি হরিপ্রেমে মত্ত হইয়া হরিগুণ-গান করিতে করিতে যখন এই শাম্বদেবের নিকট দিয়া গমন করিতে-ছিলেন, ঋষিবরের সেই জটাজুটধারী বিকট আকৃতি দেখিয়া তিনি তাঁহাকে ব্যঙ্গ করিলেন, শাম্বদেবের ব্যবহারে, অসন্তুষ্ট হইয়া নারদ তাঁহাকে শাস্তি দিবার মানসে শ্রীকৃষ্ণের নিকট গমন করতঃ নানা কথাচ্ছলে নিবেদন করিলেন, "প্রভো! অদ্য আপনার পত্নীদিগের সহিত আপনার প্রিয়পুত্র শাম্বের যেরূপ ঘনিষ্টতা দর্শন করিলাম, তাহাতে সহজেই কু-ভাব উদয় হয়।" অন্তর্য্যামী ভগবান নারদঋষির অপমান অন্তরে অবগত হইয়া দুঃখিত মনে মৌনাবলম্বন করিলেন। কারণ যে হরি কখন কাহারও দর্প রাখেন না বলিয়া দর্পহারী নাম গ্রহণ করিয়াছেন, তখন কি তিনি শাম্বের দর্প চূর্ণ না করিয়া স্থির থাকিতে পারেন?

কিয়ৎকাল পরে একদা শ্রীকৃষ্ণ যখন পত্নীগণসহ রৈবতক পর্ব্বতে মৃগয়ার্থ গমন করিয়া এই পর্ব্বতের সন্নিকটস্থ চন্দ্রভাগা নামক নদীতে মনের সুখে উন্মত্তভাবে সেই পত্নীগণের সহিত জলবিহার করিতেছিলেন, নারদঋষি পূর্ব্ব অপমানের প্রতিশোধ লইবার উপযুক্ত অবসর পাইয়া, শাম্বের নিকট গমন পূর্ব্বক বলিলেন, "বৎস! তোমার পিতা রৈবতক পর্ব্বতে মৈত্রবনে মৃগয়া করিতে গিয়াছেন, আমার দ্বারা তোমায় তথায় যাইতে অনুরোধ করিয়াছেন।" সরলহৃদয় শাম্বদেব নারদের চাতুরী

অবগত না হইয়া পিতার আদেশ শিরোধার্য্য পূর্ব্বক সেখানে উপস্থিত হইবামাত্র লজ্জিত হইলেন, কারণ তিনি দেখিলেন, এই নির্দ্দিষ্ট স্থানে তাঁহারই বিমাতাগণ মদিরাপানে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া জলক্রীড়ায় রত, তাঁহারা কন্দর্প সদৃশ শাম্বদেবকে সম্মুখে পাইয়া ভ্রমবশতঃ তাহাকেই আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইলেন, ঠিক এই সময় নারদঋষি শ্রীকৃষ্ণকে তথায় আনাইয়া পূর্ব্ব বাক্য সপ্রমাণ করাইলেন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শাম্বদেবের রূপই, অনিষ্ঠের মূল স্থির করিলেন—এই রূপের নিমিত্তই সকলকার অপমান এবং বিমাতাগণও তাহার এই রূপেই মুগ্ধ হইয়া আলিঙ্গন করিতে গিয়াছিল,এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া তিনি রোষবশতঃ শাম্বকে এই বলিয়া অভিসম্পাত করিলেন, "আমার বাক্যে তোমার রূপলাবণ্য নষ্ট হইয়া কুষ্ঠব্যাধিতে পরিণত হউক"। শ্রীকৃষ্ণের বাক্যে তৎক্ষণাৎ শাম্বদেব নিকৃষ্ট কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত হইলেন।

এদিকে শাম্বদেব অকস্মাৎ বিনাদোষে পিতার নিকট লাঞ্ছিত হইয়া করুণ আর্ত্তনাদে তাঁহার পদপ্রান্তে পতিত হইয়া মুক্তির উপায় প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। পুত্রের করুণ আর্ত্তনাদে কাতর হইয়া তিনি নারদের সহিত যুক্তি করিয়া শাম্বকে সেই মৈত্রবনের একস্থানে এক মনে সূর্য্যদেবের আরাধনা করিতে উপদেশ দিলেন। এইরূপে নারদকে সন্তুষ্ট করিয়া তিনি স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

শাম্বদেব পিতার উপদেশ মত মৈত্রবনে চন্দ্রভাগা নদীতীরে উপনীত হইয়া মুক্তি কামনা পূর্ব্বক এক মনে এক প্রাণে সেই সূর্য্যদেবের কঠোর তপস্যায় রত হইলেন। এইরূপে বহুদিন অতীত হইবার পর একদা ভানুদেব তাঁহার স্তবে তুষ্ট হইয়া শাম্বকে নিকৃষ্ট ব্যাধি হইতে মুক্ত করিবার মানসে স্বরূপে সাক্ষাৎ দানে আজ্ঞা করিলেন, "বৎস

শাম্ব! তোমার তপস্যার কি মহোন্নতি! আর তপস্যার প্রয়োজন নাই, আমার আদেশ মত তুমি চন্দ্রভাগা নদীতে স্নান করিলেই পূর্ব্ব কান্তি প্রাপ্ত হইবে।" এইরূপ: উপদেশ দানে তিনি অন্তর্দ্ধ্যান করিলেন।

শাম্বদেব তপনদেবের আদেশ মত নদীতে স্নান করিবার সময়, এক জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়া, এক মনে তাঁহারই বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং স্নানান্তে দেখিলেন যে, তাঁহার দেহ পূর্ব্বাপেক্ষা লাবণ্য বিশিষ্ট হইয়া নির্ব্যাধি হইয়াছে; তর্দ্দশনে তিনি হৃষ্টচিত্তে শ্রদ্ধাসহকারে সূর্য্যদেবের উদ্দেশে অর্ঘ্যপ্রদান করিতে লাগিলেন। অর্ঘ্য প্রাপ্তে তিনি সশরীরে পুনঃরায় মূর্ত্তিমান হইয়া শাম্বদেবকে অভি-লষিত বর প্রার্থনা করিতে আজ্ঞা করিলেন। ভক্ত শাম্বদেব সেই তেজঃ-পুঞ্জ জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্যদেবকে দর্শন করিয়া প্রীতিমনে তাঁহাকে প্রদক্ষিণ-পূর্ব্বক এই প্রার্থনা করিলেন যে, "অতঃপর আজ হইতে যে কেহ মাঘ মাসে মাকরী সপ্তমী তিথিতে এই পবিত্র নদীতে স্নান করিয়া আমার নির্দ্দিষ্ট তপস্যাস্থান প্রদক্ষিণপূর্ব্বক আপনার উদ্দেশে অর্ঘ্যপ্রদান করিবে, এই বরপ্রভাবে আপনাকে তাহার অভিলাষ পূর্ণ করিয়া নিরোগী করিতে হইবে।" তপনদেব "তথাস্তু" বলিয়া শাম্বের সকল বাসনাই পূর্ণ করিলেন, অধিকন্তু তাঁহাকে উপদেশ দিলেন যে, "স্নানকালে নদীবক্ষে তুমি যে বিগ্রহ-মূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়াছ, সেই বিগ্রহকে আমার স্বরূপ মূর্ত্তি বলিয়া জ্ঞান করিবে।" কারণ বিশ্বকর্ম্মা স্বীয় পুত্রী সংজ্ঞাদেবীকে প্রসন্ন করিবার মানসে আমার তেজ প্রশমন করিলে—সেই তেজ এই নদী-গর্ভে লীন হয়, এতাবৎকাল ঐ তেজমধ্যে আমি গুপ্তভাবেই অবস্থান করিতেছিলাম, এক্ষণে তোমার ন্যায় অকপট ভক্ত পাইয়া আমি বিগ্রহরূপে এখানে আসিয়াছি, অতএব আমার আদেশ মত তুমি এই

স্থানে একটী মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া ঐ বিগ্রহ মূর্ত্তিটীকে কনারক, তৎসঙ্গে উহা প্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক দেবতার নামানুসারে এই স্থান "কনারক" নামে প্রসিদ্ধ কর। শ্রীমূর্ত্তি এইরূপ উপদেশ দানে অন্তর্হিত হইলেন।

ভগবান সূর্য্যদেবের শ্রীমুখে এই সমস্ত উপদেশ পাইয়া শাম্বদেব সেই স্থানে একটী দিব্য মন্দির নির্ম্মাণ এবং তন্মধ্যে উক্ত কনারক মূর্ত্তিটীকে প্রতিষ্ঠিত করাইয়া দেবতার নামানুসারে ঐ স্থান—"কনারক" নামে খ্যাত পূর্ব্বক দেব আজ্ঞা পালন করিলেন। পুরাকাল হইতে অদ্যাবধি সেই মন্দির এখানে শোভা পাইতেছে।

বিশ্বকর্ম্মা সূর্য্যদেবের তেজ কি নিমিত্ত হ্রাস করিয়াছিলেন, পাঠকবর্গের অবগতির জন্য উহা এই স্থানে প্রকাশিত হইল ;—

পুরাকালে একদা বিশ্বকর্ম্মা দুহিতা সংজ্ঞাদেবী পুষ্পচয়ন করিবার সময় সূর্য্যদেবের নেত্রপথে পতিত হন। সূর্য্যদেব সেই নব-যৌবন-সম্পন্না সুন্দরীর অপরূপ রূপ দর্শনে মুগ্ধ হইয়া বিশ্বকর্ম্মার সম্মতিক্রমে তাঁহাকে বিবাহ করেন। এইরূপে কিছুদিন অতীত হইলে এই সংজ্ঞা দেবীর গর্ভে মনু ও যম নামে দুই পুত্র এবং যমুনা নামে এক কন্যা উৎপন্ন হয়। কালক্রমে সংজ্ঞাদেবী সূর্য্যদেবের অসাধারণ জ্যোতিঃ সহ্য করিতে না পারিয়া স্বীয় অনুরূপ রূপবিশিষ্টা এক সহচরীর সহিত পরামর্শ করিয়া, তাহাকে স্বামী সেবায় নিযুক্ত পূর্ব্বক নিজে তপস্যার্থে অরণ্যে গমন করিলেন। যথাকালে সংজ্ঞাসহচরী ছায়ার গর্ভে শনি, শাবনি নামে দুই পুত্র ও তপতী নামে এক পরমাসুন্দরী কন্যার জন্ম হয়। বলাবাহুল্য এতাবৎকাল সংজ্ঞা ও ছায়ার রহস্য কেহই

অবগত ছিলেন না, এমন কি স্বয়ং সূর্য্যদেব পর্য্যন্ত পরাস্ত হইয়াছিলেন।

একদা এই সহচরী ছায়া—কোন বিশেষ কারণ বশতঃ সংজ্ঞাদেবীর পুত্র যমের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া এক রূঢ় অভিসম্পাত প্রদান করেন; তৎশ্রবণে সূর্য্যদেবের চমক্ ভাঙ্গিল এবং মনে মনে স্থির করিলেন, এ রমণী কখনই যম-জননী হইতে পারে না, কারণ আপন গর্ভজাত পুত্র যতই অন্যায় কার্য্য করুক না কেন, মাতা হইয়া তিনি কখনই এরূপ অভিসম্পাত করিতে ইচ্ছা করেন না। এই সন্দেহের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি যোগবল অবলম্বনে সকল রহস্য অবগত হইলেন যে, প্রকৃত সংজ্ঞা দেবী অশ্বিনীরূপ ধারণ করিয়া অরণ্যে এক মনে এক প্রাণে তাঁহারই তপস্যা করিতেছেন, আর সংজ্ঞার উপদেশ মত তাঁহার সহচরী ছায়া, আমার সেবায় নিযুক্তা থাকিয়া আমারই চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিতেছে।”

সূর্য্যদেব এক্ষণে দুঃখিত মনে স্বয়ং অশ্বরূপ ধারণ করতঃ অশ্বিনীরূপ-ধারিণী সংজ্ঞার নিকট উপস্থিত হইয়া আপন পরিচয় দানে উভয়ে পরম সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। এইরূপে তাঁহাদের অবস্থান কালে এবার সেই অশ্বিনীরূপ ধারিণী সংজ্ঞাদেবীর গর্ভে আবার তিনটী পুত্র উৎপন্ন হইল। সেই পুত্রদিগের মধ্যে প্রথম কন্দর্প সদৃশ অশ্বিনী কুমারদ্বয়, অপরটী রেবন্ত নামে জনসমাজে পরিচিত হন। এইরূপে তাঁহারা উভয়ে কিছুদিন অতিবাহিত করিবার পর একদা সূর্য্যদেব, সংজ্ঞাদেবীকে ছায়ার—যমের প্রতি অভিসম্পাতের বিষয় জ্ঞাপন করিলেন, তখন সংজ্ঞাদেবী স্নেহ বশতঃ অধীর হইয়া আপন পুত্র “যম”কে দেখিবার জন্য কাতর হইলেন, এবং স্বামীকে স্বীয় পুরে যাইবার নিমিত্ত অনুরোধ করিতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য সূর্য্যদেবও প্রীতি মনে

তাঁহাকে যত্নের সহিত আপনালয়ে আনয়ন করিলেন ; তখন এই সংজ্ঞা ও ছায়ার রহস্য জনসমাজে প্রকাশ পাইল।

বিশ্বকর্ম্মা এই সমস্ত বিষয় একে একে অবগত হইয়া, জামাতাকে প্রসন্ন পূর্ব্বক সূর্য্যদেবের আদেশে তাঁহার ভ্রমিয়া মন্ত্রের সাহায্যে তপন দেবের তেজ চাঁচিয়া ফেলিলেন। যে সময় এই ঘটনা সংঘটন হয়, সেই সময় সূর্য্যদেবের তেজাংশ হইতে এই ক্ষেত্রে পদ্ম প্রস্ফুটিত হয়, ঐ পদ্মের নামানুসারে এই তীর্থের নাম "পদ্মক্ষেত্র" হইয়াছে।



পুষ্কর-যাত্রা।

পুস্কর-যাত্রা।

হাওড়া হইতে পুস্কর তীর্থে যাইতে হইলে,—যাত্রীদিগকে আগ্রা সহরের মধ্য পথ দিয়া গমন করিতে হয়। আগ্রা—হাওড়া হইতে ৭৯২ মাইল দূরে অবস্থিত। আগ্রা সহরের সেই জগদ্বিখ্যাত তাজ-মহলে মনোহর শোভা দর্শন করিবার জন্য নানাস্থান হইতে অনেকগুলি পথ দেখিতে পাওয়া যায়, যথা,—তুণ্ডলা, মোগল-সরাই, এলাহাবাদ, কাণপুর, মথুরা প্রভৃতি বহুবিধ জংসন ষ্টেশন হইতে এই আগ্রা সহরে পৌছিতে পারা যায়। আমরা সদলে বৃন্দাবন হইতে আগ্রা যাত্রা করিয়াছিলাম, সুতরাং এ ক্ষেত্রে বৃন্দাবন হইতে আগ্রা সহরে যাইবার বিষয়ই লিপিবদ্ধ হইতেছে। ত্রিলোক পূজ্য সেই আদি পুস্কর তীর্থের সেবা করিতে যাত্রা কালীন—পথিমধ্যে নিম্নলিখিত প্রসিদ্ধ স্থানগুলির শোভা সন্দর্শন করিতে অবহেলা করিবেন না। ১। আগ্রার কেল্লা ও তাজ-মহলের দৃশ্য, ২। ভরতপুরের রাজপ্রসাদ, ৩। রাজপুতশ্রেষ্ঠ মহারাজ জয়সিংহ প্রতিষ্ঠিত জয়পুর সহর, শ্রীশ্রীগোবিন্দ ও গোপীনাথ-জীউর দেবালয় এবং গলতা-পাহাড়ের মনোমুগ্ধকর অদ্ভুত দৃশ্য, ৪। আজমীঢ় সহর ইত্যাদি।

আগ্রা।

বৃন্দাবন হইতে রেলযোগে আগ্রা যাইতে হইলে, যাত্রীদিগকে প্রথমে স্থানীয় ষ্টেশনে রেলগাড়ীতে আরোহণ পূর্ব্বক মথুরা যাইতে হয়। এই মথুরা হইতে থ-সার্ভিস-আগ্রা ও কাটগোড়ামের ভিন্ন লাইনে আচনেরা নামক ষ্টেশনে অবতরণ করিতে হয়, এই স্থান হইতে যে ট্রেণখানি আগ্রায় যাইবে, তাহাতেই আরোহণ করিলে সচ্ছন্দে আগ্রায় পৌছান যায়।

মথুরা হইতে বিশ ক্রোশ উজানে যমুনা নদীর পশ্চিম তীরে আগ্রা সহর গর্ব্বভরে আপন শোভা বিস্তার করিয়া অবস্থিত। আশা করি সকলেই অবগত আছেন যে, এই আগ্রাসহর ব্রজ চৌরাশী ক্রোশ সীমার মধ্যেই অবস্থিত। এখানে যমুনা তীরস্থ এক স্থানের বালুকার উপর মহাত্মা ব্যাসদেব জন্মগ্রহণ করিয়া স্থানটীকে পবিত্র পুণ্যতীর্থে পরিণত করিয়াছেন। আগ্রা সহর পুণ্যতোয়া যমুনা নদীর একটী বাঁকের সমস্ত স্থান ঘুরিয়া অবস্থিত, অর্থাৎ সূর্য্যকন্যা যমুনাদেবী প্রফুল্ল-মনে স্রোতস্বিনী হইয়া এইস্থানে প্রবাহিতা হইবার সময় ব্রজের প্রাণ "শ্রীকৃষ্ণের" বংশীরব শ্রবণ মাত্র, উন্মাদিনীর ন্যায় পূর্ব্ববাহিনী হওয়ায় এখানে এক বাঁকে পরিণত হইয়াছে। এই নির্দ্দিষ্ট বাঁকস্থানের উপরি-ভাগে ভারতবিখ্যাত আগ্রা-দুর্গ প্রতিষ্ঠিত।

আগ্রা—একটী প্রসিদ্ধ সহর। এখানকার রাস্তাঘাট যাহা কিছু দেখিতে পাওয়া যায় সমস্তই সুন্দর এবং প্রশস্ত। এ সহরের বাজার, চক্, কেল্লা ও অদ্ভুত সৌন্দর্য্যশালী তাজ-মহলের সৌন্দর্য্য দেখিবার জন্যই যাত্রীগণ আসিয়া থাকেন।

আগ্রার ইতিহাস।

মহাত্মা আকবর বাদশার পূর্ব্বে লুদিবংশীয় রাজারা এখানে বসবাস করিতেন। তৎকালে যমুনা নদীর পূর্ব্বতীরে তাঁহাদের রাজধানী স্থাপিত ছিল। মহাম্মদ বাবর ১৫২৬ খৃঃ এখানে সসৈন্যে উপস্থিত হইয়া নগরটী সম্পূর্ণরূপে অধিকার পূর্ব্বক সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। কিছুকাল এইরূপে রাজত্ব করিবার পর ১৫৩০ খৃঃ এই স্থানেই তাঁহার মৃত্যু হয়। তখন মহাম্মদ বাবরের উপযুক্ত পুত্র "হুমায়ন" কাবুলে রাজত্ব করিতেছিলেন। সংবাদ প্রাপ্তে তিনি পিতার সেই মৃতদেহটী যত্নের সহিত এই কাবুলে আনয়ন পূর্ব্বক মহাসমারোহে কবর দেন। তৎপরে স্বয়ং হুমায়ন স্বর্গীয় পিতার নাম বজায় রাখিবার অভিপ্রায়ে আগ্রার ঐ শূন্য সিংহাসনে আরোহণ পূর্ব্বক রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিছুকাল রাজত্ব করিয়া তাঁহার ও এই স্থানে মৃত্যু হয়, সুতরাং হুমায়ন পুত্র আকবর সেই সিংহাসন অধিকার করিয়া প্রজাদিগকে নানা বিষয়ে অভয়দান করিয়া সুখী করিলেন।

মোগল সম্রাট আকবর বাদশা ১৫৬৬ খৃঃ তাঁহার পৈতৃক রাজধানীটী সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করিয়া আপন পছন্দানুসারে বহু অর্থব্যয়ে নগরের পশ্চিম প্রান্তে যমুনা নদীর তীরে স্বীয় নামানুযায়ী যে নগর স্থাপিত করেন, উহাই আগ্রা নামে প্রসিদ্ধ করেন। কথিত আছে মোগল সম্রাটবংশে এই আকবরের ন্যায় সদাশয় ও বীরপুরুষ আর দ্বিতীয় কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই। এই মহাত্মা অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ ছিলেন, তিনি কাহার ও ধর্ম্মে কখন হস্তক্ষেপ করেন নাই, অধিকন্তু হিন্দু ও মুসলমানদিগের মধ্যে যে ভিন্ন ভাব বর্ত্তমান ছিল, তিনি উহা দূরী-করণার্থে প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন। এই মহাত্মারই রাজত্বকালে

"জিজিয়া" নামক কর উঠিয়া যায়, এতদ্ভিন্ন সাধারণের হিতার্থে তিনি আরও বহুবিধ হিতকর কার্য্য সাধন করিয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছেন।

মহামতি আকবরশাহ ইসলাম্ ধর্ম্মে আস্থাহীন হইয়া অভিনব ধর্ম্মমতের পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন। এই ধর্ম্মমত "তৌহিদ্-ই-ইলাদি" নামে খ্যাত হইয়াছিল। হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের সার অংশ লইয়া যে ধর্ম্ম গঠিত হয়—উহাই তৌহিদ্-ই ইলাদি নামে খ্যাত।

বাদশাহা আকবরের সভামধ্যে বীরবল সিংহ নামে বিখ্যাত গোপাল ভাঁড়ের ন্যায় এক পরিহাসপটু ও ধার্ম্মিক ব্যক্তি সতত অবস্থান করিতেন। কথিত আছে কোন এক সময় এই বীরসিংহ—বাদশাহের নিকট হিন্দুদিগের উপাস্য সূর্য্যদেবের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিলে—তিনি মুগ্ধ হইয়া সূর্য্যোপাসক হইয়াছিলেন, অধিকন্তু তিনি আগ্রহের সহিত হিন্দু ব্রাহ্মণপণ্ডিত মণ্ডলীর সাহায্যে এই সূর্য্যদেবের এক সহস্র একটী সংস্কৃত নাম সংগ্রহ পূর্ব্বক প্রতিদিন প্রাতঃকালে সূর্য্যদেবের অভিমুখিন হইয়া সেই নামগুলি ভক্তিসহকারে পাঠ করিতেন। বলা বাহুল্য, বাদশা আকবর শাহ সূর্য্যদেবের মাহাত্ম্য শ্রবণে এত মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তাঁহার রাজ্যের সকল স্থানে সকল প্রজাগণকেই—প্রাতঃকালে, দ্বিপ্রহরে, সন্ধ্যাকালে ও রাত্রি দ্বিপ্রহর, এই চারিবার হিন্দুদিগের সেই জাগ্রত দেবতার উপাসনা করাইতে বাধ্য করিয়াছিলেন। যদ্যপি কখন কেহ তাঁহার এই আদেশ অমান্য করিত, তাহা হইলে তিনি উক্ত ব্যক্তির প্রাণদণ্ড পর্য্যন্ত ব্যবস্থা করিতেন। এইরূপ আবার হিন্দু প্রজাদিগের মধ্যে কোন ধর্ম্মবিষয় লইয়া বিবাদ উপস্থিত হইলে, তিনি তাঁহার সভাস্থ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের উপর উহার মীমাংসার ভার অর্পণ করিতেন। এই সকল পণ্ডিতগণ বাদী বা প্রতিবাদী উভয়ের মধ্যে শপথগ্রহণ করা আবশ্যক বিবেচনা করিলে—উভয় পক্ষেরই

লোকের হস্তে উত্তপ্ত লৌহ স্থাপন করাইতেন, কখন বা উত্তপ্ত ঘৃতে তাহাদের হস্ত নিমজ্জিত করিবার আদেশ প্রদান করিতেন। এই পরীক্ষায় যদি হস্ত অক্ষত থাকিত, তাহা হইলে বিচারক উক্ত ব্যক্তিকে নির্দোষ প্রতিপন্ন করিতেন।

অগ্নি উপাসক এবং খৃষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচারকগণ সতত বাদশার সভায় সম্মান পাইতেন। এই সকল বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীয় যাজকগণ অবসর মত তাঁহার নিকট স্ব স্ব ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। উপরোক্ত নানা শ্রেণীর ধর্ম্মযাজকদিগের নিকট যে উপদেশ পাইয়াছিলেন, তাহার ফলে বাদশার ধারণা জন্মিয়াছিল— ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়, সম্রাটরূপে ধরায় যিনি প্রজাপালন করেন,— তিনি সেই সর্ব্বশক্তিবান ঈশ্বরের প্রতিনিধি মাত্র। যাহার মন, সকল বিষয় হইতে মুক্ত, তিনি ঈশ্বর প্রেম লাভের অধিকারী হইতে সক্ষম হন; দুষ্প্রবৃত্তির দমন এবং লোক হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠানই পারত্রিক মঙ্গল লাভের প্রকৃষ্ট উপায়।

আকবর শাহ আপন ধর্ম্মবিধান হইতে পৌরহিত্যের প্রথা তুলিয়া দিয়াছিলেন, অধিকন্তু মনুষ্যদিগকে শাস্ত্রের অনুশাসন হইতে মুক্ত করিয়া জ্ঞান ও বিবেকের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য যত্নশীল হইয়াছিলেন। দুর্ব্বলচিত্ত উপাসকের চিত্তবৃত্তির স্থিরতা সম্পাদনার্থ কোন বিশেষ আবশ্যক বিবেচনা করিলে—তিনি অগ্নি অথবা সূর্য্য-দেবের স্তব করিতে উপদেশ দান করিতেন, কেননা তিনি ঈশ্বরকে জ্যোতিঃ-স্বরূপ বলিয়া জ্ঞান করিতেন। উপরোক্ত এই সকল গুণ বর্ত্তমান থাকায় সাধারণে বলিতেন, পূর্ব্বজন্মে আকবর শাহ হিন্দু ছিলেন, কিন্তু শাপগ্রস্ত হইয়া তিনি এজন্মে মুসলমান হইয়া জন্মগ্রহণ

করিয়াছেন। প্রথম ভাগের এলাহাবাদ নামক শীর্ষে এ বিষয় পাঠ করিলে পাঠক মহোদয়গণ সমস্ত অবগত হইতে পারিবেন।

পরলোক ও মুক্তি সম্বন্ধে তাঁহার বিশ্বাস—বৌদ্ধশাস্ত্রানুযায়ী ছিল, অর্থাৎ নানাপ্রকার মহাপুরুষদিগের নিকট তিনি যে উপদেশ পাইয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস জন্মিয়াছিল—জীবাত্মা মৃত্যুর পর অনেক যোনি পরিভ্রমণ করিয়া আপনাপন কর্ম্মফল ভোগ করে, তৎপরে পূর্ণ শুদ্ধিলাভ করিয়া সর্ব্বশেষে ঈশ্বরে বিলীন হয়।

আকবর বাদশার তৌহিদ-ই-ইলাহির উপাসনা প্রণালীতে—প্রার্থনাংশ পারসিক ধর্ম্মের অনুকরণে এবং অনুষ্ঠানাংশ—হিন্দুপদ্ধতি অনুসারে রচিত হইয়াছিল, কিন্তু সামাজিক উপাসনার কোনরূপ বিধান ছিল না। কথিত আছে তিনি নিশাকালে বিচিত্র আলোকমালা প্রজ্জ্বলিত করিয়া একাকী এক মনে এক প্রাণে ঈশ্বরোপাসনা করিতেন। এই মহাত্মার রাজত্বকালে তাঁহার আদেশমত প্রতি বৃহস্পতিবার রাত্রিতে নানা সম্প্রদায়-ভুক্ত হিন্দু, খৃষ্টীয় ও ইসলাম প্রভৃতি শাস্ত্রবক্তৃগণ আপনাপন ধর্ম্ম ও শাস্ত্র বিষয় আলোচনা করিতেন। অহঙ্কার ও অত্মম্ভরিতা তিনি অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন, বিশেষতঃ জ্ঞানী হইয়া যিনি আত্মগর্ব্ব করিতেন, তিনি তাহার লাঞ্ছনার একশেষ করিতেন। আকবরশাহ স্বয়ং যখন ইস্‌লাম শাস্ত্রাবক্তৃগণের সহিত তর্ক বিতর্ক করিতেন, তখন খৃষ্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ প্রভৃতি ধর্ম্মাবলম্বী শাস্ত্রজ্ঞগণ আপনাদের গুণগ্রাম প্রদর্শন করিয়া তাঁহার শ্রদ্ধা ভাজন হইতে সচেষ্ট হইতেন।

৯৮৮ হিজিবার-জমাল-আবল মাসের প্রথম তারিখে ফতেপুরের জুম্মা-মসজিদে তিনি প্রকাশ্যভাবে আপনার অভিনব ধর্ম্ম বিধান প্রচার করেন। হিজিরা অব্দের পরিবর্ত্তে এক নূতন অব্দ প্রচলিত

হইয়াছিল, তাঁহার সিংহাসনারোহণের তারিখ হইতে এই অব্দটী আরম্ভ হয়।

ঔষধার্থ সুরাপান বৈধ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু সুরাপান-জনিত মত্ততার জন্য দণ্ডের বিধান করিয়াছিলেন। এই মহাত্মার আদেশেই নগরের প্রান্তভাগে বেশ্যাপল্লীটী স্থাপিত হইয়াছিল। জনসাধারণের নিকট এই পল্লিটি—সয়তানপুরা নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। আকবর শাহ তাঁহার হিন্দু-মহিষীদিগের প্রীতার্থে গো-মাংস, পেঁয়াজ, রসুন প্রভৃতি এইরূপ অপদার্থ দ্রব্যের মধ্যে কোন কিছুরই আস্বাদ লইতেন না; এইরূপ আবার হিন্দুপ্রজাদিগকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য রবিবার, করওয়ার দিন এবং আবলমাসে কাহাকেও তাঁহার রাজ্য-মধ্যে পশুহত্যা করিতে দিতেন না, যদি কেহ কখন তাঁহার কোন আদেশ অমান্য করিত, তাহা হইলে তিনি উক্ত ব্যক্তির লাঞ্ছনার একশেষ করিতেন।

রাজ্য মধ্যে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে—পিতামাতার সন্তান সন্ততী বিক্রয় করিয়া অর্থসংগ্রহ করিবার ব্যবস্থা ছিল। কোন হিন্দু, ঘটনা-চক্রে পতিত হইয়া যদি বাল্যকালে ইস্‌লাম্ ধর্ম্ম গ্রহণ করিত, তৎপরে সে ব্যক্তি ইচ্ছা করিলে পুনর্ব্বার হিন্দুধর্ম্মে বিনা আপত্তিতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারিত, এতদ্ভিন্ন কখন কোন হিন্দু রমণী কোন মুসলমান যুবকের প্রেমে পতিত হইয়া ধর্ম্মচ্যুত হইত, এবং তাহার অভিভাবকগণ যদি তাঁহার নিকট অভিযোগ আনয়ন করিত তাহা হইলে তিনি তৎক্ষণাৎ উক্ত রমণীকে তাহাদের নিকট প্রত্যার্পণ করাইয়া দিতেন, অধিকন্তু যাহাতে সমাজে উক্ত ব্যক্তিকে অপদস্ত হইতে না হয়, তৎসঙ্গে তাহারও ব্যবস্থা করিয়া দিতেন।

মহাত্মা আকবর বাদশাহের এইরূপ অশেষ গুণ বর্ত্তমান থাকায়

অদ্যাপি হিন্দু-সাধারণ তাঁহার আমলের স্বর্ণের মোহরগুলি আপনাপন গৃহে যত্নের সহিত রক্ষা করিয়া সম্রাটের সম্মান রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। এই মোহর "আকবরী মোহর" নামে খ্যাত। প্রবাদ—এই স্বর্ণমোহর যে গৃহস্থের বাটিতে থাকে, তাহার কখন অন্ন-বস্ত্রের অভাব হয় না, এই বিশ্বাসে অনেকে সেই স্বর্ণমোহরের প্রকৃত মূল্য অপেক্ষা অধিক উচ্চ মূল্য দিয়া উহা ক্রয় করিয়া থাকেন।

আকবর শাহের রাজত্বের শেষভাগে—ভারতে তাসখেলার * প্রচলন আরম্ভ হয়। জাহাঙ্গীর ও সাজিহান বাদশার আমলে, বিলাসিতার সঙ্গে সঙ্গে এই তাস খেলার যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল, এমন কি ঐ সময় প্রতি নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে পল্লীতে "প্রেমারার আড্ডা" বসিত। সম্ভ্রান্ত নাগর-নাগরীগণ এই সময় রাত্রিকালে গোপনে সেই সকল আড্ডাতে বিহার করিতেন। তাহাদের জয়ের আনন্দে—কত আমীর ওমরাহের বদনে উল্লাসের বাসন্তী-বিলাস শোভা পাইত তাহার ইয়ত্তা নাই। পক্ষান্তরে—সর্ব্বস্ব খোয়াইয়া কাহারও নেত্রে কেবল জাগরণ-জনিত অরুণাভা ফুটিয়া উঠিত। কথিত আছে বাদশাহ সাজিহানের রাজত্বকালে—তাসের গতি অন্তঃপুরে প্রসারিত হয়, কিন্তু স্বভাব-সুন্দরীগণ "প্রেমারার প্রেম বুঝিতে পারিতেন না, সুতরাং তাহাদের প্রীতির জন্য "নক্সা" খেলার সৃষ্টি হইল, তৎসঙ্গে নাগর-নাগরী-দিগের চিত্তবিনোদনের নিমিত্ত "বিন্তী" খেলার জন্ম হইল।

বিন্তী, নক্সা, প্রেমারা ব্যতীত "বিবি ধরা", গোলাম-চোর, গ্রাবু" প্রভৃতি অনেক রকম তাস খেলার সৃষ্টি হইল। হরতন, ইস্কাবন, চিড়িতন ও রুইতন—তাসের এই চারি বর্ণের চিত্র লইয়া খেলার উৎপত্তি হইল, অর্থাৎ এই বর্ণের চিত্রে—সমাজের চারিটি সম্প্রদায়কে

* "বসুধা"য় প্রকাশিত "তাসের ইতিহাস" হইতে সংগৃহীত।

বুঝাইতে লাগিল। হরতনের অর্থ—ধর্ম্মযাজক সম্প্রদায়, ইস্কাবনের অর্থ—যোদ্ধ্‌ সম্প্রদায়, চিড়িতনের অর্থ—বণিক বা কৃষক সম্প্রদায়, সমাজের নিম্নশ্রেণীর লোক বুঝাইবার জন্য রুইতনের সৃষ্টি হইল। পূর্ব্বে চিত্রকরেরা তুলি দিয়া এই সকল তাস অঙ্কিত করিত, সুতরাং ১ জোড়া তাসের জন্য খেলোয়ারকে বিস্তর অর্থ ব্যয় করিতে হইত, ১৫শ শতাব্দীর প্রথমেই জার্ম্মানি দেশে এই তাসের প্রথম "উড্‌-এন্‌গ্রেভিং" আরম্ভ হয়, তৎপরে তাহাদের দেখাদেখি এক্ষণে সর্ব্বত্রই সেই তাসের কারখানা প্রস্তুত হইয়াছে।

বর্ত্তমান কালে আমরা যে তাসখেলার প্রচলন দেখিতে পাই, উহা সম্পূর্ণ বিদেশের আমদানী। এই তাস খেলিতে বসিয়া আমরা যে সকল শব্দ ব্যবহার করি, সেগুলি সমস্তই যাবনিক। কালের কুটিল গতি যেরূপ পরিবর্ত্তন হইতেছে, এই তাসের আকৃতিও সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন ভাব ধারণ করিতেছে। প্রমাণস্বরূপ দেখুন —অনেকে এক্ষণে সাহেবের স্থানে—রামকৃষ্ণ বা শিব আঁকিয়া, বিবির পরিবর্ত্তে—সীতা, রাধা বা পার্ব্বতীমূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া, গোলামের স্থানে—হনুমান, গরুড় বা নন্দীমূর্ত্তিতে "কদম্বকেলী" নাম দিয়া তাস খেলিতে থাকেন এবং নিজের নাম জাহির করিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু তাহাদিগকে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে যে, এই খেলা ভারতবাসীরা মোগলদিগের নিকট হইতেই প্রথম শিখিয়াছেন।

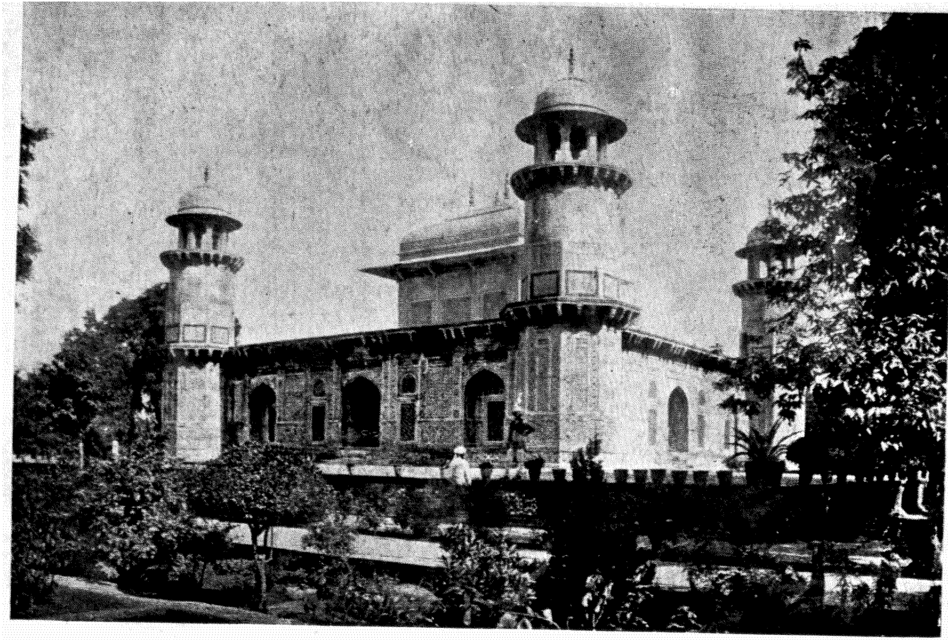
মোগলদিগের অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে তাস খেলারও আদর হ্রাস পাইল, অর্থাৎ মোগল রাজত্বের পর উপরোক্ত বিলাসী তাস খেলার পরিবর্ত্তে এক সর্ব্বনেশে "তেতাস" খেলার উৎপত্তি হইল। তখন সহরের সর্ব্বত্রই "তেতাস" খেলার ধূম আরম্ভ হইল। ভদ্র, অভদ্র, ধনী, দুঃখী, সকলেই এই খেলায় উন্মত্ত! বলা বাহুল্য এ সর্ব্বনেশে

খেলার দায়ে—অনেক গৃহস্থকে—গৃহের তৈজসপত্র পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়া"তেতাসের" ..পে আত্মসম্প্রদান করিতে বাধ্য হইতে হইয়াছিল। যাঁহাদের মনে আভিজাত্যের গর্ব্ব ছিল—তাঁহারাও গুপ্তভাবে এই খেলায় যোগ দিতে আরম্ভ করিয়া শেষে পথের ভিখারী হইলেন।

ইংরাজ রাজত্বের প্রথম সূত্রেও এই সর্ব্বনেশে খেলার প্রাদুর্ভাব ছিল। বর্ত্তমানকালে আইনের কঠোর শাসনে সেই তেতাস খেলার প্রতাপ লোপ হইয়াছে। করুণাময় ইংরাজ রাজের কৃপায় এ পাপ খেলা এক্ষণে লুপ্তপ্রায়, সুতরাং সাধারণে ইহার মর্ম্ম বা প্রতাপ দেখিতে পান না।

মহাত্মা আকবর শাহ স্বর্গারোহণ করিলে—তৎপুত্র জাহাঙ্গীর সেই সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়া অকাতরে বহুসহস্র মুদ্রা ব্যয় পূর্ব্বক সিকান্দার-বাদে·আপন পছন্দানুযায়ী পিতার সমাধি স্তম্ভ নির্ম্মাণ করাইয়া স্বীয় কীর্ত্তি স্থাপিত করেন। বর্ত্তমানকালে আমরা আগ্রা সহরে যে সমস্ত প্রসিদ্ধ অট্টালিকা দেখিতে পাই, সেই সমস্তই সম্রাট জাহাঙ্গীরের পুত্র—মহাত্মা সাজিহান কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছে।

সাজিহানের চতুর্থ পুত্র মহাবীর ঔরঙ্গজেব রাজ্য প্রাপ্ত হইলে, তিনি স্বেচ্ছায় আপন রাজধানী দিল্লীনগরে স্থানান্তরিত করেন। ইহার অল্পদিন পরে মহারাষ্ট্রীয়েরা সুযোগ উপস্থিত দেখিয়া সেই আগ্রা সহরটী দখল করিয়া লন। তৎপরে ১৮০৩ খৃঃ ইংরাজ সেনাপতি লর্ড লেক্ এই আগ্রার পরিচয় পাইয়া তিনি সসৈন্যে এখানে উপস্থিত হন এবং মহারাষ্ট্রীয়দিগকে যুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিয়া এখানে ইংরাজদিগের "উইলিয়ম জ্যাক" নামক বিজয় নিশান উড্ডিয়মান করেন। এইরূপে কিছুদিন অতীত হইলে পর ১৮৩৫ খৃঃ ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের আদেশে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের রাজধানী এলাহাবাদ হইতে আগ্রাসহরে উঠাইয়া



এম্‌দাদ্‌ উদ্যানের দৃশ্য।

[১৬৩ পৃষ্ঠা]

Sulov Press, Calcutta.

লইয়া যান। এইরূপে তথায় কিছুদিন অবস্থানের পর ১৮৫৭ খৃঃ সিপাহিবিদ্রোহের পর তাঁহারা পরামর্শ করিয়া এই রাজধানীটী পুনরায় এলাহাবাদের যথাস্থানে স্থাপিত করিলেন।

আগ্রার দ্রষ্টব্য স্থান—১। রক্তবর্ণ বেলেপাথরের দুর্গ, ২। মতি মসজিদ্, ৩। এম্‌দাদ্ উদ্যান, ৪। তাজ-মহল, ৫। সাদা পাথরের পরদা, ৬। আকবরশাহের অট্টালিকা, ৭। সিকিন্দ্রাবাদের সমাধি স্তম্ভ, ৮। চক্ বাজার ইত্যাদি।

এম্‌দাদ্ উদ্যান—সম্রাট আকবরশাহের রাজত্বকালে এই সুন্দর উদ্যানটী প্রস্তুত হইয়াছিল। ইহার মধ্যে রাম-বাগ নামক একটী উৎকৃষ্ট বৈঠকখানা বিরাজিত। এই বৈঠকখানা বাটীর সৌন্দর্য্য দেখিলে দর্শকবৃন্দকে আত্মহারা হইতে হয়। পাঠকবর্গের প্রীতির নিমিত্ত সেই মনোমুগ্ধকর উদ্যানের একখানি চিত্র প্রদত্ত হইল।

আগ্রায় যতগুলি মসজিদ বর্ত্তমান আছে, তন্মধ্যে তাজ-মহল নামক মসজিদ্‌ই সর্ব্বপ্রধান। ইহাতে সাজিহান ও তাঁহার প্রিয়তমা মহিষী মম-তাজ উভয়ের একত্রে সমাধি হইয়াছে। এরূপ সুন্দর মসজিদ ভারতবর্ষ মধ্যে আর দ্বিতীয় নাই। বর্ত্তমান আগ্রা সহরের অন্যূন এক ক্রোশ দূরে যমুনার তটোপরি "তাজ-মহল" ফতেপুর শিক্রির লাল বেলেপাথর ও জয়পুরের প্রসিদ্ধ শ্বেতপ্রস্তর দ্বারা দুই কোটী মুদ্রা ব্যয়সহকারে ১৯ বৎসর প্রাণপণ পরিশ্রমের পর প্রতিষ্ঠিত হয়। কথিত আছে, ১৬২৯ খৃঃ মম-তাজের মৃত্যুর পরেই এই তাজ-মহলের নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ হইয়া ১৬৪৮ খৃঃ শেষ হয়।

তাজ-প্রাঙ্গণের প্রবেশ দ্বার অতি প্রকাণ্ড, সম্মুখেই মনোহর উদ্যান—নানাজাতি বৃক্ষাবলীর হরিদ্বর্ণ ছায়া অতি স্নিগ্ধকর; মধ্যে মধ্যে বিস্তর নানা ধরণের উৎস শোভা পাইতেছে, এতদ্ভিন্ন তাজ-

মহলের দিকে অগ্রসর ইহবার উভয় পার্শ্বেই শোক প্রকাশক "সাইপ্রস বৃক্ষশ্রেণী" যেন সম্রাট দম্পতীর অদর্শনে নতশীরে দণ্ডায়মান থাকিয়া আপনাপন মনোবেদনা প্রকাশ করিতেছে।

মুসলমান বাদশাহেরা প্রায় সকলেই জীবিতাবস্থায় স্বীয় পছন্দানু-যায়ী আপনাপন সমাধি মসজিদ্ নির্ম্মাণ করাইতেন। এই কারণে তাঁহাদের দেখাদেখি আমাদের বাঙ্গলাদেশে একটী প্রবাদ শুনিতে পাওয়া যায়—"যার শ্রাদ্ধ সেই করে, অন্যে কেবল খেটে মরে"। মসজিদের নির্ম্মাণ কার্য্যের তত্ত্বাবধান বাদশাহ নিজে করিতেন। একটী সমাধি মন্দির বা মসজিদ্ নির্ম্মাণ করাইতে হইলে স্বয়ং বাদশা, প্রথমে আপন পছন্দানুসারে প্রশস্ত বাগান মনোনীত করেন, তৎপরে তাহার চারিদিকে উচ্চ প্রাচীর দিয়া মধ্যস্থলে মসজিদ্‌টী নির্ম্মাণ করাইয়া যতদিন তিনি জীবিত থাকেন, ততদিন অবসর মত প্রত্যহ অপরাহ্নকালে তিনি আপন স্ত্রী, পুত্র ও আত্মীয় সজনকে সঙ্গে লইয়া তথায় শীতল বায়ু সেবন করিতে থাকেন; শেষে মৃত্যু হইলে চির-প্রথানুসারে তাঁহার মৃতদেহ ঐ সমাধিক্ষেত্রে কবর দেওয়া হইয়া থাকে।

সমাধি মসজিদ্‌গুলির গঠনপ্রণালী দেখিতে প্রায় একই প্রকার—চারিদিকে উচ্চ প্রাচীর, একটী বা দুইটী প্রবেশ দ্বার, মধ্যস্থলে বেদী। এই বেদীটী চতুস্কোণাকৃতি, কিন্তু শেষের কোণগুলি কাটিয়া তাহার উপরে গম্বুজ স্থাপিত হয়। বেদীর মধ্যস্থলে একটী পাথরের সিন্দুকের মধ্যে শবদেহ স্থাপিত থাকে। ইহার উপর তলায় একটী খালি সমাধি সজ্জিত হয়। মৃত স্ত্রী বা আত্মীয়গণের দেহ সেই মসজিদের কোণস্থ বা অন্যান্য কক্ষে কবর দেওয়া হইয়া থাকে।

তাজ-মহল।

তাজের প্রকাণ্ড তোরণ দ্বার দিয়া প্রবেশ করতঃ উৎসাদি শোভিত উদ্যান পথের সাহায্যে বরাবর এক রক্তপ্রস্তর বেদীর সোপানশ্রেণীর সম্মুখে উপস্থিত হইবামাত্র দেখিলাম—আমাদের ন্যায় ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীর কত শত দর্শকবৃন্দ মার্ত্তণ্ডের উত্তাপ অগ্রাহ্য করিয়া এক মনে এক দৃষ্টে তাজের অদ্ভুত কারুকার্য্য এবং সৌন্দর্য্য দেখিতেছেন। সেদিন যতগুলি দর্শক এখানে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে উত্তর পশ্চিম দেশীয় হিন্দু এবং বাঙ্গালী তীর্থ যাত্রীর ভাগই অধিক; এতদ্ভিন্ন দু'দশজন সাহেব-বিবি এবং মুসলমান দর্শকও ছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় সকলেরই যেন উন্মত্ত ভাব, কেহ কাহারও প্রতি অত্যাচার বা হিংসা করিতেছে এরূপ দেখিলাম না। আমরা সন ১৩১৭ সালের ভাদ্র মাহার শেষ ভাগে এই তাজ-মহলের সৌন্দর্য্য দর্শন করিতে গিয়াছিলাম।

বাগানের সমতল জমী হইতে রক্তপ্রস্তর বেদীটী অন্যূন চারি পাঁচ ফিট উচ্চে অবস্থিত। এই সোপান বাহিয়া সেই বেদীর উপর উঠিতে হয়। এখানে কি ধনী, কি গরীব, কি বিদ্বান, কি মুর্খ সকলকেই বাদশাহ দম্পতীর প্রেমস্মৃতির সন্মান রক্ষণার্থে সেই নির্দ্দিষ্ট বেদীর বাহিরে আপনাপন পাদুকা ত্যাগ করিতে হয়। ঐ সকল পাদুকা রক্ষণাবেক্ষণ করিবার জন্য প্রহরী নিযুক্ত আছে।

তাজ অভ্যন্তরস্থ সেই সুপ্রশস্ত বেদীর দক্ষিণপ্রান্তে সোপান শ্রেণীর সম্মুখভাগ ব্যতীত সর্ব্বত্রই জালের ন্যায় শিল্পনৈপুণ্যে শোভিত। ইহার উত্তর-দক্ষিণ প্রায় চারি শত এবং পূর্ব্ব-পশ্চিম—হাজার ফিট স্থান লইয়া বিস্তৃত। বেদীর ঠিক মধ্যস্থলে শঙ্ক-শ্বেত-গম্বুজ ও মিনার চতুষ্টয়

শোভা পাইতেছে। পশ্চিমপ্রান্তে বাউরি-মসজিদ ও পূর্ব্বপ্রান্তে জমাটখানা আপন সৌন্দর্য্য বিস্তার করিয়া আছে। যমুনাতীরে কারু-কার্য্যবিশিষ্ট এক অনুচ্চ রক্তপ্রস্তর প্রাচীর স্থান পাইয়াছে। জমাটখানার মাঝামাঝি স্থানে একটী ক্ষুদ্র পাষাণমণ্ডিত জলাশয়, সেই জলাশয়ে পাঁচটী কৃত্রিম উৎস এই স্থানের শোভা আরও বৃদ্ধি করিয়াছে। এইরূপে রক্তবেদীর শোভা দর্শনান্তে শ্বেতমর্ম্ম-বেদীর নিকট উপস্থিত হইলাম।

শ্বেতমর্ম্ম-বেদী—এই বেদীটী রক্তপ্রস্তর বেদী অপেক্ষা অনেক উচ্চে প্রতিষ্ঠিত। একবিংশতিটী শ্বেতমর্ম্মর সোপান অতিক্রম করিয়া ইহাতে উঠিতে হয়। উত্তর-দক্ষিণ ও পূর্ব্ব-পশ্চিম স্থান সমতল তিন শত ফিট বিস্তৃত; মধ্যস্থলে গগণচুম্বী শ্বেত-গম্বুজ শোভিত অদ্ভুত সমাধি-মন্দির, আবার ইহার চারিকোণে চারিটী বিশাল তুষার-ধবল মিনারস্তম্ভ আপন শোভা বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। চক্ষের সমক্ষে সমস্তই যেন চিত্রার্পিতবৎ প্রতীয়মান হয়—কি অলৌকিক সৌন্দর্য্য! কি অদ্ভুত মাধুর্য্য! উপরোক্ত এই সকল নয়নানন্দদায়ক দৃশ্য দর্শন করিতে করিতে ক্রমে আমরা সমাধির দ্বারদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

এই নির্দ্দিষ্টস্থানে এক প্রকাণ্ড দ্বার দেখিলেই হতবুদ্ধি হইতে হয়। সেই ভয়ঙ্কর দ্বারে বিস্তর কাল-জালের ন্যায় ছিদ্র দেখিতে পাওয়া যায়। এখানকার এই দ্বারদেশেই ইউরোপীয়েরা মৃত সম্রাটের সম্মান রক্ষার্থে আপনাপন টুপীগুলি স্থাপিত করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে লাগি-লেন; তদ্দর্শনে আমরাও সদলে উহাদের পশ্চদ্গামী হইয়া যাহা দর্শন করিলাম, উহা লেখনীর দ্বারা বর্ণনা অসাধ্য। আহা! এই স্থানের এই সকল আহামরি দৃশ্য যিনিই দেখিবেন, তিনিই মুগ্ধ হইবেন সন্দেহ নাই। এ দৃশ্য কি মধুর! কি গাম্ভীর্য্যপূর্ণ! কি সৌন্দর্য্যময়! কোন্টী বাদ

দিয়া কোন্‌টীর প্রশংসা করিব—পার্থিব পদার্থের উপর একি এক অপূর্ব্ব অপার্থিব কল্পনার লীলাখেলা! বহুক্ষণ ধরিয়া স্থানীয় মনোমুগ্ধকর দৃশ্য দর্শনে মোহিত হইয়া ভাবিলাম—একি আমাদেরই ন্যায় মানবের কল্পনাপ্রসূত?

মাথার উপর বহু উচ্চে—বিশাল বিরাট নিষ্কলঙ্ক শ্বেত গম্বুজ, চতুর্দ্দিকে—শ্বেতপ্রস্তর নির্ম্মিত গৃহপ্রাচীর, পদতলে—শ্বেত কৃষ্ণমর্ম্মর পাষাণ-মণ্ডিত হর্ম্ম্যতল, সম্মুখে—পাতাল-পথের মত মূল কবরখানায় পৌঁছিবার এক প্রশস্ত সোপান। এই সোপানের উত্তরদিকে অত্যাশ্চর্য্য মূল্যবান প্রস্তরাদি খচিত সূক্ষ্ম জালের ন্যায় প্রস্তর প্রাচীর বেষ্টিত নকল কবরখানা শোভা পাইয়াছে। ইহারই সম্মুখে, পশ্চাতে, বামে, দক্ষিণে, উর্দ্ধে ও অধোদিকে, অর্থাৎ যে দিকেই নয়ন পতিত হয়, সেই দিকেই সুচিক্কণ অমল-ধবল পাষাণে—দর্শকবৃন্দের প্রতিবিম্ব পরিলক্ষিত হইতে থাকে; কি অদ্ভুত ব্যাপার! দীর্ঘ শ্মশ্রু-মণ্ডিত স্ফটিক-মালা শোভিত কবর-রক্ষকেরা চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

এই নকল কবরখানার স্থানে স্থানে অদ্যাপি মোল্লাগণ কোরাণ পাঠ, তৎসঙ্গে ধুপ, ধুণা লবান মিশ্রিত করিয়া উহাই অবসর মত সম্মুখস্থ ধুমুচীতে নিক্ষেপ করিতেছেন, ইহার ফলে সেই সুগন্ধ—চারিদিক মাতোয়ারা করিয়া সম্রাট দম্পতীর আত্মার মঙ্গল কামনা করিতেছে। স্থানীয় প্রহরীদিগের নিকট উপদেশ পাইলাম, এইরূপ কাণ্ড এখানে প্রত্যহই হইয়া থাকে। বিশাল গম্বুজ চারিটী—এক প্রকাণ্ড খিলানের উপর ভর দিয়া উচ্চশিরে দণ্ডায়মান। তাজের চতুর্দ্দিকে বিস্তর কোরাণের শ্লোক লিখিত, এতদ্ভিন্ন গৃহপ্রাচীর ও প্রত্যেক খিলানে নানাবিধ মূল্যবান প্রস্তরখণ্ড অপূর্ব্ব সাজে শোভিত হইয়া গ্রথিত হইয়াছে, কি বিরাট ব্যাপার! অবগত হইলাম পূর্ব্বে এই সকল স্থানে বহুমূল্য হীরা,

জহরৎ, মণি-মাণিক্য প্রভৃতি সংযুক্ত ছিল; বারম্বার রাষ্ট্রবিপ্লবের ফলে উহা লুণ্ঠিত হওয়ায়, এক্ষণে তৎপরিবর্ত্তে এগুলি অল্প মূল্যের প্রস্তরাদির দ্বারাই সজ্জীকৃত দেখিতে পাওয়া যায়।

নকল কবরখানার স্থানে স্থানে প্রস্তরাদি মালাকারে, কোন কোন স্থানে বা পত্রপুষ্পাকারে, আবার কোথাও বা অলঙ্কারাকারে গ্রথিত হইয়া অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে। ইহার কোন্‌টী বাদ দিয়া কোন্‌টীর সুখ্যাতি করিব। ফলকথা এই সকল সুনিপুণ শিল্পকার্য্য নয়নগোচর হইলে আত্মহারা হইতে হয়। যাহা দেখিয়াছি তাহা আমাদের কল্পনাতীত।

গম্বুজ নিম্নস্থ প্রকাণ্ড কক্ষটী—অষ্টভুজাকৃতি। তাহার প্রত্যেক ভুজ ২৪ ফিট দীর্ঘ, সেই অষ্টভুজের উপর ৮০ ফিট উচ্চে গম্বুজাকার খিলান—এই খিলানের উপরিভাগে তাজের মূল-গম্বুজ আপন শোভা বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। কক্ষের হর্ম্মতল সমচতুস্কোণ, শ্বেতমর্ম্মর প্রস্তরখণ্ডে মণ্ডিত—তাহার উপর আবার কৃষ্ণপ্রস্তরের নানাবিধ কারুকার্য্য-গ্রোথিত। সমাধি-মন্দিরটী এক সমতল চাতালের উপর স্থাপিত। প্রথম চাতাল—অন্যূন বিশ ফিট পর্য্যন্ত উচ্চ হইয়া নির্ম্মিত এবং পরিধি প্রায় সহস্র ফিট অধিকার করিয়া আছে। দ্বিতীয়টী কেবল মারবেল প্রস্তরে মণ্ডিত—ইহা উচ্চে ১৫ ফিট এবং ৩০০ ফিট বিস্তৃত।

যে মারবেল চাতালের উপরে গম্বুজ ও চূড়া সম্বলিত তাজ-মহল স্থাপিত আছে, সুবিধা মত তাহার উপরে উঠিয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি করিলে —তাজমহলের সর্ব্বাবয়ব সমষ্টির সৌন্দর্য্যে মন এমন আকৃষ্ট হয় যে, ইহার সর্ব্বাংশ তন্ন তন্ন করিয়া দেখিবার অবকাশ থাকে না। জানালা-স্থিত কারুকার্য্যবিশিষ্ট মারবেলের পরদা, শিল্পনৈপুণ্য শোভিত বারান্দার ছাদ, খিলানের প্রবেশদ্বার প্রভৃতি বহুমূল্য প্রস্তর শোভিত দেওয়াল-

গুলিতে নানা জাতীয় নানা বর্ণের পুষ্পপত্র ও পুষ্পমালা প্রভৃতি অঙ্কিত শোভা—নয়নগোচর হইলে মনে হয়, যেন এই সকল এখনি উদ্যান হইতে তুলিয়া আনিয়া যত্নের সহিত সেই মারবেলের উপর বসান হইয়াছে। এক কথায় তাজ-মহলের যাবতীয় শিল্পনৈপুণ্য—শিল্পকারী-দিগের গৌরব স্থল।

মহামতি বড় লাট লর্ড কর্জ্জন বাহাদুর ভারতবর্ষ ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে একবার তাজ-মহলের শোভা দেখিবার জন্য পদার্পণ করিয়াছিলেন, এবং মৃত সম্রাট দম্পতীর সম্মান বৃদ্ধি করিবার অভিলাষে এখানে একটী রৌপ্যের আলোকাধার উপহার স্বরূপ প্রদান পূর্ব্বক আপন মহত্ব প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রদত্ত সেই উপহার বস্তুটী অদ্যাপি তাজ-মহলের একস্থানে স্থান পাইয়া—দাতার কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। তাজ-রক্ষক খাদিমেরা প্রত্যেক দর্শকদিগকে এই সকল বিষয় স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিয়া থাকে। এখানে চিরপ্রথানুসারে ছয়জন করিয়া খাদিম এক সঙ্গে পাহারা দেয়। কক্ষের মধ্যস্থলে জালের ন্যায় শ্বেত-প্রস্তর প্রাচীর বেষ্টিত স্থানের ভিতর বাদশাহ সাজিহান ও তাঁহার প্রিয় বেগম মমতাজের পাশাপাশি দুইটী নকল কবর অবস্থিত। এই স্থানের খাদিমেরা বলিল—কোমলপ্রাণা মম-তাজমহল জীবিতাবস্থায় যে সকল ফুল পছন্দ করিতেন,সম্রাট সাজিহান প্রেমভরে সেই সকল ফুলই তাঁহার কবরের উপর খোদিত করিয়া দিয়াছেন ; এতদ্ভিন্ন এই কবরের উপরি-ভাগে প্রিয় বেগমের আত্মার মঙ্গলের জন্য আল্লার ৯৯ প্রকার পবিত্র নাম পর পর স্থাপিত রাখিয়া আপন মহত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। মম-তাজের পার্শ্ববর্ত্তী যে নকল কবর দেখিতে পাওয়া যায়, উহাই স্বর্গীয় সম্রাট সাজিহানের নকল কবর। ইহাতেও ঠিক মম-তাজের ন্যায় নানাবিধ পুষ্প খচিত আছে, অধিকন্তু এই কবরের উপর একটী কলম-

দান প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, ইহা ছাড়া সম্রাট সাজিহানের মৃত্যুর কারণের বিষয়ও উহাতে লিপিবদ্ধ আছে।

তাজ-মহলের এই নির্দ্দিষ্ট স্থানে কত দর্শক সম্মানে সেই কবরদ্বয়ের উপর সযত্নে পুষ্পমালাদি উপহার দিতে লাগিলেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। অবগত হইলাম প্রত্যহই দর্শকেরা এইরূপে এখানে পুষ্প উপহার দিয়া সম্রাট দম্পতীর মান রক্ষা করিয়া থাকেন। এইরূপে সকলে পুষ্পবৃষ্টি শেষ করিয়া সম্মুখস্থ সোপানশ্রেণীর সাহায্যে নিম্নে আসল কবরের দিকে দলে দলে অগ্রসর হইতেছেন দেখিয়া আমরাও তাঁহাদের পশ্চাদ্গামী হইলাম; ঠিক এই সময় একজন খাদিম এক প্রজ্বলিত আলোক হস্তে সেই পাতালপুরীর ন্যায় নিম্নস্তরের অন্ধকার পথ প্রদর্শন করাইতে লাগিল।

মূল সমাধি কক্ষের অভ্যন্তর—ঘোর অন্ধকার, খাদিম প্রদত্ত সেই আলোক সাহায্যে কক্ষের মধ্যস্থলে মম-তাজের আসল কবর, তাহার পশ্চিম পার্শ্বে বাদশাহ সাজিহানের আসল কবর স্থাপিত দেখিতে পাওয়া যায়। এই দুই কবরের মাথার উপর—ইতিপূর্ব্বে উপরের ঘরে যে নকল কবর দেখিয়া আসিয়াছিলাম—আসল কবরে সেরূপ কারুকার্য্য নাই সত্য, কিন্তু এই আসল কবর-দ্বয়ের উপরিভাগে বিস্তর কোরাণের বয়েত (শ্লোক) লিখিত আছে। এইরূপে সম্রাট দম্পতীর অনন্ত প্রেমশয্যা সন্দর্শন করিয়া মনে মনে ভাবিলাম—কোথায় সেই সম্রাট সাজিহান, যিনি প্রিয়তমার শোকে অধীর হইয়া আজ দুই শত বৎসর পর ও এই স্মৃতি অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছেন, সেই প্রেমভরা প্রসিদ্ধ সম্রাটদম্পতীর কবরস্থান ভক্তির চক্ষে দর্শন করিয়া যত পারি ইহার কিঞ্চিৎ শিক্ষা করি। সে যাহাহউক, এবার এই স্থান হইতে বাহিরে আসিবার সময় এক শ্বেত মর্ম্মর বেদীর উপর

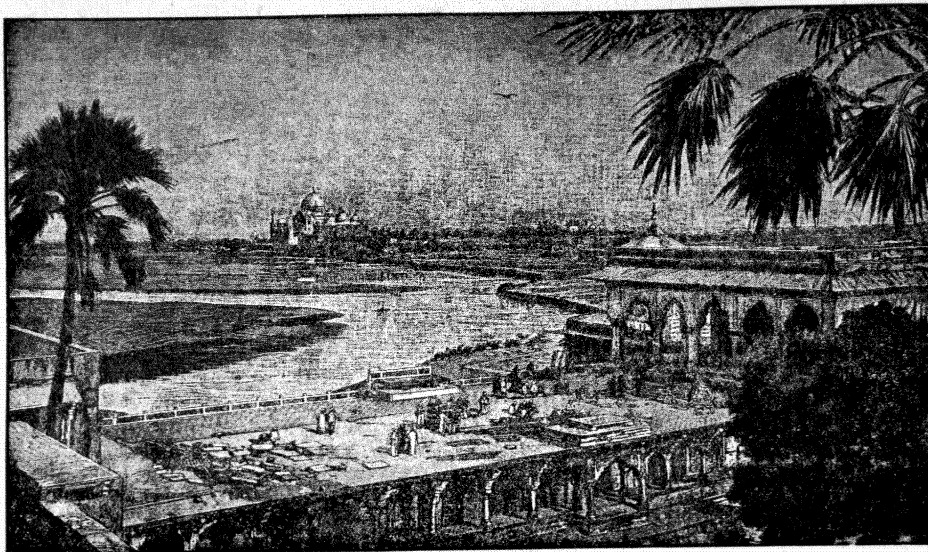
দাঁড়াইয়া একবার সেই জগদ্বিখ্যাত তাজ-গম্বুজের শীর্ষদেশ তাকাইয়া দেখিলাম যে, ইহা সমতল ভূমির বহু-উচ্চে অবস্থিত, আবার সেই গম্বুজ শার্ষে একটী সুবর্ণমণ্ডিত পিত্তল দণ্ড সূর্য্যকিরণে ছক্‌মক্‌ করিতেছে, এতদ্ভিন্ন উহার শিখরদেশে ইস্‌লামের অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি চিহ্ন শোভা পাইতেছে। এই স্থানে সেই খাদিমের নিকট জানিতে পারিলাম, বাগানের সমতলভূমি হইতে এই গম্বুজশীর্ষস্থ অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি চিহ্নটী পর্য্যন্ত দুই শত চল্লিশ ফিট উচ্চ। আশা করি অনেকেই অবগত আছেন যে—দিল্লীর কুতব-মিনার সমতলভূমি হইতে দুই শত আটত্রিশ ফিট উচ্চ।

সেই গম্বুজের আবার চারি কোণে চারিটী মিনার ইহার সৌন্দর্য্য আরও বৃদ্ধি করিতেছে, এই সকল মিনারের মধ্যে প্রত্যেকগুলি আট-কোণ ভিত্তির উপর স্থাপিত, এবং সমস্তই গোলাকার রূপে নিম্ন হইতে উচ্চ পর্য্যন্ত গঠিত, কিন্তু ইহার আকৃতি নিম্নস্তর হইতে উচ্চস্তর পর্য্যন্ত ক্রমান্বয়ে স্থূল হইতে সূক্ষ্ম হইয়া উঠিয়াছে। তাজের এই মিনারের উপরে উঠিবার ১৫৪টী তোরণ বিশিষ্ট সোপান বাহিয়া আরোহণ করিলে পর, ইহার তিনটী তল দৃষ্ট হয়। প্রত্যেক তলে এক একটী প্রস্তর ঘেরা গোলাকার বারাণ্ডা—সেই বারাণ্ডায় দাঁড়াইলে বায়ুর তাড়নায় গাত্রবস্ত্রাদি দেহচ্যুত হইতে থাকে। বাগানের সমতল জমী হইতে এই সকল মিনারের শীর্ষফলক এক শত একচল্লিশ ফিট উচ্চে অবস্থিত। নির্দ্দিষ্ট এই স্থানের পদতলে ছায়া-শীতল মর্ম্মচত্বরের উপর বিশ্রাম করিবার সময় চতুর্দ্দিকের তরুরাজীর শ্যামশোভা সূর্য্যকিরণে উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিয়া এইস্থান হইতে ২৮ ফিট নিম্নে যমুনাবক্ষে নীল সলিলরাশি যেন ঝিকিমিকি খেলিতেছে বলিয়া অনুমান হয়। ইহার পরপারে কেবল জঙ্গল দেখিতে পাওয়া যায়, সেই জঙ্গলের

পার্শ্বে নদীতীরে একখানি নৌকা আছে, নদীতরঙ্গে সেখানি কেবল নাচিতেছে; বহুদূরে বনের শ্যামশোভার অন্তরাল হইতে আগ্রা দুর্গের দৃশ্য—স্বপ্নদৃষ্ট গন্ধর্ব্বালয়ের মত অনুমিত হইয়া থাকে। পাঠক-বর্গের প্রীতির নিমিত্ত বহু অর্থ ব্যয়সহকারে যমুনার সেই মনোহর দৃশ্যপটের একখানি চিত্র সংশ্লিষ্ট হইল।

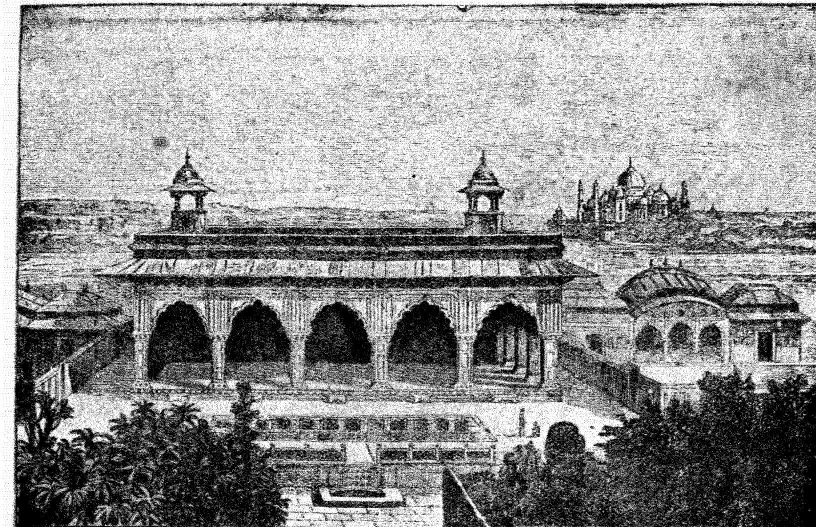
কালীবাড়ী—এখানে মুসলমান বাদশাদিগের রাজত্বকালে হিন্দু তীর্থ যাত্রীদিগের অহারের অত্যন্ত বেবন্দোবস্ত হওয়াতে, স্থানীয় গণ্য-মান্য হিন্দুগণ প্রকাশ্য সভা করিয়া সাধারণ হিন্দুদিগের নিকট হইতেই চাঁদা সংগ্রহ করেন,এবং আগ্রা সহরের পশ্চিমদিকে—স্থানে স্থানে অনেকগুলি হিন্দুদিগের উপাস্য কালীকা দেবীর মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া,তন্মধ্যে দেবী-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করাইয়াছিলেন, অধিকন্তু উহাদের মধ্যে নিষ্ঠবান ব্রাহ্মণ-দিগকে নিযুক্ত পূর্ব্বক মহামায়ার ভোগের প্রসাদ হিন্দু তীর্থ যাত্রীদিগের আহারের জন্য বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। অদ্যাপি ঐ সকল কালী বাড়ী আগ্রা সহরের পশ্চিম ভাগে বর্ত্তমান থাকিয়া তাঁহাদের কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে।

আগ্রার মার্ব্বেল প্রস্তর নির্ম্মিত নানা প্রকার সৌখিন দ্রব্য জগদ্বিখ্যাত। সহর হইতে তিন ক্রোশ দূরে সিকন্দ্রা-বাগ নামক উদ্যান বাটী উচ্চশিরে গর্ব্বভরে দণ্ডায়মান থাকিয়া আপন শোভা বিস্তার করিয়া আছে। পূর্ব্বেই উল্লেখ হইয়াছে যে, আকবর শাহের মৃত্যুর পর তৎপুত্র জাহাঙ্গীর সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়া তিনি অকাতরে বহু অর্থ ব্যয়সহকারে পিতার সমাধি স্তম্ভটী নির্ম্মাণ করিয়া আপন কীর্ত্তি স্থাপিত করেন। এই বাগানটী অন্যূন সিকি মাইল স্থান অধিকার করিয়া মধ্যভাগে সমাধি মন্দিরটীকে স্থান দিয়া আপন শোভা বিস্তার করিয়া আছে। ইহার চারিদিক্‌ই উচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত।



তাজমহলের সম্মুখস্থ নদীর দৃশ্য। [১৭২ পৃষ্ঠা]

Sulov Press, Calcutta.



সিকিন্দ্রাবাদের আকবর শাহের সমাধি মন্দিরের দৃশ্য। [১৭৩ পৃষ্ঠা]

Sulov Press, Calcutta.

সমাধিমন্দিরের বেড় ২০০ শত হস্ত, উচ্চতায় ও ৬৭ হস্ত—তাহার উপর নানাপ্রকার গম্বুজ ও চূড়া শোভা পাইতেছে। ইতিহাস পাঠে উপদেশ পাওয়া যায়—স্বয়ং আকবর শাহ জীবিতাবস্থায় এই বাগানের স্থান পছন্দ করিয়া তাঁহার নিজের সমাধি মন্দিরটী তন্মধ্যে নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু ইহার নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হইতে না হইতে তাঁহার মৃত্যু হয়, সুতরাং তাঁহার উপযুক্ত পুত্র সম্রাট জাহাঙ্গীর উহার নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ করিয়া পিতৃদেবের আশা পূর্ণ করিয়াছেন, অর্থাৎ সেই সমাধি মন্দিরটী মনের মত সুশ্রী ও সুন্দররূপে নির্ম্মাণ করাইয়া তাহাব মধ্যে স্বর্গীয় পিতার সেই মৃতদেহটী কবর দিয়াছেন। ইহার উপরতলায় খালি কফিণ, সেই কফিণখানি এক খণ্ড মারবেল প্রস্তরে নির্ম্মিত। সিকিন্দ্রাবাদে আকবর শাহের এই সমাধিমন্দিরের সৌন্দর্য্য দর্শন করিলে বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়। পাঠকবর্গের প্রীতির নিমিত্ত সেই অদ্ভুত সৌন্দর্য্যশালী সমাধি মন্দিরের একখানি চিত্র প্রদত্ত হইল।

আগ্রা-দুর্গ।

এই দুর্গটী রেল ষ্টেশনের অনতিদূরে অবস্থিত। ইহা পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্য্য পদার্থের মধ্যে পরিগণিত না হইলেও ইহার মধ্যে যে সমস্ত কারুকার্য্যবিশিষ্ট দর্শনীয় দ্রব্য সামগ্রী স্থাপিত আছে, সেই সৌন্দর্য্যশালী বস্তুগুলি নয়ন পথে পতিত হইবা মাত্র আত্মহারা হইতে হয়। যমুনার তীরে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে প্রায় অর্দ্ধ মাইল পথ ব্যাপীয়া এই বিশাল দুর্গটী আপন শোভা বিস্তার করিয়া দর্শকবৃন্দকে যেন ভিতরের শোভা দেখাইবার নিমিত্ত আহ্বান করিতেছে। দুর্গের সন্নিকটেই জুম্মা-মসজিদ প্রতিষ্ঠিত। এই দুর্গের চতুর্দ্দিকে দুইটী

অত্যুচ্চ প্রস্তর-প্রাচীর পর পর ইহাকে বেষ্টন করিয়া আছে। সেই প্রাচীর-দ্বার-মধ্যে একটি পরিখা ব্যবধান; তাহার পশ্চিম পার্শ্বস্থ প্রাচীর-দ্বারের মধ্যে যে পরিখাটি বর্ত্তমান আছে,উহা চল্লিশ ফিট বিস্তৃত, আর পূর্ব্বপার্শ্বস্থ দ্বারের মধ্যস্থলেরটী ১৮০ ফিট প্রশস্ত। এই পরিখার তলদেশ হইতে বাহির প্রাচীরের শীর্ষদেশ অন্যূন ৬৫ ফিট, কিন্তু ভিতর প্রাচীরটী ১০৫ ফিট উচ্চ দেখিতে পাওয়া যায়। দুর্গমধ্যস্থ এই ভিতরের প্রাচীরে ১৬টী বুরুজ শোভা পাইতেছে। সেই বুরুজদিগের মধ্যে উত্তর দিকেরটী—শা-বুরুজ,দক্ষিণ সীমান্তেরটী—বাঙ্গালী বুরুজ,আর পূর্ব্ব প্রাচীরের মধ্যস্থানেরটী—সামানবুরুজ-নামে প্রসিদ্ধ, এতদ্ভিন্ন অপরাপর যতগুলি বুরুজ এখানে বর্ত্তমান আছে, তন্মধ্যে কেবল ভয়সা নামক বুরুজটীর সৌন্দর্য্য দর্শনযোগ্য।

এখানকার এই দুর্গের শোভা দর্শনেচ্ছুক যাত্রীগণকে প্রথমে দুর্গ-রক্ষক রাজপুরুষদিগের নিকট আবেদন করিতে হয়,আবেদন গ্রাহ্য হইলে তখন স্থানীয় নিয়মানুসারে একজন গাইড (পথপ্রদর্শক) উপস্থিত হন এবং তাঁহাদিগকে তিনি সঙ্গে লইয়া দুর্গের মধ্যস্থ দ্রষ্টব্যস্থানগুলির শোভা একে একে দেখাইয়া থাকেন। আবেদন মাত্র উহা গ্রাহ্য হইল দেখিয়া আমরা সন্তুষ্ট হইলাম, ইত্যবসরে একজন গাইড আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সর্ব্বপ্রথমেই তিনি আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া দুর্গের উত্তর প্রান্তের দিল্লী-গেট নামক ফটকের মধ্য দিয়া ভিতরে প্রবেশ করাইলেন।

এখানে একটী টানাপুল আছে, তাহার নীচে জলশূন্য পরিখা। সেই টানাপুলটী পার হইবামাত্র এক অপ্রশস্ত পথের সাহায্যে ফটক-বাড়ীর মধ্যস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এই স্থানের দক্ষিণদিকে যথায় বাঙ্গালী বুরুজ অবস্থিত, তথায় বাঙ্গালী-মহল নামে একটী মহল

দেখিতে পাওয়া যায়, অর্থাৎ বিদেশিনী বাঁদী ও বেগমদিগের ইহাই নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান ছিল বলিয়া—এই স্থানটী বাঙ্গালী-মহল নামে খ্যাত।

দুর্গটীর অত্যুচ্চ প্রস্তর প্রাচীর, গভীর পরিখা, স্তম্ভ-তোরণ, প্রসিদ্ধ মসজিদ, ফাঁসী-ঘর, ধনাগার, শীস-মহল প্রভৃতি যাহা কিছু নয়ন-গোচর হইবে, দর্শক-বৃন্দ উহাতেই আপন অর্থ ব্যয় ও পরিশ্রমের সার্থক হইল বিবেচনা করিবেন সন্দেহ নাই। কথিত আছে, পূর্ব্বে এই দুর্গস্থানে পাঠান বাদশাহদিগের "বদলগড়" নামক এক প্রকাণ্ড প্রাসাদ প্রতিষ্ঠিত ছিল,মোগল-সম্রাট আকবরশাহ সেই প্রাচীন প্রাসাদটী ১৫৬৫ খৃঃ ধ্বংস করিয়া তৎস্থানে প্রাচীর ও প্রাকার-বেষ্টিতপূর্ব্বক স্বীয় নৌ-সেনাপতি কাসিম খাঁর তত্ত্বাবধানে বিস্তর ধনরত্ন ব্যয় সহকারে ক্রমান্বয়ে আট বৎসর কাল পরিশ্রম স্বীকার করিয়া ইহাকে অপূর্ব্ব শোভায় সজ্জিত করেন। তৎপরে সেই আকবর শাহই ১৫৭৪ খৃঃ চিতোর অধিকার করিলে—চিতোরের সেই অজেয় কেল্লা হইতে একজোড়া প্রকাণ্ড ফটক লইয়া আগ্রার এই নব-প্রতিষ্ঠিত দুর্গ-মধ্যে সংলগ্ন করেন। এক্ষণে এই দুর্গমধ্যস্থ যে অংশটী জাহাঙ্গীর মহল নামে খ্যাত—উহা আকবর ও জাহাঙ্গীর বাদশাহের আমলে নির্ম্মিত হয়।

ইতিহাসপাঠে উপদেশ পাওয়া যায়, এই মহলের নির্ম্মাণ-প্রণালী তখন পাঠান, মোগল ও হিন্দুদিগের স্থাপত্য-বিস্তার প্রভাব পরিলক্ষিত হইত, সুতরাং সম্রাট সাজিহানের উহা অসহ্য হইয়াছিল; যথা-সময়ে তিনি সিংহাসন প্রাপ্ত হইলে—বহু অর্থ ব্যয়ে এই মহলটী সম্পূর্ণরূপে তিনি মুসলমান প্রণালীতে নির্ম্মাণ করান। মতি মসজিদ, দেওয়ান-ই-খাস, সামান-বুরুজ ইত্যাদি এই মহাত্মার আমলেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

দুর্গের উত্তরপ্রান্তে একটী তোরণ-দ্বার—ইহা হাতীপোল নামে

খ্যাত। কথিত আছে, সম্রাট আকবরশাহের রাজত্ব-কালে, তিনি উক্ত ফটকের অভ্যন্তরে দুইটী প্রকাণ্ড প্রস্তর-নির্ম্মিত হস্তীমূর্ত্তি স্থাপিত করেন; এই কারণে এ ফটকটী হাতীপোল নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। এক্ষণে ব্রিটিশগভর্ণমেণ্টের আদেশে সেই পূর্ব্ব নাম পরিবর্ত্তন হইয়া ইহা দিল্লীগেট নামে খ্যাত হইয়াছে। পূর্ব্বেই উল্লেখ হইয়াছে, আমরা সদলে প্রথমেই এই দিল্লীগেট দিয়াই দুর্গাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছিলাম।

দিল্লীগেটের দক্ষিণদিকে অমর-গেট নামে আর একটী দ্বার দৃষ্ট হয়। কথিত আছে যোধপুরের রাঠোর-বীর বিখ্যাত রাজা অমর সিংহ ১৬৪৪ খৃঃ একদা সম্রাট সাজিহানের দরবারে আমন্ত্রিত হইয়া অশ্বপৃষ্ঠে তাঁহার দেওয়ান-ই-আম নামক স্থানে উপস্থিত হন, কোনসূত্রে এই স্থানে সম্রাটের খাজাঞ্চি "সালাবৎখাঁর" সহিত তাঁহার বচসা হয়, ইহার ফলে— রাঠোরশ্রেষ্ঠ রোষভরে সম্রাটের সম্মুখেই সালামৎখাঁকে হত্যা করেন। সম্রাট তদ্দর্শনে অধীর হইয়া তাঁহার রক্ষি-সৈন্যদিগকে ইহার প্রতিশোধ লইবার জন্য ইঙ্গিত করেন; আজ্ঞাপ্রাপ্তে তাহারা একযোগে মহাবীর অমরসিংহকে আক্রমণ করিলে,—তিনি একা অসি-নিস্কাশন করিতে করিতে সেই অসংখ্য যোদ্ধাদিগের মধ্যে প্রবেশ করতঃ মূহুর্ত্ত্য মধ্যে দ্বাদশাধিক যোদ্ধাকে নিপাত করিয়া আপন বাহুবলের পরিচয় দিলেন, কিন্তু হায়! পরক্ষণেই সেই অগণিত সৈন্যবৃন্দের নিকট পরাজিত হইয়া তিনি অমরধামে প্রস্থান করিলেন।

সম্রাট সাজিহান এই মহাপ্রাণীর বীরত্ব স্বচক্ষে দর্শন করিয়া পুরস্কার স্বরূপ অমরসিংহের নাম চিরস্মরণীয় করিবার নিমিত্ত যে ফটকের নিকট তিনি নিহত হইয়াছিলেন, সেই ফটকটী জাঠোর রাজের নামানুসারে "অমরগেট" নামে খ্যাত করিয়া আপন মহত্ব প্রকাশ করিলেন। দুর্গের

পূর্ব্বপ্রান্তে যমুনার দিকে "দর্শনী-দরজা" নামে আর একটী দরজা দেখিতে পাওয়া যায়। এই দরজা সম্বন্ধে অবগত হইলাম—বাদশাহগণ এই দ্বারের উপর উঠিয়া যমুনাতীরস্থ পথে দণ্ডায়মান প্রজাদিগকে দর্শন দিতেন; এই কারণে এই দরজাটী দর্শনী-দরজা নামে খ্যাত হইয়াছে; এতদ্ভিন্ন তাঁহারা অবসর মত এই দর্শনী-দরজার নিম্নপ্রাচীরের মধ্যস্থ ভূখণ্ডে—হস্তী, ব্যাঘ্র, সিংহ, ভল্লুক প্রভৃতি হিংস্রজন্তুগুলিকে একত্র করাইয়া উহাদের ক্রীড়া কৌতুক দেখিয়া আমোদ অনুভব করিতেন। এইরূপে উপরোক্ত স্থানগুলির শোভা দর্শন শেষ হইলে, এই ফটক-বাড়ী পার হইবা মাত্র গাইডার—আমাদিগকে লইয়া দক্ষিণদিকের পথে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিলেন।

এই পথটী সমতলভূমি হইতে ক্রমান্বয়ে উচ্চে উঠিয়াছে, আবার তাহার দুই পার্শ্বে উচ্চ প্রস্তর-প্রাচীর বর্ত্তমান থাকিয়া স্থানটীকে শত্রু পক্ষের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতেছে; নির্দ্দিষ্ট এই স্থান হইতে দুইবার মোড় ফিরিবার পর, যে এক উচ্চ স্থানে লাল পাথরের ফটক আছে, যাহার উপরিভাগে মার্ব্বেল পাথরের বিস্তর কারুকার্য্য বিশিষ্ট নৈপুণ্য বিদ্যমান, যে স্থানে এক গম্বুজের শীর্ষস্থানে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের "ইউনিয়ন জ্যাক" নামক জয়-কেতন পতাকা গর্ব্বভরে উড়িতেছে, ঐ স্থানটীই হাতীপোল নামে খ্যাত।

হাতীপোলের পূর্ব্ব দক্ষিণ মুখে অল্পদূর অগ্রসর হইবা মাত্র, এক উচ্চ ভূখণ্ডের উপর প্রতিষ্ঠিত মতি-মসজিদের শোভা দেখিতে পাওয়া যায়। এখানকার এই রাস্তার উভয় পার্শ্বে সেনা-বারিক—সেই বারিকগুলিকে পশ্চাতে রাখিয়া অল্পদূর যাইলেই মতি-মসজিদের বেদা স্থানে উপস্থিত হওয়া যায়। দুর্গ-মধ্যস্থ এই মতি-মসজিদটী—অমল-ধবল শ্বেতপ্রস্তরে নির্ম্মিত, কিন্তু ইহার প্রাঙ্গণটী কেবল শ্বেতপ্রস্তরেই

মণ্ডিত। মধ্যস্থলে পাষাণমণ্ডিত জলাশয়, তাহার ঠিক মাঝখানে একটী শ্বেতপ্রস্তরের কৃত্রিম উৎস আপন শোভা বিস্তার করিয়া আছে; ইহার দক্ষিণ পূর্ব্বে চারি ফিট উচ্চ এক অষ্টভূজাকৃতি স্তম্ভোপরি সেকালের ঘটিকা যন্ত্র স্থাপিত। স্তম্ভের পূর্ব্ব পার্শ্বে কাষ্ঠনির্ম্মিত এক প্রকাণ্ড প্রবেশসৌধ শোভা পাইতেছে। এই সৌধের আবার উত্তর দক্ষিণদিকে খিলানকরা বারাণ্ডা, কি সুন্দর দৃশ্য! এখানকার চতুর্দ্দিকের সৌন্দর্য্য দেখিলে দর্শকবৃন্দকে আত্মহারা হইতে হয়। বারাণ্ডার নীচে অসংখ্য চোরা-কুঠরীগুলি নানা ধরণে নির্ম্মিত থাকায় সুন্দর শোভা বিস্তার করিয়াছে। এই স্থানের পশ্চিম পার্শ্বে খাস ভজনালয়। সেই ভজনালয়ের মেজে হইতে ছাদ পর্য্যন্ত সমস্তই শ্বেতপ্রস্তর নির্ম্মিত— প্রত্যেক প্রাচীর গাত্রে ভজন বেদী শোভা পাইতেছে; তাহার মধ্যস্থ ভজন-দালানের উভয় পার্শ্বে—এক একটী ছোট জেনেনা-ভজনালয় প্রতিষ্ঠিত; কি অদ্ভুত ব্যাপার! এই সকল ক্ষুদ্র ভজনালয় হইতে প্রধান ভজনাগারের সহিত একটী জানালাকার প্রাচীর দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রধান ভজনাগারে—কমবেশ পাঁচ ছয় শত ভজনকারী অক্লেশে একত্রে বসিয়া ভজনা করিতে পারেন; ইহার অভ্যন্তরটী সমস্তই শ্বেত-প্রস্তর নির্ম্মিত। এই নির্দ্দিষ্ট স্থানে কৃষ্টপ্রস্তরের লিপিতে যাহা খোদিত আছে, সঙ্গী গাইডের নিকট উপদেশ পাইলাম যে "সম্রাট সাজিহানের ছাব্বিশ বৎসর রাজত্বকালে তিনি অকাতরে তিন লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া সাত বৎসর সময়ে এই ভজনাগারটী নির্ম্মাণ করাইয়াছেন।" সাধারণের অবগতির নিমিত্ত উহাই এই লিপিতে খোদিত রহিয়াছে।

সম্রাট সাজিহান ১৬৫৪ খৃঃ বহুমুদ্রা ব্যয়সহকারে শ্বেত প্রস্তর ও মতি সংযোগে এখানে যে মসজিদ্ নির্ম্মাণ করান, উহাই মতি-মসজিদ্ নামে

খ্যাত। কথিত আছে সাজিহানের প্রিয়তমা মহিষী "সেলিমা বেগমের" ইহাই কবরস্থান। এই মসজিদের ছাদের উপর তিনটী সাদা মারবেল পাথরে নির্ম্মিত সুন্দর গম্বুজ আছে, তদোপরি আবার দুইটী গিল্টিকরা চূড়া শোভা পাইতেছে।

বিখ্যাত মতি মসজিদের"মতিমহল" নামক স্থান—শোভায় ও সম্পদে সকল মহলকে পরাজিত করিয়াছিল,কেননা এ মহলের অধিবাসী সাজিহানের নবপ্রণয়িনী সেলিমা বেগম আপন সৌন্দর্য্য ও মহত্ত্বগুণে অপরাপর বেগমদিগের কোমল প্রাণগুলিকে পলে পলে দগ্ধ করিতেছিলেন, তখন মম-তাজ নামক বেগম—সাজিহানের উপর ততটা আধিপত্য বিস্তার করিতে পারেন নাই; সুতরাং তাঁহার প্রিয়তমার কবর ও বাসস্থান যে অপূর্ব্ব শোভায় শোভিত হইয়াছিল, ইহা আর বিচিত্র কি? কথিত আছে সেলিমার জীবন-নিশাশেষ হইবার পর, মম-তাজের সুখসূর্য্য উদিত হয়। "মম-তাজ" সম্রাট সাজিহানের প্রিয়তমা বেগমের উপাধি মাত্র।

মতি মহলের দালানে—সেলিমা সুন্দরীর প্রত্যেক চিহ্নই বর্ত্তমান আছে। তাঁহার বীণা, মতি-মালা, পেশোয়াজ সমস্তই অবস্থান করিতেছে—কিন্তু সেলিমা সুন্দরী নাই, অর্থাৎ আধার রহিয়াছে—আধেয় নাই; প্রেম—বিদ্যমান আছে, কিন্তু প্রেমিক নাই; সুবাস আছে কিন্তু ফুল শুকাইয়াছে; সঙ্গীতের কাকলী আছে—কিন্তু সঙ্গীত নাই। এক্ষণে কেবল তাঁহার স্মৃতি এখানে বর্ত্তমান আছে। যে স্বর্গের ছবি প্রেমময়ী বেগমের নাম শুনিলে সম্রাট সাজিহান ক্ষিপ্তপ্রায় হইতেন—আজ সেই মতি-মহলে উপস্থিত হইয়া কেবল তাঁহার কবর স্থান দেখিলে কাহার না নেত্রজল পতিত হইবে?

মতি-মসজিদের দক্ষিণে—মিনাবাজারের পথ। এই পথের প্রাচীর

মধ্যস্থ স্থানে আবার যে এক ক্ষুদ্র পথ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারই সাহায্যে দেওয়ান-ই-আম নামক প্রাঙ্গণে যাইতে পারা যায়। দেওয়ান-ই-আম অর্থাৎ সাধারণ দরবার গৃহ। পূর্ব্ব কথিত মিনা-বাজারে কয়েকটী রক্তপ্রস্তর নির্ম্মিত কক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়; উপদেশ পাইলাম, পূর্ব্বে এই সকল কক্ষে আমীর ওমরাও এবং বেগমদিগের সুবিধার জন্য বাজার বসিত। বর্ত্তমানকালে ঐ সকল স্থানে তৎপরিবর্ত্তে কেবল সৈন্য-বাস হইয়াছে।

দেওয়ান-ই-আম নামক দরবার গৃহের উত্তর-দক্ষিণ ও পশ্চিম প্রাঙ্গণে উচ্চ প্রাচীর। সেই প্রাচীরের দক্ষিণপার্শ্বে "অঙ্গীরা বাগ" আপন শোভা বিস্তার করিয়া অতীত ঘটনার বিষয় সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে; ইহারই পশ্চাদ্ভাগে মচ্ছি-ভবন, অর্থাৎ দরবারকালে বেগমেরা এই স্থানে বসিয়া বাদশাহদিগের দরবার কার্য্য দর্শন করিয়া কিছু কিছু জ্ঞান লাভ করিতেন।

মচ্ছি-ভবনের মেজেটী—লাল পাথরের টালীতে আচ্ছাদিত; প্রত্যেক স্তম্ভগুলির উপরিভাগে পঙ্কের কারুকার্য্য শোভা পাইতেছে। মধ্যস্থলে মার্ব্বেল প্রস্তরের এক উচ্চ আসন—তাহার উপর শিল্প-নৈপুণ্য বিশিষ্ট সিংহাসন কক্ষ। এই কক্ষবৈঠকের উপর দাঁড়াইয়া যে স্থানে উজীর—বাদশার নিকট প্রজার আর্জ্জী পেশ করিতেন, সেই সিংহাসন স্থানটী দর্শন করাইবার সময়, সঙ্গী গাইড বলিলেন—পূর্ব্বে এই স্থানে রৌপ্যনির্ম্মিত একটী রেলিং সংস্থাপিত ছিল, এতদ্ভিন্ন বৈঠক হইতে সিংহাসনে উঠিবার একটী পৃথক রৌপ্যের সোপান, তদোপরি দুইটী রৌপ্যের সিংহমূর্ত্তি, সেই মূর্ত্তিদ্বয়ের উপর মণিমুক্ত সংযুক্ত থাকায় আলকোজ্জলে সেগুলি ঝক্ মক্ করিয়া রাজশ্রীর মহিমা প্রকাশ করিত; আবার সেই সিংহাসনের

মাথার উপর স্বর্ণছত্র উন্মুক্ত থাকিয়া সম্রাটের কীর্ত্তি ঘোষণা করিত। কিন্তু হায়! কালের কুটিল প্রভাবে এক্ষণে তাহার কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না, মাত্র সেই প্রাচীন শূন্য স্থানটি বর্ত্তমান থাকিয়া অতীত ঘটনার বিষয় সাক্ষ্য দিতেছে।

সিংহাসন-কক্ষে যে সোপান-শ্রেণী আছে, সেই সোপান বহিয়া উপরে উঠিলেই প্রকৃত বাদশাহ রঙ্গ-মহলে পৌছান যায়। এখানকার রঙ্গ-মহল এক অপূর্ব্ব দৃশ্য! এই দৃশ্য দর্শন করিলে—ঐন্দ্রজালিক বলিয়া ভ্রম হয়। আরব্য উপন্যাসে যে পরী-রাজ্যের বিষয় পাঠ করা যায়, ইহাকে সেই পরীর-প্রাসাদের সহিত তুলনা করিতে ইচ্ছা হয়। কি অদ্ভুত ব্যাপার! এই নির্দ্দিষ্ট স্থান ত্যাগ করিতে ইচ্ছা আর হয় না, কেবল মনে হয়—যত পারি, যতক্ষণ থাকিবার অবসর পাই, ততক্ষণ প্রাণ ভরিয়া কেবল এই স্থানেরই শোভা সন্দর্শন করি।

গাইড এই রঙ্গ-মহল হইতে আরও কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে আরোহণ করাইলে—এক অপ্রশস্ত কক্ষের মধ্য দিয়া মুক্ত প্রাঙ্গণের উপরিস্থিত বারাণ্ডায় উপস্থিত হইলাম, এখানে—তিন দিকে অলিন্দ, পূর্ব্বদিকে হামাম-শাহি, সিংহাসন-ছাদ ও খাস-মহলের শোভা দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাঙ্গণের নীচের তলে উত্তরপার্শ্বে মচ্ছি-ভবন গেট শোভা পাইতেছে। পূর্ব্বেই উল্লেখ হইয়াছে এই প্রকাণ্ড পিত্তলের গেটটী আকবরশাহ চিতোর দুর্গ জয় করিয়া এখানে স্থাপিত করিয়াছেন। বর্ত্তমানকালে এই গেটটী সতত বন্ধ থাকে।

সিংহাসন-স্থাপিত স্থানের দুই পার্শ্বে সারি সারি কয়েকটী ক্ষুদ্র কক্ষ ও কারুকার্য্যবিশিষ্ট বারাণ্ডা আপন শোভা বিস্তার করিয়া আছে—সেই বারাণ্ডার মধ্যে একস্থানে একজন গোরা সৈনিকপুরুষ খাতা কলম লইয়া যে সকল দর্শক ইহার মধ্যে প্রবেশ করেন, তাঁহাদিগের নাম

ধাম ঐ খাতায় লিখিয়া লন। আমরা এবার এখান হইতে উত্তর দিকে অগ্রসর হইয়া অমল-ধবল প্রস্তরনির্ম্মিত "নাগিয়া মসজিদের" প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলাম। মসজিদপ্রাঙ্গণটী শ্বেতমার্ব্বেল মণ্ডিত; মধ্য-স্থলে নানারঙ্গে রঞ্জিত মার্ব্বলপ্রস্তর নির্ম্মিত এক কৃত্রিম জলপ্রপাত অবস্থান করিয়া সম্রাটদিগের কীর্ত্তি কলাপের সাক্ষ্যপ্রদান করিতেছে। এই স্থানের প্রহরীরা কিছু লাভের আশায় সেই প্রাচীন জলপ্রপাতে জল ঢালিয়া দর্শক বৃন্দকে—পূর্ব্বে বাদসাহ ও বেগমেরা উপাসনার সময় কিরূপে হস্ত মুখ প্রক্ষালন করিতেন, তাহা দেখাইয়া থাকে।

নাগিনা-মসজিদের—মাথার উপর একটি বড় গম্বুজ, তাহার দুই পার্শ্বে দুইটি ছোট গম্বুজ এইস্থানের শোভা বিস্তার করিয়া আছে। এই মসজিদটি আয়তনে ছোট হইলেও ইহার গঠনপ্রণালী অতি সুন্দর। উপদেশ পাইলাম কেবল বেগমদিগের ভজনার নিমিত্তই ইহা প্রস্তুত হইয়াছিল। ইহার এক স্থানে জল গরম করিবার চুল্লী, চৌবাচ্ছা এবং জলাধার পর্য্যন্ত অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়।

মসজিদ স্থান হইতে আরও কিছু দূর অগ্রসর হইলে, আমরা সদলে হামাম-শাহি নামক চত্বরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এই নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে যমুনা ও তাজ-মহলের দৃশ্য স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়; তাহার পর বাদশাহদিগের স্নিগ্ধ বায়ুসেবন করিবার স্থান, মন্ত্রি বসিবার আসন প্রভৃতি দ্রষ্টব্য স্থানগুলি একে একে দর্শন শেষ করিয়া "দেওয়ান-ই-খাস" নামক দরবার-গৃহের শোভা দর্শনের জন্য প্রস্তুত হইলাম।

দেওয়ানি-ই-খাস অতি রমনীয় শ্বেতপ্রস্তরে নির্ম্মিত, তাহার নিম্ন-তলে শীস-মহল অবস্থিত। শীস-মহলের সন্নিকটেই খাস-মহল, সাতাহানী-মহল প্রভৃতি মনোহর রাজপ্রাসাদগুলি প্রতিষ্ঠিত আছে। শিল্পামোদী বিলাসী সাজিহান স্বেচ্ছায় বহু ধন ও রত্ন ব্যয়সহকারে এই সমস্ত

নয়নানন্দ সৌন্দর্য্যশালী অপূর্ব্ব দৃশ্যময় বিলাস-নিকেতন নির্ম্মাণ করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন। এরূপ উৎকৃষ্ট নিকেতন এক তাজ-মহল ও দিল্লীনগরের প্রাসাদের ভিতর দেওয়ান-ই-খাস ভিন্ন আর কোথাও আছে বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায় না। কথিত আছে দেওয়ান-ই-খাসে বাদশাহেরা—রাজা, মহারাজা, আমীরওমরাহ ও বৈদেশিক দূতগণের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন, এতদ্ভিন্ন এই স্থানে তাঁহাদের প্রধান প্রধান অমাত্যদিগের সহিত রাজ্য-সংক্রান্ত গুপ্ত পরামর্শ করিতেন।

আগ্রার এই দেওয়ান-ই-খাসের পশ্চাৎদিকে যে একটী পথ দেখিতে পাওয়া যায়, ঐ পথের প্রাচীর গাত্রের গবাক্ষ দিয়া নিম্নভাগে দৃষ্টিপাত করিলেই "শীস-মহল" দেখিতে পাওয়া যায়। গাইডের নিকট উপদেশ পাইলাম পূর্ব্বে বাদশাহেরা এই পথের সাহায্যে সামান ও খাস-মহলে গমনাগমন করিতেন। সামান-মহলটী দুর্গ প্রাচীরের সম্মুখস্থ বুরুজের উপরিভাগে অবস্থিত। সামান—অর্থে চামেলী পুষ্প। কথিত আছে নূরজাহান ও মম-তাজ ইহাঁরা চামেলীপুষ্পের ন্যায় সুন্দরী ছিলেন, এ কারণে যে মহলে তাঁহারা বাস করিতেন, সম্রাট—প্রীতমনে সেই মহলটীকে সামান-মহল নামে খ্যাত করিয়াছিলেন। এই সামান-মহলের বারাণ্ডা, হল, কক্ষ প্রভৃতি সমস্তই শ্বেতপ্রস্তর মণ্ডিত। এই সমস্ত কক্ষ-দেওয়ালের গায়ে জামার-জেবের মত বিস্তর গহ্বর দেখিতে পাওয়া যায়, অবগত হইলাম, পূর্ব্বে বেগম ও সাহাজাদিরা এ মহলে অবস্থান করিবার সময়, এই সকল গহ্বরে তাঁহাদের মূল্যবান দ্রব্য-সামগ্রী রক্ষা করিতেন। আগ্রা দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিয়া যিনি এই সমস্ত স্বর্গতুল্য স্থানের শোভা দর্শন না করিয়াছেন, তাহার সকল পরিশ্রম ও অর্থব্যয় ব্যর্থ হইয়াছে বলিতে হয়।

সামান-মহলের অপর নাম রূপসী-মেলা। মোগল সম্রাটদিগের রাজত্বকালে এ মহলে সেই রূপসীদিগের মুখ—সূর্য্যদেব কখন দেখিতে পান নাই, নীল আকাশ দেখিতে পাইত না, মুক্ত প্রকৃতি দেখিতে পাইত না, উন্মুক্ত বাতায়নে প্রবিষ্ট পুষ্পবাসিত মলয় বায়ু কেবল অবসর মত গোপনে এক আধবার আসিয়া এই সকল সুন্দরীদিগের অলকা লইয়া খেলা করিত এবং একটু সুগন্ধি নিশ্বাস চুরি করিয়া লইয়া বাহিরের উদ্যানে ফুলের গন্ধের সহিত উহা ছাড়িয়া দিত।

ঝাড়ের পাশে ঝাড়, দর্পণের পাশে দর্পণ, ফুলের মালার ঝালরের মধ্যে মধ্যে মতি-খচিত লাল, নীল, সবুজ, ফিরোজা ও বাদামী রঙ্গের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পতাকা সকল আপন শোভা বিস্তার করিয়া আছে, এতদ্ভিন্ন কোথাও লক্ষ্ণৌ সহরের নবাব বাড়ীর ন্যায় স্বর্ণপাত্রে—নাগ কেশরগুচ্ছ, কোথাও রূপার উপর সোণার কাজকরা ফুলদানীতে গন্ধরাজ ও গোলাপরাশি, কোথাও কার্ণিসের উপর স্তম্ভ হইতে স্তম্ভান্তরে দোলায়িত বেলা ও বন মল্লিকার হার, কোথাও স্বর্ণখচিত ফোয়ারায় বাঘের মুখ হইতে শীতল গোলাপের উৎস বহিতেছে আবার কোথাও বা ভীমরাজ, পাপিয়া, ময়না, কাকাতুয়া, সোণার দাঁড়ে বসিয়া মনের সুখে বুলি ছাড়িতেছে। এইরূপ কতপ্রকার অদ্ভুত ও আহামরি দৃশ্য এখানে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার ইয়ত্তা নাই।

খাস-মহল—ইহার অপর নাম আরাম-বাগ। আরাম-বাগের উত্তরে—সামান-মহল, দক্ষিণে—সাহাজানী-মহল, পশ্চিমে—অঙ্গুরী-বাগ প্রতিষ্ঠিত। এই খাস-মহলের গোসল-খানার নাম শীস-মহল। অঙ্গুরী-বাগের উত্তর-পূর্ব্বদিকে দেওয়ান-ই-খাসের নিম্নতলে শীস-মহল স্থান পাইয়াছে।

শীস-মহলের মধ্যে দুইটী কক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়, এই উভয়

কক্ষের মধ্যেই উৎসাদি শোভিত কৃত্রিম জলাশয় বিদ্যমান। কক্ষের সেই দেওয়ালে নানাপ্রকার পত্রপুষ্প অঙ্কিত কিন্তু অন্ধকারময়, এতদ্ভিন্ন চুণ-বালির কাজের উপর অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নানাবর্ণের কাচখণ্ড প্রোথিত থাকায়—এই স্থান এক অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে। সঙ্গী গাইড আমাদিগকে এই অন্ধকার গৃহের সৌন্দর্য্য দেখাইবার নিমিত্ত স্বীয় জামার পকেট হইতে দেয়াশলাই বাহির করিয়া যখন জ্বালিতে লাগিলেন, তখন চারিদিকের আলোকরশ্মি সেই দেওয়ালের কাচখণ্ড গুলিতে প্রতিফলিত হইয়া চঞ্চলার ন্যায় যেন ছুটাছুটি করিতে লাগিল। এ দৃশ্য যিনি দেখিয়াছেন তিনিই মুগ্ধ হইয়াছেন সন্দেহ নাই। এরূপ অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যশালী স্নানাগার ভারতবর্ষ মধ্যে আর দ্বিতীয় আছে বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায় না। এখানকার এই সকল স্থাপত্য-নৈপুণ্য নয়ন-গোচর করিয়া অনুমান করিলাম, পূর্ব্বে এই শীস-মহলের জলাশয়ে যখন বেগম সুন্দরীগণ জলক্রীড়া করিতেন এবং কক্ষস্থিত দোদুল্যমান ঝাড়ের আলোকে আলোকিত সহস্র মুকুরে সহস্র কাচখণ্ডে সেই সমস্ত সুন্দরীদিগের দেহলতার প্রতিবিম্বগুলি প্রতিফলিত হইত, তখন এই কক্ষ যে কি এক অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিত, উহা লেখনীর দ্বারা ব্যক্ত করা যায় না।

শীস-মহলের পরই দোষী বাঁদী ও বেগমদিগকে যে স্থানে ফাঁসী দেওয়া হইত, সেই ভয়াবহ বধ্যভূমি অবস্থিত, অদ্যাপি উহা নয়নগোচর হইলে শরীর কণ্টকিত হইতে থাকে। বধ্যভূমিতে উল্লেখযোগ্য এমন কোন দর্শনীয় পদার্থ নাই। ফাঁসী-মহল হইতে জাহাঙ্গীর-মহলের সৌন্দর্য্য দর্শন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, গাইড সন্তুষ্টচিত্তে আমাদের সকলকে তথায় লইয়া গেলেন। বলা বাহুল্য তাহার ব্যবহারে আমরা সকলেই অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়াছিলাম।

সম্রাট জাহাঙ্গীরের সুন্দরী বেগম যোধবাই, যোধপুরের বিখ্যাত

রাজা মলদেবের পৌত্রি ছিলেন, তাঁহার গর্ভধারিণী অম্বরের রাজা—বেহারীমলের কন্যা এখানে মরিয়ম-জামানী নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। কথিত আছে এই সকল মাননীয় হিন্দু ললনাদিগের মনরঞ্জনের নিমিত্ত তাঁহারা যে মহলে অবস্থান করিতেন, সম্রাট সেই মহলটী তাঁহাদেরই পছন্দানুযায়ী অনেকটা হিন্দু প্রণালীতে নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। এই হিন্দু মহলের মধ্যে বেগম সুন্দরী "যোধবাইয়ের" মহলটীর শিল্পমাধুর্য্য দর্শন করিলে দর্শকমাত্রকেই আত্মহারা হইতে হইবে। আগ্রার এই কেল্লা মধ্যে যে সমস্ত অদ্ভুত অদ্ভুত ও সুন্দর বস্তু আছে, উহা একে একে বর্ণনা করিলে পৃথক একখানি প্রকাণ্ড পুস্তক হয়, এবং যাবতীয় দৃশ্যগুলি দেখিতে হইলে অন্যূন সপ্তাহকাল সময়ও আবশ্যক হয়। সে যাহাহউক, আমরা অল্প সময়ের মধ্যে এইরূপে এখানকার এই অদ্ভুত দুর্গ-শোভা যৎকিঞ্চিৎ উপভোগ করিয়া, শেষে দক্ষিণদিকের সেই পরিচিত অমর-গেট নামক ফটক দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলাম। তৎপরে সঙ্গী গাইডের নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক স্থানীয় চক্-বাজারের শোভা দেখিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম।

আগ্রার চক্।

আগ্রার চক্-বাজার—এক অপূর্ব্ব দৃশ্য! এখানে চৌকবাজার নামে যে স্থান বিদ্যমান, উহাই চক্ নামে খ্যাত। ক্রেতা বিক্রেতার শুভাগমনে ও ফিরিওয়ালাদের নানাপ্রকার কড়া বুলিতে ইহাকে সতত বেশ জমজমাট ও সরগরম অবস্থায় রাখিয়াছে, বিশেষতঃ সন্ধ্যার পর সুসজ্জিত দোকান ঘরগুলির আলোকমালায়—বাজারের শোভা অতি মনোহর! এই চকের প্রায় সকল রাস্তাগুলিই পাষাণ-মণ্ডিত, তাহার উভয়পার্শ্বে দ্বিতল ও ত্রিতল অট্টালিকাশ্রেণী গর্ব্বভরে উচ্চশিরে আপন শোভা বিস্তার করিয়া আছে; তাহার নিম্নতলের পথিপার্শ্বে আলোক-

মালা-সজ্জিত সারি সারি বিপণী। এইস্থানে কার্পেট, সতরঞ্জ, গালিচা, পাথরের খেলনা, এতদ্ভিন্ন আতর, গোলাপ, নানা ধরণের ছড়ি, মালা ও জুতা প্রভৃতি থরে থরে সজ্জীকৃত থাকায় স্থানটী এক অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে, বিশেষতঃ এ বাজারে যে সকল খাবারের দোকান স্থাপিত আছে, তাহাতে মালাই, রাবড়ী, ডালবুট, পাপর, চানা প্রভৃতি স্তূপাকারে সজ্জিত, এতদ্ভিন্ন ফেরিওয়ালারা আবার আচার, দ'য়ে বড়া প্রভৃতি বিক্রয়ের জন্য—কত প্রকার যে ছড়া আওড়াইয়া থাকে, তাহার ইয়ত্তা নাই; ইহা ব্যতীত এই চক্ বাজারে অসংখ্য খিলিপানের দোকান দেখিতে পাওয়া যায়, ঐ সকল প্রত্যেক দোকানে এক একখানি বৃহৎ আয়না শোভা পাইতেছে; মধ্যে মধ্যে দ্বিতলের ঝাড়ালোকে সুসজ্জিত গণিকা ও বাইজীদিগের কক্ষ হইতে ওস্তাদ এবং সেই বাইজীদিগের সু-কণ্ঠস্বর, তৎসঙ্গে তবলার সুমধুর তান শুনিতে পাওয়া যায়।

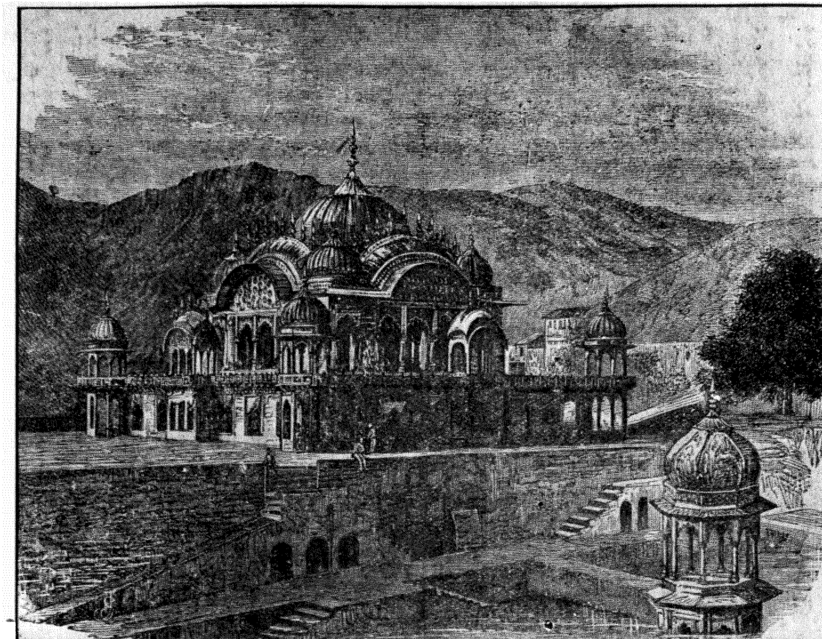
মধুমক্ষিকা যেরূপ মধুভরা ফুলের সান্নিধ্যে ঘুরিয়া বেড়ায়, সৌখিন-সু-বেশধারী যুবকের দল সেইরূপ ঐ সকল কক্ষের নিকটস্থ খিলি পানের দোকানের সম্মুখে পানের আবশ্যক না থাকিলেও, যুবতী গণিকাদিগের সুন্দর মুখখানি দর্শনের কাঙ্গাল হইয়া, একদৃষ্টে ঘুরিতেছে দেখিতে পাইবেন; ফলকথা এই নির্দ্দিষ্ট চক-বাজার সততই জমজমাট অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়।

আগ্রায় চক-বাজারে যিনি একবার প্রবেশ করিবেন, তাঁহাকে এই সমস্ত সৌখিন দ্রব্য সামগ্রী দেখিলেই কিছু না কিছু খরিদ করিতেই হইবে, কারণ এখানে হিরা, মুক্তা হইতে গৃহস্তের ব্যবহারোপযোগী সমস্ত দ্রব্যই বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। এইরূপে চক বাজারের শোভা নয়নগোচর করিয়া এখান হইতে ভরতপুরের রাজবাটীর সৌন্দর্য্য দর্শনের নিমিত্ত প্রস্তুত হইলাম।

ভরতপুর।

আগ্রা হইতে ভরতপুর কিম্বা জয়পুর রাজবাটীর সৌন্দর্য্য দর্শন করিতে যাইতে হইলে বোম্বাই-বরদা মধ্য-ভারত রেলের রাজপুতানা মালোয়া শাখা রেলের ছোট লাইন দিয়া যাইতে হয়। যাঁহারা আগ্রা হইতে সরাসর জয়পুর যাইবেন, তাঁহারা আগ্রা হইতে বাঁদিকুই নামক জং ষ্টেশনে গাড়ী বদল করিয়া দিল্লী হইতে যে ডাকগাড়ী এখানে আসে, উহাতে আরোহণ করিলে নির্ব্বিঘ্নে জয়পুরে পৌছিতে পারিবেন। আগ্রা হইতে জয়পুর ১৫০ মাইল দূরে অবস্থিত।

ভরতপুর—আগ্রা সহরের পশ্চিমে ৩২ মাইল দূরে অবস্থিত। এই নগরের চারিদিকে মাটীর দেওয়াল, গভীর গড়খাই; নগর-প্রাচীরটী অত্যন্ত উচ্চ ও প্রশস্ত। ইহার বেড় কমবেশ চারিক্রোশ। নগরের গড়খাই সতত জলে পরিপূর্ণ থাকে। ইংরাজ-সেনাপতি লর্ডলেক্ ১৮০৫ খৃঃ ভরতপুর আক্রমণ করেন, কিন্তু বহুকালব্যাপী যুদ্ধের পরও তিনি নগরটী দখল করিতে পারেন নাই, কথিত আছে এই যুদ্ধে তিনি নানা বিষয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া সন্ধি প্রার্থনা করেন; তৎপরে লর্ড কম্বারমোর পুনরায় ১৮২৭ খৃঃ অমিত-বিক্রমে এখানে যুদ্ধযাত্রা করিয়া নগরটী সম্পূর্ণরূপে দখল করিয়া লন।



আলোয়ারের স্বর্গীয় মহারাজ বক্তিয়ার সিংহের সমাধি মন্দিরের দৃশ্য। [১৮৯ পৃষ্ঠা।]

Sulov Press, Calcutta.

আলোয়ার—ভরতপুরের উত্তর পশ্চিম রাজধানী। ইহা রাজ্যের মধ্যস্থলে অবস্থিত। নগর হইতে এক উচ্চ পাহাড়ের উপরে তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত দুর্গটি স্থাপিত। দুর্গের লাগাও রাজবাটী, এই রাজবাটীর ছাদের উপর উঠিলে নগরের চতুর্দ্দিকের দৃশ্য সমস্তই দেখিতে পাওয়া যায়। ভরতপুর রাজ্য হইতে এই নগরটী ১৭৯৭ খৃঃ ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের অধীন হইয়াছে। এথানে উপস্থিত হইলে স্বর্গীয় মহারাজ বক্তিয়ারসিংহের সমাধিমন্দিরের শোভা দেখিতে ভুলিবেন না। পাঠকবর্গের প্রীতির নিমিত্ত সেই ভুবনবিখ্যাত সমাধিমন্দিরের একখানি চিত্র প্রদত্ত হইল।

বর্ত্তমান শতাব্দীর আরম্ভে, আলোয়ার নগরের ১৭ মাইল দূরে লাশওয়ারি নামক স্থানে মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের যে মহাযুদ্ধ উপস্থিত হয়, সেইযুদ্ধে ইংরাজ সেনাপতি,—আলোয়ারের মহারাজ ব্যক্তিয়ারসিংহের সাহায্য প্রার্থনা করেন, তাঁহারই সাহায্যে লর্ড লেক—সিন্ধিয়ার সৈন্যদিগকে পরাস্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

জয়পুর।

আলোয়ারের দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকে জয়পুর অবস্থিত। রাজপুতানার মধ্যে এরূপ বৃহৎ সমৃদ্ধিশালী এবং সুন্দর সহর আর দ্বিতীয় নাই। ভরতপুর হইতে জয়পুর ১১৮ মাইল দূরে অবস্থিত। এই প্রশস্থ পথ রেলযোগে অতিক্রম করিবার সময় স্থানীয় কালীখো নামা আরাবলির শাখা পর্ব্বতমালা রেল লাইনের উত্তর পার্শ্বে অর্থাৎ সমতল ভূমি হইতে সিন্ধু দেশ পর্য্যন্ত যেন নিশাচর রাক্ষসের মত দণ্ডায়মান রহিয়াছে, তাহার মধ্যে আবার ঝাঁকে ঝাঁকে ময়ূর ময়ূরীগণ এবং পালে পালে হরিণ হরিণী শাবকগণসহ আপন দল পুষ্টি করিয়া মনের আনন্দে ক্ষেত্র প্রান্তরে ইতস্ততঃ ধাবমান হইতেছে দেখিতে পাইবেন। পূর্ব্বে

যে স্থানে কত সহস্র সহস্র খ্যাতনামা বীরপুরুষদিগের বাসস্থান ছিল, এক্ষণে তৎপরিবর্ত্তে সেই স্থানে কেবল অসংখ্য বন্যজন্তু সকল বিচরণ করিতেছে, এবং সমতল ক্ষেত্রের বদলে কেবল পর্ব্বতমালা দেখিতে পাওয়া যায়! রেলগাড়ীর ভিতর হইতে এই সকল প্রাকৃতিক দৃশ্য নয়নগোচর করিতে করিতে যথাসময় রাত্রি ৯ ঘটিকার পর ট্রেণখানি জয়পুর ষ্টেশনে উপস্থিত হইবা মাত্র, যাত্রীগণ একে একে ট্রেণ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক আপনাপন গন্তব্য স্থানে গমন করিতে লাগিলেন। আমরা ষ্টেশনে অবতরণ করিয়া কোথায় কিরূপ বিশ্রাম স্থান সংগ্রহ করিব এইরূপ চিন্তা করিতেছি, এমন সময় সন্ধান পাইলাম, এই রেল ষ্টেশনের অনতিদূরে ঠাকুর ফতেচাঁদের একটী ধর্ম্মশালা স্থাপিত আছে। তিনি অকাতরে বহু অর্থব্যয় করিয়া বিদেশী যাত্রীদিগের বিশ্রামের সুবিধার জন্যই এই ধর্ম্মশালাটী নির্ম্মাণ করাইয়া আপন কীর্ত্তি স্থাপিত করিয়াছেন। এইরূপ সন্ধান পাইয়া উক্ত ধর্ম্মশালায় যাইবার নিমিত্ত ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া হইল; ষ্টেশন হইতে তথায় যাইবার জন্য প্রত্যেক গাড়ীখানির ভাড়া চারি আনা ধার্য্য হইল। এইরূপে তথায় যাইবার জন্য গাড়ীগুলি ষ্টেশন পার হইয়া কিয়দ্দূর অগ্রসর হইবা মাত্র, স্থানীয় পুলিসের প্রহরীগণ আমাদের বাক্স ও পুলিন্দায় নূতন বস্ত্র আছে কিনা, তাহার সন্ধান করিবার অছিলায় ভয় দেখাইয়া কিছু দক্ষিণা আদায় করিয়া লইল। সে যাহাহউক সেই গাড়ীর সাহায্যে এবার নির্ব্বিঘ্নে বরাবর নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মশালায় উপস্থিত হইলাম।

ধর্ম্মশালাটী দ্বিতল; ইহার সম্মুখ ও পশ্চাতে একটী প্রকাণ্ড ফাঁকা মাঠ, আবার এই সরাইখানার নীম্নে মুদির দোকান সজ্জিত থাকায়, যাত্রীরা তথায় অক্লেশে সমস্ত আবশ্যকীয় আহার্য্য সামগ্রী সংগ্রহ করিতে পারেন। এই সকল সুবিধা দেখিয়া সে রাত্রি

ঐ স্থানেই বিশ্রাম করিবার বন্দোবস্ত করিলাম। এই ধর্ম্মশালায় অবস্থানের জন্য প্রতি রোজ প্রতি যাত্রীকে ৵০ আনা হিঃ ভাড়া দিতে হয়। পরদিন জয়পুর সহরের সৌন্দর্য্য দর্শন করিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। ধর্ম্মশালা হইতে রাজবাড়ীর পদপ্রান্তে যাইবার জন্য পরদিন যথাসময়ে আবার ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া হইল, প্রত্যেক গাড়ীগুলি এবার বার আনা হিসাবে ভাড়া চুক্তি হইল। এখানে পাল্কীগাড়ী অপেক্ষা বগী-ফেটিং গাড়ীই অধিক। জয়পুরে বহু সম্ভ্রান্ত অধিবাসীরাই সহরতলীতে বাস করিয়া থাকেন, পথিমধ্যে বিস্তর বাগানবাড়ী,—তথায় রাজপুত স্ত্রী পুরুষদিগের আকৃতি দেখিতে দেখিতে যথাসময়ে নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইলাম।

সহরতলী হইতে জয়পুর সহরের শোভা কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না, কারণ এ সহরটী যেন চারিদিকের গাছপালার মধ্যে অত্যুচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত হইয়া লুকাইয়া আছে। সহরের তিনদিকে উন্নত শৈলমালা, কেবল দক্ষিণদিকটী সমতল প্রান্তরে পরিণত। সহরের পশ্চিমপ্রান্তে স্বয়ম্বর নামে এক হ্রদ আছে, প্রতি বৎসর এই হ্রদ হইতে ৯ লক্ষ মণ লবণ উৎপন্ন হইয়া থাকে। রাজপুতানা অঞ্চলে সেই লবণের আদর অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ত্তমান সহর হইতে প্রায় এক ক্রোশ দূরে আমান-ই-সাহি নাম্নী একটী ক্ষুদ্র নদী আছে, অবগত হইলাম কলের সাহায্যে উহা হইতে জল সংগ্রহ করিয়া সমস্ত সহর মধ্যে সেই জল সরবরাহ হইয়া থাকে। জয়পুর সহরের লোকসংখ্যা কমবেশ নয় লক্ষ যাট হাজার; এখানে যতগুলি অধিবাসী আছেন, তন্মধ্যে শতকরা ৭০ জন হিন্দু।

জয়পুর সহরের ইতিহাস।

জয়পুর রাজ্যের প্রতিষ্ঠাকারী মহারাজ "সওয়াই জয়সিংহ" নামে জনসমাজে পরিচিত ছিলেন। সওয়াই জয়সিংহ মোগল সম্রাট ঔরঙ্গ-জেবের রাজত্বকালের শেষভাগে জয়পুর সিংহাসনোপরি আরোহণ করেন। রাজপুতানা অঞ্চলের মধ্যস্থলে আর্ব্বলীপর্ব্বতমালা অবস্থান করিয়া দেশটীকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া দিয়াছে। ইহার পশ্চিম ভাগের অনেক স্থান বালুকাময় মরুভূমি ও গিরিশ্রেণী অদ্যাপি আপন প্রভাব বিস্তার করিয়া আছে। অনেকস্থলে রাজ-পুতেরা আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দেন। ইহার বিশেষ কারণ এই যে, ধুন্ধর রাজার ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়, জয়পুর সহরের উত্তর-পূর্ব্বের অনতিদূরে ধুন্ধনদের সন্নিকট "গলত" নামক কোন পর্ব্বতের গুহায় ধুন্ধ নামে এক ভয়ঙ্কর রাক্ষস বাস করিত। সেই অদ্ভুতকর্ম্মা রাক্ষসের নামানুসারে ঐ অঞ্চলের নাম ধুন্ধর হইয়াছে। ধুন্ধর জনপদের রাজধানীর নাম "দেওনা", সেই সময় ঐ স্থানে বার-গুজার বংশীয় যে রাজারা রাজত্ব করিতেন, তাঁহারাই রাজপুত নামে খ্যাত। কথিত আছে, উহারা সূর্য্যবংশীয় শ্রীরামচন্দ্রের-পুত্র লবের সন্তান। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে কুশোয়া বংশোদ্ভুত ধবল রায় দেওশার অপুত্রক রাজার একমাত্র কন্যাকে বিবাহ করিয়া তিনিযৌতুকস্বরূপ ধুন্ধরের রাজ্যটী প্রাপ্ত হন। বলা বাহুল্য যে রাজা ধবলরায় ও শ্রীরামচন্দ্রের-পুত্র কুশের বংশোদ্ভুত, সুতরাং ইহাঁরা কুশোয়া নামে জনসমাজে পরিচিত। এই কুশোয়ারা কোন বিশেষ কারণ বশতঃ যখন পৈতৃকরাজ্য অযোধ্যা নগর ত্যাগ করেন, তখন তাঁহারা প্রথমে শোন নদীর তীরস্থ রোহি-তাস্বগর্ভে আপন রাজ্য স্থাপন করেন; তৎপরে ২৯৫ খৃঃ নিষধে তাঁহাদের

রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। পুরাণের প্রসিদ্ধ নিষধরাজ্যে ধার্ম্মিকপ্রবর নল রাজার ন্যায় তথায় আর একজন খ্যাতনামা রাজা ছিলেন। এই নল হইতে ৩৩ পুরুষ পরে "বক্সবাক-তেজকরণের" পিতা শূরসিংহের মৃত্যুর পর, তিনি তাঁহার পিতৃব্য কর্ত্তৃক রাজ্যচ্যুত হন। কথিত আছে তাঁহার জননী সেই সঙ্কটময় সময় গুপ্তভাবে স্বীয় পুত্রকে লইয়া ধুন্ধর রাজ্যের খোগাং নামক স্থানে উপস্থিত হইয়া নিরাপদে অবস্থান করিতে লাগিলেন। বর্ত্তমান তেজপুর নামক সহরের তিন ক্রোশ দূরে এই খোগাং গ্রাম অবস্থিত; প্রবাদ—সেই সময় ঐ স্থানে মীনা নামক পার্ব্বত্য বনজাতির রাজত্ব ছিল। মহাভারত পাঠে জানিতে পারা যায়—সেই মিনাদিগের রাজা "বালুন সিংহ" সদয় হইয়া সেই নল-রাজার বংশধর ধবল রায়কে আশ্রয় প্রদান করেন। ধবল রায় এইরূপে আশ্রয় পাইয়া একদা কোন বিশেষ কারণ বশতঃ তাহার আশ্রয়দাতার প্রাণ সংহার করিয়া স্বয়ং খোগাং রাজ্যটী দখল করিয়া লন; তৎপরে মহাবীর্য্যশালী ধবল রায়ের পুত্র "দৈল রায় শশবং" ১১৫০ খৃঃ আবার মীনাদিগের নিকট হইতে অম্বর নামক রাজ্যটী আপন বাহুবলে দখল করেন। এই অম্বর ও খোগাং নগর বর্ত্তমান জয়পুর সহরের তিন ক্রোশ দূরে অবস্থিত।

কুশোবংশোদ্ভূত রাজা জয়সিংহ ১৭২৮ খৃঃ তাঁহার এক বাঙ্গালী মন্ত্রীর মন্ত্রণায় বর্ত্তমান সহরটী নূতন কলেবরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, কারণ তাঁহাদের বিশ্বাস রাজপুত রাজবংশধরদিগের এক নগরে ছয় শত বৎসরের অধিক কাল বাস করিতে নাই! সেই কারণেই এই নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া মহারাজ জয়সিংহ তাঁহার প্রাচীন রাজ্য "অম্বর" ত্যাগ পূর্ব্বক এখানে নূতন রাজ্য স্থাপন করিয়া তাঁহারই নামানুসারে ঐ সহরের নাম "জয়পুর" নামে প্রসিদ্ধ করেন। সহরের মধ্যস্থলে রাজবাটী। পথঘাট সুশৃঙ্খলাযুক্ত এবং প্রশস্ত, মন্দির, মসজিদ এবং দোকানগুলি অতি-

সুন্দর। সহরের অধিকাংশ বাটীগুলি প্রস্তর নির্ম্মিত। প্রধান প্রধান রাস্তাগুলি কলিকাতা সহরের ন্যায় প্রস্তরময় ও গ্যাসের আলোকে আলোকিত হইয়া থাকে।

মহারাজ জয়সিংহ স্বয়ং একজন বিখ্যাত জ্যোতিষী ও গণিত শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত ছিলেন, এই নিমিত্ত তিনি দিল্লী, কাশী, মথুরা, উজ্জয়িনী (রাজা বিক্রমাদিত্যের রাজধানী) ও আপন প্রাসাদের মধ্যবর্ত্তী স্থানে মানমন্দির নামক যন্ত্রবাটী স্থাপিত করাইয়া স্বীয় বিদ্যাবুদ্ধির কৌশলের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। জয়পুর সহরটীকে স্থিরচিত্তে মনোযোগ পূর্ব্বক দেখিলে মনে হয়—যেন তিনি জ্যামিতিক আকৃতিতে ইহাকে আঁকিয়া নির্ম্মাণ করাইয়াছেন।

জয়পুর সহরের দ্রষ্টব্য স্থান—

১। রাম-নিবাস ও হাওয়া-মহল, ২। জয়পুর কলেজবাটী, ৩। আজমীঢ় ফটকের নিকট মহারাজের পশুশালা, ৪। শিল্পবিদ্যালয়, ৫। সহরের উত্তর-পূর্ব্বদিকে গেটোরের রাজ-সমাধিক্ষেত্র, ৬। শ্রীশ্রীগোবিন্দ ও গোপীনাথজীউর দেবালয়, ৭। গেটোরে জয়পুরের কুশোয়া রাজাদিগের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া স্থান, ৮। গতলা-পাহাড়, ৯। অম্বর দুর্গ, ১০। যশোরেশ্বরীর দেবালয়, ১১। দেওয়ান-ই-খাস, ১২। চক বাজার ১৩। হাওয়া-মহল ইত্যাদি।

ধর্ম্মশালা হইতে ঘোড়ার গাড়ীগুলি প্রথমে বৃক্ষাদি শোভিত এই প্রশস্ত রাস্তার উপর দিয়া সহরের চাঁদ-পোল নামক ফটকের ভিতর প্রবেশ করিল; সহরটী যে উচ্চপ্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত, সেই প্রশস্ত প্রাচীর মধ্যে প্রাসাদে যাইবার সাতটী ফটক দেখিতে পাওয়া যায়; সকল ফটকের বহির্ভাগে একটা দরজা আর সেই প্রাচীর বেষ্টিত দেউড়ীর

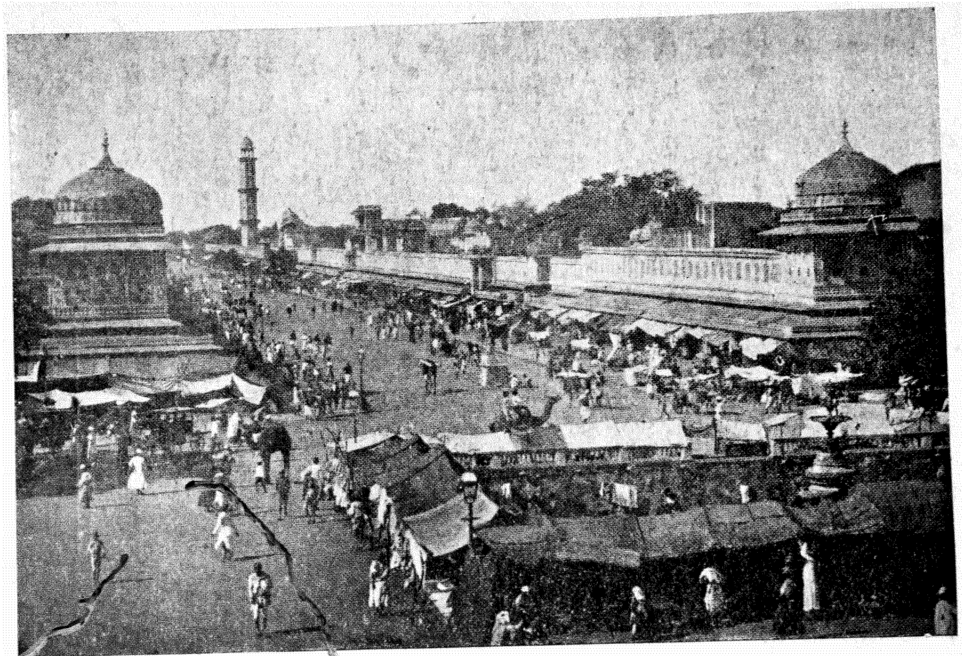
উপর পার্শ্বে সহরেরদিকে আর একটী পৃথক দরজা দৃষ্ট হইয়া থাকে। চাঁদ-পোল ফটকের দেউড়ীর চতুর্দ্দিকে ২০ ফিট উচ্চ এবং ৯ ফিট প্রশস্ত রক্ত বর্ণের প্রস্তর প্রাচীর বিদ্যমান থাকিয়া শত্রুপক্ষদিগের আক্রমণ হইতে প্রাসাদটীকে রক্ষা করিতেছে, সুতরাং এখান হইতে ভিতরের সৌন্দর্য্য কিছুই দেখিতে পাইলাম না। দেউড়ীর নিকট মহারাজের সশস্ত্র দ্বারপালগণ আপনাপন কর্ত্তব্যকর্ম্ম পালন করিতেছে; বলা বাহুল্য যে, সহরের সকল ফটকেই এইরূপ পাহারার সুবন্দোবস্ত আছে। অবগত হইলাম প্রত্যহ প্রত্যুষকাল হইতে রাত্রি ৯ ঘটিকা পর্য্যন্ত এই সকল ফটকগুলি খোলা থাকে, তাহার পর চিরপ্রথানুসারে সকলগুলিই বন্ধ হয়, কিন্তু রেলষ্টেশন ও ইংরাজ রেসিডেণ্টের আবাস গৃহে যাইবার নিকটবর্ত্তী তিনটী ফটকের ছোট দরজা কয়টী রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত রাজাদেশে খোলা থাকে। এই চাঁদ-পোল ফটক পার হইয়া গাড়ীগুলি যখন সহরের ভিতর প্রবেশ করিল, তখন সেই সুপ্রশস্ত রাজপথ—তাহার উভয় পার্শ্বেই পীতবর্ণে চিত্রিত একই আকৃতির সারি সারি হর্ম্ম্যরাজির সৌন্দর্য্যরাশি দর্শন করিয়াই চমৎকৃত হইলাম, এবং মনে মনে ভাবিলাম এতাবৎকাল কত দেশ বিদেশ ভ্রমণ করিয়াছি, কিন্তু কখন কোন স্থানে এরূপ সুন্দর অথচ পরিস্কার ও পরিচ্ছন্ন সুন্দর দৃশ্য দেখিতে পাই নাই।

প্রধান রাস্তার উপর যে সমস্ত গৃহ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা এক একখানি যেন এক একটা প্রাসাদ তুল্য। সকল গৃহের নিম্নতলে বিস্তর সুসজ্জিত বিপণীশ্রেণী অবস্থান করিয়া সেই রাস্তার শোভা আরও বৃদ্ধি করিতেছে। এই পথটী দৈর্ঘে প্রায় এক মাইল এবং প্রস্থে কম-বেশ শত হস্ত প্রমাণ হইবে। ইহারই অনুরূপ আরও কয়েকটী সুপ্রশস্ত রাজপথ এই প্রধান পথটীকে স্থানে স্থানে বিভক্ত করিয়া রাখিয়াছে।

পাঠকবর্গের প্রীতির নিমিত্ত সেই জয়পুরের প্রধান পথের একখানি চিত্র প্রদত্ত হইল।

এ সহরে যে স্থানে এইরূপ দুইটী প্রশস্ত পথ একত্রে মিলিত হইয়াছে, সেইস্থানেই একটী বাজার-চকের সৃষ্টি হইয়াছে, আবার সেই স্থানেই পাষাণমণ্ডিত, উৎস শোভিত কৃত্রিম জলাধারের চতুষ্পার্শ্বে ক্রেতা ও বিক্রেতার হাট বসিয়াছে। তাহাদের চিত্র বিচিত্র পরিচ্ছদের শোভা ঐ সকল স্থানগুলির শোভা বিস্তার করিতেছে, এতদ্ভিন্ন সন্ধ্যার পর গ্যাসালোকে সেই সকল স্থান এক অপূর্ব্ব শোভায় শোভিত হইয়া দর্শকবৃন্দের চিত্ত আকর্ষণ করিতে থাকে। এই নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে প্রাসাদের দিকে যতই অগ্রসর হইতে লাগিলাম, সারি সারি দোকান তায়—শ্বেত পাথরের বাসন, রঙ্গিণ বসন ও প্রস্তরময় দেবতা এবং জীবজন্তুর মূর্ত্তিগুলি, কোথাও বা পিত্তলের বাসন, আবার কোন স্থানে বা গম, চেনা প্রভৃতি স্তূপাকারে স্থিতি হইয়া ক্রেতাদিগের চিত্ত আকর্ষণ করিতেছে।

জয়পুরের একটী গম এত বড়, যেন আমাদের বাঙ্গলা দেশের একটী ছোট বেলোয়ারি কড়ির মত। কলিকাতা সহরের ন্যায় এখানে জনস্রোতের মধ্যে মধ্যে ভীষণাকায় শ্মশ্রুগুল্মধারী দীর্ঘোন্নত রাজপুত পথিক এবং সবল ও স্থূলকায় নানাজাতীয় কাঁচুলী-ঘাগড়া শোভিতা রমণীদিগের ভাবভঙ্গি নয়নগোচর করিয়া এখানকার আচার ব্যবহারের বিষয় অনেকটা শিক্ষা লাভ করিলাম। এইরূপে এই প্রশস্ত রাজপথের সৌন্দর্য্য দর্শন করিতে করিতে একটী মোড় ফিরিবার পর, এক লালবর্ণ অট্টালিকার উপরিভাগে মহারাজের স্বর্গচূড়া নামে একটী কীর্ত্তিস্তম্ভ দেখিতে পাইলাম। এই স্তম্ভের পাদদেশে গাড়োয়ানেরা আমাদিগকে তাহাদের গাড়ী হইতে নামাইয়া দিয়া চুক্তি ভাড়া লইয়া প্রস্থান করিল। এ সহরের অট্টালিকাগুলি এমন সুন্দর যে, প্রত্যেকটীকে দেখিলেই



জয়পুরের প্রধান রাস্তার দৃশ্য।

[১৯৬ পৃষ্ঠা]

Suloy Press Calcutta.

যেন রাজপ্রাসাদ বলিয়া ভ্রম হয়, বিশেষতঃ প্রকৃত রাজপ্রাসাদের ন্যায় এখানে অনেকগুলি অট্টালিকা দেখিতে রক্তবর্ণ।

রাজপ্রাসাদটী সহরের এক সপ্তাংশ স্থান অধিকার করিয়া অবস্থিত। ইহার বাগ-বাগিচা ও সৌধ-ইমারত দৈর্ঘ্যে প্রায় পোয়া ক্রোশ ভূমিখণ্ড ব্যাপীয়া আছে। আমরা সকলে পদব্রজে প্রথমে ত্রিপুলিয়া নামক ফটক পার হইয়া একটী প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলাম, এই প্রাঙ্গণ অতিক্রম করিবার পর, রাজবাটীর খাস ফটকের সম্মুখে পৌঁছিলাম। যাঁহারা প্যালেসের ভিতরকার সৌন্দর্য্য দর্শনের পাস সংগ্রহ করিতে পারেন, তাঁহাদিগকে এই স্থানের প্রহরীকে সেই পাস দেখাইয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে হয়।

যাত্রীদিগের মধ্যে চৌদ্দ আনা লোকের ভাগ্যে এখানকার প্যালেসের সৌন্দর্য্য দর্শন লাভ ঘটে না, বিশেষতঃ বঙ্গমহিলাদিগের ভাগ্য কিছুতেই সুপ্রসন্ন হয় না। ইহার প্রধান কারণ এই যে, সরকারের আদেশানুসারে কেহ শূন্য মস্তকে প্যালেসের ভিতর প্রবেশ করিতে অধিকার পান না; যদ্যপি বিশেষ অনুরোধে কাহারও ভাগ্য প্রসন্ন হয়, অর্থাৎ এখানকার ব্রিটিশ রেসিডেণ্টের নিকট তাঁহার আবেদন গ্রাহ্য হয়, তাহা হইলে তাহাকে পাগড়ী বা টুপী মস্তকে পরিধান করিয়া ভিতরে যাইতে হয়। প্যালেস দর্শনের ছাড়পত্রের সহিত আগ্রা দুর্গের ন্যায় একজন গাইড এখানেও পাওয়া যায়, রাজপরিবারবর্গের মধ্যে তিনি যাঁহাকে নির্দ্দেশ করিবেন, তাঁহারই নিকট তাহাকে টুপী বা পাগড়ী উত্তোলন করিতে হইবে, উহাই তাঁহাদের সম্মানসূচক চিহ্ন। যাহার ভাগ্য প্রসন্ন হইবে অর্থাৎ যিনি প্যালেসের ভিতর যাইবার অধিকার পাইবেন, তিনি এখানকার রাজসরকারের অতুল ঐশ্বর্য্য ও অদ্ভুত অদ্ভুত দ্রব্য সামগ্রী দর্শন করিয়া পরমানন্দ অনুভব করিবেন সন্দেহ নাই।

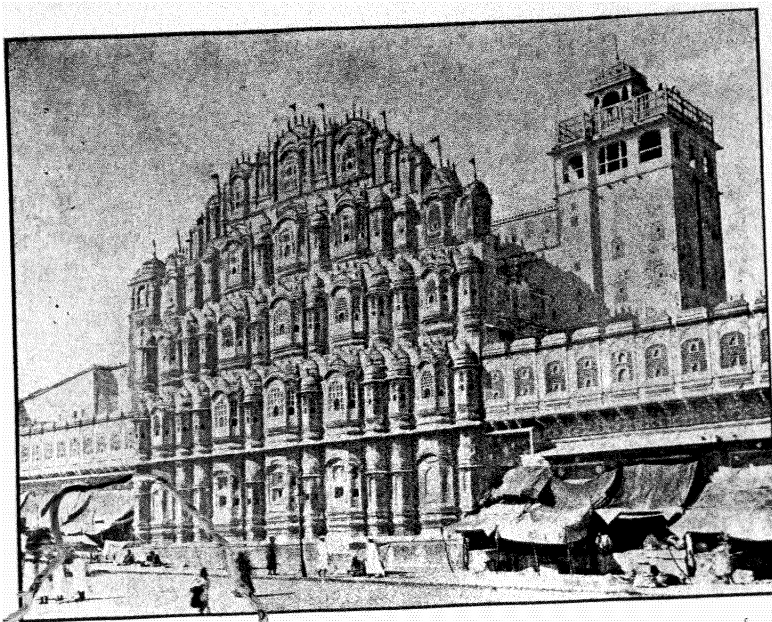
খাস ফটকের বাহিরে দুইদিকে দুইটী পথ আছে। বামদিকেরটী রাজবাটীর দফতর-খানায় গিয়াছে আর দক্ষিণদিকেরটী মান-মন্দির, অশ্বশালা, কাছারী-বাড়ী ও হাওয়া-মহলের দিকে প্রসারিত হইয়াছে। এই দক্ষিণদিকের ফটকের ভিতর দিয়া প্রবেশ করিবামাত্র প্রাঙ্গণের সম্মুখেই সপ্ততল "চন্দ্রমহল" আপন শোভা বিস্তার করিয়া স্থানটী আলোকিত করিয়া আছে। ইহার দ্বার রুদ্ধ, তথাপি বাহিরের দৃশ্যাবলি ও শিল্পনৈপুণ্য দেখিলেই আত্মহারা হইতে হয়; অবগত হইলাম তাহারই মধ্যস্থলে মহারাজের "অন্তঃপুর" অবস্থিত। পূর্ব্বে প্রশস্ত রাজ-পথ হইতে যে স্তম্ভচূড়া দেখিয়াছিলাম, উহা এই চন্দ্র-মহলের উপরিভাগে শোভা পাইতেছে। চন্দ্র-মহলের পশ্চাতে উৎসাধি-শোভিত পুষ্পিত উপবন ও তাহার এক পার্শ্বে ভগবান শ্রীশ্রীগোবিন্দজীউর পবিত্র মূর্ত্তি অবস্থান করিয়া উদ্যানটী পবিত্র করিতেছে; আবার ইহার বামপার্শ্বে অর্থাৎ প্রাসাদের পশ্চিমাংশে সুরঞ্জিত সুচিত্রিত হর্ম্ম্যাবলী শোভা পাইতেছে। এই স্থানের কোন অংশে রাজার খাস-দফতরখানা, কোন অংশে মন্ত্রীদিগের দফতর-খানা, কোনটীতে বা রাজ-কর্ম্মচারীদিগের বাসস্থান, এতদ্ভিন্ন এস্থান হইতে অন্তঃপুর যাইবারও একটী পৃথক পথ আছে। সেই সকল ইমারতের দেওয়ালে নানারূপ চিত্র অঙ্কিত।

অন্তঃপুর দ্বারের পার্শ্বস্থ দেওয়ালে হাওয়া-মহল, রাম-বিলাস, জয়পুর মহারাজের প্রতিমূর্ত্তি প্রভৃতির চিত্রগুলি দর্শকবৃন্দের চিত্ত আকর্ষণ করিতে থাকে। বামপার্শ্বের মহলে প্রবেশ করিয়া উপরে উঠিতে হয়। এই উপরতলায় যে সকল দ্রব্যসামগ্রী দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে অস্ত্রাগারটীর শোভা উল্লেখযোগ্য, কারণ প্রাচীনকাল হইতে বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত কুশোয়া রাজারা যে সকল অস্ত্র ব্যবহার করিতেন বা করেন, অদ্যাপি এই কক্ষে সেই সমস্ত অস্ত্রগুলি যত্নের সহিত রক্ষিত

হইয়াছে। প্রাচীন তীর ধনু হইতে যাবতীয় অস্ত্রই ইহার মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। অস্ত্রাগারের মধ্যস্থলে পূর্ব্বে মহারাজ মানসিংহ যে তরবারিখানি স্বয়ং ব্যবহার করিতেন, সেই অতি ভার তরবারিখানি ইহার মধ্যে স্থান পাইয়া মহারাজের বাহুবলের পরিচয় প্রদান করিতেছে। অস্ত্রাগার অতিক্রম করিয়া এক সুসজ্জিত কক্ষে অম্বর ও জয়পুরের রাজাদিগের আরও স্বর্গীয় মহারাজ মানসিংহের চিত্রাবলি দর্শন করিয়া পরমপ্রীতি লাভ করিলাম। এইরূপে উপরতলের সৌন্দর্য্য দর্শন শেষ করিয়া নিম্নতলের বিস্তৃত প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে মহারাজের দেওয়ান-ই-খাস নামক মহলে উপস্থিত হইলাম; দেওয়ান-ই-খাস মহল এক অপূর্ব্ব দৃশ্য! এখানে শ্বেতপ্রস্তরের সারি সারি স্তম্ভগুলি যেরূপ ভাবে সজ্জিত আছে, উহা দেখিলে চিদম্বরের দেব-সভা ও কনক-সভা বলিয়া ভ্রম হয়। এ দৃশ্য যিনি দেখিবেন তিনিই মুগ্ধ হইবেন সন্দেহ নাই। এই স্থানে হল-ঘরের চারিপার্শ্বে পর্দ্দা ঘেরা, মধ্যে সারি সারি সুদৃশ্য বহুমূল্য চেয়ার সজ্জীকৃত অবস্থায় অবস্থান করিয়া মহারাজের দরবারের সময় প্রতিক্ষা করিতেছে। নির্দ্দিষ্ট এই স্থানে যে সকল বহুমূল্য ঝাড় ঝুলিতেছে কেবল উহা দেখিলেই অর্থব্যয় ও পরিশ্রম সার্থক বিবেচনা করিতে হয়। অবগত হইলাম এই স্থানে মহারাজের দরবার ও মন্ত্রণা কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া থাকে, এতদ্ভিন্ন কোন লাট বা বিদেশীয় রাজার এ সহরে শুভাগমন হইলে, এই দেওয়ান-ই-খাসেই তাঁহাদের দরবার হয়।

দেওয়ান-ই-খাসের শোভা দর্শন করিয়া স্থানীয় মানমন্দির প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলাম। মানমন্দির—দরবার হলের পূর্ব্বাংশে অবস্থিত। পূর্ব্বেই উল্লেখ হইয়াছে, স্বর্গীয় মহারাজ সওয়াই জয়সিংহ এই প্রকাণ্ড যন্ত্রবাটী এখানে প্রতিষ্ঠা করিয়া আপন কীর্ত্তি স্থাপিত করিয়া গিয়াছেন। বলা বাহুল্য এই যন্ত্রের সাহায্যে বার তিথি, নক্ষত্রের

গতিবিধি, অমাবস্যা, পূর্ণিমা প্রভৃতি সময় নিরূপণ, এমন কি গ্রহণের সময় পর্য্যন্ত জানিতে পারা যায়। মানমন্দিরের সন্নিকটেই মহারাজের অশ্বশালা অবস্থিত। এক প্রকাণ্ড প্রাঙ্গণের চতুর্দ্দিকে মহারাজের অশ্ব, গজ, উষ্ট্র প্রভৃতি ও অসংখ্য যানবাহনের আগার। এই সকল অশ্বশালা প্রভৃতি যিনিই দেখিবেন, তিনিই মুগ্ধ হইবেন, কারণ প্রতি রঙ্গের ও প্রতি সাইজের জন্তুগুলি এক এক শালায় অবস্থিত। এই অশ্বশালা প্রাঙ্গণের মধ্য দিয়া আরও অল্প দূর পূর্ব্বমুখে অগ্রসর হইলে মহারাজের জগদ্বিখ্যাত সেই হাওয়া-মহলে পৌঁছান যায়। হাওয়া-মহলটী—উচ্চে ছয় তল, প্রতি তলের উপর ক্ষুদ্রতর তল সন্নিবিষ্ট হইয়া নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহার কি মনোহর দৃশ্য! হাওয়া-মহলের নির্ম্মাণ কার্য্য দেখিলে আত্মহারা হইতে হয়, কারণ ইহার প্রতি তলে অসংখ্য গবাক্ষ শোভিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কক্ষ সজ্জীকৃত, আবার প্রতি কক্ষের দেওয়ালে নানা বর্ণের মার্ব্বেল প্রস্তরখণ্ড সংযুক্ত থাকায়,সেই কক্ষগুলি এক অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে। এই সকল কক্ষের মধ্যস্থলে কৃত্রিম ফোয়ারা স্থাপিত, প্রতি কক্ষ চূড়ায় সুরঞ্জিত অসংখ্য নিশান সংশ্লিষ্ট থাকায়, ইহা এক নয়নানন্দকর দৃশ্য হইয়াছে; উন্মুক্ত গবাক্ষপথে বায়ু প্রবেশ-কালীন,ঐ সকল ফোয়ারায় শীকরসিক্ত মার্ব্বেল কক্ষগুলিকে শীতল করিবার জন্যই কক্ষের মধ্যস্থলে এই সকল কৃত্রিক ফোয়ারার সৃষ্টি হইয়াছে। বলা বাহুল্য এই নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইলে পরিশ্রান্ত দর্শকবৃন্দের আর এক পদও অগ্রসর হইবার ইচ্ছা হয় না, কি শান্তিপ্রদ সুখস্থান! যেন দ্বিতীয় স্বর্গপুরী! কক্ষস্থানের সম্মুখে রাজপথের অপর পার্শ্বে মহারাজার সুদৃশ্য কলেজ বাটী আপন শোভা বিস্তার করিয়া আছে। পাঠকবর্গের প্রীতির নিমিত্ত প্রাসাদের একাংশে অবস্থিত কেবল সেই বিখ্যাত হাওয়া-মহলের একখানি চিত্র এইস্থানে প্রদত্ত হইল।



হাওয়া মহলের দৃশ্য। [২০০ পৃষ্ঠা]

Sulov Press, Calcutta.

হাওয়া-মহলের নিকটেই মহারাজের "সুখ-নিবাস" বিদ্যমান। এই সমস্ত শোভা দর্শন করিয়া মনে মনে ভাবিলাম আমরা ইতিপূর্ব্বে যখন এখানে আসিয়াছিলাম, তখন এই সকল ভিতরকার সৌন্দর্য্য দর্শন না করিয়া সকল অর্থই বাজে খরচ করিয়াছিলাম, আবার পরক্ষণেই পাস সংগ্রহ করিতে যে সাধ্যসাধনা ও বিড়ম্বনা ভোগ সহ্য করিয়া কত সময় নষ্ট করিয়াছি, সে বিষয় চিন্তা করিলে—পাস লইবার বাসনা আর হয় না।

প্রাসাদের উত্তরে এক উপবন মধ্যে "তালাওকটোরা" নামক এক মনোহর পুষ্করিণীর শোভা দেখিয়া, তাহারই অনতিদূরে "রাজা মাল-কাতালাও" নামক আবার একটী সরোবরের তীরে উপস্থিত হইলাম, এখানকার এই সরোবরে বিস্তর সুবৃহৎ পোসা কুম্ভীর দেখিতে পাওয়া যায়। অবগত হইলাম মহারাজ অবসর মত সদলে ইহার তীরে পদার্পণ করিয়া এই সকল কুম্ভীরদিগের ক্রীড়াকৌতুক দেখেন এবং কত আনন্দ অনুভব করেন। এবার এই সরোবর তীর হইতে চকমিলান অট্টালিকা—কাছারী প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলাম। এখানে জয়পুর রাজ্যের যাবতীয় দেওয়ানি, ফৌজদারী ও রাজস্ব বিষয়ক মামলার বিচার হয়। হাকিম, উকীল, মোক্তার, পিয়াদা ও বিচারপ্রার্থীগণ এই স্থানের শোভা বৃদ্ধি করিতেছে। প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে বিস্তর খৎ, হাতচিঠি, হুণ্ডী, ষ্ট্যাম্প প্রভৃতির দোকান সকল সজ্জিত। যে সকল ষ্ট্যাম্প এখানে বিক্রয় হয় উহা কেবল এই রাজ্যেই প্রচলিত। এইরূপে উপরোক্ত স্থান-সমূহের সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিয়া প্রাসাদের পশ্চাদ্ভাগে যথায় মহারাজের উষ্ট্রগুলি শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া অবস্থান করিতেছে, তথায় এক পরিচিত লোকের বাটীতে বিশ্রাম করিবার মনস্থ করিলাম। সন্ধ্যার পূর্ব্বে জয়পুরের যে ভুবন-বিখ্যাত শ্রীশ্রীগোবিন্দ ও গোপীনাথজীউর

পবিত্র মূর্ত্তি দর্শনের কাঙ্গাল হইয়া এখানে আসিয়াছিলাম। এক্ষণে সেই ভগবানের স্বরূপ মূর্ত্তি দর্শনের নিমিত্ত প্রস্তুত হইলাম। জয়পুর সহরে আহারীয় কোন দ্রব্যসামগ্রীর অভাব নাই আরও এখানকার যাবতীয় দ্রব্য সামগ্রী ১০৫৲ টাকা ওজনের সেরে বিক্রয় হইয়া থাকে অর্থাৎ তথাকার /১ সের সামগ্রী কলিকাতা সহরের /১।/০ এক সের পাঁচ ছটাকের সমান হয়।

অপরাহ্নকালে বাসাবাটী হইতে সদলে বহির্গত হইয়া পদব্রজে সহরের সৌন্দর্য্য দর্শন করিতে করিতে শ্রীশ্রীগোবিন্দজীউর শ্রীমন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এই মন্দির চত্বরের বাহিরে সকলেরই পাদুকা খুলিয়া রাখিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে হয়। বলা বাহুল্য এই সকল পাদুকা রক্ষা করিবার জন্য এখানে একজন প্রহরী নিযুক্ত আছে। যাত্রীরা ভগবানের দর্শনান্তে প্রত্যাবর্ত্তন কালে তাহাকে সাধ্যমত পুরস্কারও দিয়া থাকেন; এইরূপে যাত্রীসমাগম অধিক হইলে তাহার কিছু লাভ হয়। সে যাহাহউক, দেবালয়ের ফটক হইতে সকলে গর্ভগৃহের সম্মুখস্থ দরদালানে উপস্থিত হইয়া যে দেবের দর্শনের কাঙ্গাল হইয়া এখানে আসিলাম, এক্ষণে সেই দেবের মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ দেখিয়া ক্ষুব্ধ হইলাম, কিন্তু পরক্ষণে আমাদের ন্যায় আরও বিস্তর ভক্ত এই চত্বরে ভগবানের দর্শনের নিমিত্ত অপেক্ষা করিতেছেন দেখিয়া, কিঞ্চিৎ আশ্বাসিত হইলাম। এই সকল যাত্রীদিগের মধ্যে অধিকাংশ উত্তর-পশ্চিম দেশীয়, এতদ্ভিন্ন বাঙ্গালী তীর্থযাত্রীও আছেন। অনুসন্ধানে জানিলাম, সন্ধ্যারতির সময় দেবালয়ের দ্বার খোলা হইবে; সুতরাং যে প্রশস্ত উদ্যান মধ্যে দেবালয়টী প্রতিষ্ঠিত, সকলে পরামর্শ করিয়া সময় কাটাইবার জন্য দুঃখিত মনে সম্মুখস্থ সেই মনোহর উদ্যানের সৌন্দর্য্য দেখিবার মনস্থ করিলাম। দেবালয়স্থিত বাগিচাটীর চারিদিকে

পত্র পুষ্প শোভিত অসংখ্য কুঞ্জ-বন, তাহার মধ্যে কত শত ময়ূর ময়ূরী সতত শ্রীগোবিন্দজীউর শ্রীচরণ দর্শন করিয়া মনের আনন্দে ইতস্ততঃ বিচরণ করিবার সময় যেন আমাদিগকে দুঃখিত দেখিয়া উহারা কে-ও-য়া কে-ও-য়া রবে আমাদিগকে ভগবানের আরতির সময় পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে বলিতে লাগিল।

শ্রীমন্দিরের ঠিক সম্মুখ হইতে সারি সারি উৎস ও গ্যাসালোকের স্তম্ভ শোভিত একটী প্রশস্ত পথ শোভা পাইতেছে, ঐ পথটী বরাবর প্রাসাদের চন্দ্রমহলের সহিত মিলিত হইয়াছে। কি সুন্দর দৃশ্য! অবগত হইলাম প্রাসাদ সংলগ্ন এই পথ দিয়া সময় মত মহারাজ উদ্যানে আসিয়া ভ্রমণ করিয়া থাকেন। চন্দ্রমহলের দ্বারের বহির্ভাগে এক ভীষণাকায় শ্মশ্রুগুম্ফধারী প্রহরী, পাহারায় নিযুক্ত আছে। আমরা দূর হইতে ঐ স্থানের সৌন্দর্য্য দর্শন করিবার সময়, সহসা সেই দ্বারী হাই তুলিয়া "এ আল্লা" বলিয়া উঠিল, এই আল্লা নাম শ্রবণ করিয়া ঐ ব্যক্তি যে বিধর্ম্মী মুসলমান তাহা জানিতে বাকি রহিল না; কিন্তু কুশোয়া রাজ বংশধরদিগের প্রাসাদ দ্বারে তাহাকে প্রহরী নিযুক্ত থাকিতে দেখিয়া সকলে চমৎকৃত হইলাম এবং এই বিষয়ই চিন্তা করিতেছি,এমন সময় যজ্ঞোপবীতধারী দুইজন বাঙ্গালী পুরুষ, দূর হইতে আমাদিগকে দেখিতে পাইয়া,আলাপ করিবার মানসে আমাদেরই নিকটে উপস্থিত হইলেন; পরিচয়ে জানিলাম তাঁহাদের মধ্যে একজন শ্রীগোবিন্দজীউর পুরোহিত, অপরটী সংকীর্ত্তনওয়ালা গোস্বামী। ইহাঁরা বেশ মিষ্টভাষী। অল্পক্ষণের জন্য তাঁহাদের সহিত আলাপে, তাঁহাদের সৌজন্যে আমরা সকলেই মুগ্ধ হইলাম এবং দেবালয় সম্বন্ধে নানা তত্ত্ব সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইলাম। প্রথমে মুসলমান প্রহরী দেখিয়া যেরূপ আশ্চর্য্য হইয়াছিলাম, এবার বাঙ্গালীর বাঙ্গলা দেশ

হইতে বহুদূর রাজপুতানার এই মরুপ্রান্তরে হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন হয়, ইহাও চিন্তার বিষয় হইল।

রাজপুতদিগের বাঙ্গালী পুরোহিত কিরূপে হইল প্রথমেই এ বিষয় জানিবার জন্য তাঁহাদিগকে অনুরোধ করাতে যে উপদেশ পাইলাম, পাঠক সমাজে তাহাই সংক্ষেপে প্রকাশ করিতেছি—আমাদের অনুরোধে তাঁহারা সন্তুষ্টচিত্তে সকলকে বুঝাইয়া দিলেন যে, বাঙ্গলার শ্রীরূপ ও সনাতন গোস্বামী মহাশয়ের বংশধরেরাই জয়পুরের কঠোর রাজপুতকে বাঙ্গলার কোমল মধুর হরিনাম শিক্ষা দিয়াছিলেন। চৈতন্যশিষ্য—সনাতন গোস্বামী শ্রীবৃন্দাবনধামে জবাটবীতে শ্রীমদনমোহন বিগ্রহ-মূর্ত্তি আবিস্কার ও প্রতিষ্ঠা করিবার পর, শ্রীরূপ গোস্বামী শ্রীবৃন্দাবনে যোগপীঠ নামক স্থানে শ্রীগোবিন্দ-বিগ্রহ-মূর্ত্তিটী আবিস্কার করিয়া প্রতিষ্ঠা করেন। অম্বরের রাজা মানসিংহ বঙ্গ-বিজয়াভিপ্রায়ে যাত্রাকালীন পথিমধ্যে বৃন্দাবনে শ্রীগোবিন্দজীউর বিগ্রহমূর্ত্তি দর্শন করিয়া—লীলাময়ের ইচ্ছায় তিনি গোবিন্দপ্রেমে মুগ্ধ হইলেন, এরূপ প্রেমময় শ্রীমূর্ত্তির তেমন কোন প্রকার উল্লেখযোগ্য সুন্দর মন্দির না থাকায়, মহারাজ মানসিংহ নিজব্যয়ে ভগবানের অবস্থানের নিমিত্ত মনের মত একটী ভুবন-বিখ্যাত মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া আপন কীর্ত্তি স্থাপিত করেন, এক্ষণে বৃন্দাবনে যে লালপ্রস্তর নির্ম্মিত মন্দির, যাহার শিখরদেশটী ভগ্নাবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়, যে মন্দিরের অভ্যন্তরে বারাণ্ডার কারুকার্য্য অদ্যাপি দর্শন করিলে মোহিত হইতে হয়, যে মন্দির বৃন্দাবনে "প্রাচীন গোবিন্দ-মন্দির" নামে খ্যাত, ঐ অপূর্ব্ব মন্দিরটীই, রাজা মানসিংহ নির্ম্মাণ করাইয়া ভগবানের নামে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। এই সূত্রে শ্রীরূপ গোস্বামীর সহিত অম্বর রাজাদিগের পরিচয়। কথিত আছে এই মন্দির চূড়া এত উচ্চ ছিল যে বাদশাহ ঔরঙ্গজেব একদা তাঁহার আগ্রাপ্রাসাদ হইতে

ইহার চূড়া দেখিয়া,আপন প্রাসাদ অপেক্ষা ইহাকে উচ্চ অনুমান করিলেন, তখন হিংসার বশবর্ত্তী হইয়া শ্রীবৃন্দাবনের যাবতীয় উচ্চ মন্দিরগুলি ভাঙ্গিয়া দিবার আদেশ প্রদান করেন; ইহার প্রধান কারণ এই যে, তিনি ভাবিলেন "আমি ভারতের একছত্র সম্রাট" আমার প্রাসাদ চূড়া অপেক্ষা অপর কোন স্থানের চূড়া উচ্চ বিদ্যমান থাকিলে আমার অপমান। এই বদ্ধসংস্কারে সর্ব্বপ্রথমেই তিনি শ্রীগোবিন্দজীউর মন্দিরটী ভাঙ্গিবার হুকুম দেন। সম্রাটের আদেশ পালন করিবার জন্য সদলে লোকজন শ্রীবৃন্দাবনে উপস্থিত হইলে—গোস্বামীরা বিগ্রহ-মূর্ত্তি অপবিত্র হইবার ভয়ে শ্রীগোবিন্দজীউ, শ্রীমদনমোহন ও মধু পণ্ডিত প্রতিষ্ঠিত শ্রীগোপীনাথজীউ এই কয়টী পবিত্র শ্রীমূর্ত্তি লইয়া গোপনে জয়পুরে পলায়ন করিয়া রাজা সওয়াই সিংহের শরণাপন্ন হন, তদ্দর্শনে রাজা ঐসকল বিগ্রহমূর্ত্তিসহ গোস্বামীদিগকে যত্নের সহিত নিজ রাজ্যমধ্যে লুকাইয়া রাখেন, তৎপরে মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেবতাদিগকে প্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক, এই সকল গোস্বামীদিগকেই বংশানুক্রমে পূজক নিযুক্ত করিতে প্রতিশ্রুত হন,অধিকন্তু এই শুভকর্ম্ম পরিচালনের জন্য সরকার হইতে তাহা-দিগকে বিস্তর জায়গীর প্রদান করেন। এইরূপে কিছুদিন অতীত হইবার পর একদা শৈখাবৎ রাজপুতদিগের প্রার্থনায় রাজা সন্তুষ্টচিত্তে শ্রীগোপীনাথজীউর বিগ্রহমূর্ত্তিটী তাঁহাদের তত্ত্বধানে রাখিলেন এবং জয়পুর রাজার জামাতা ফেরাওবালির রাজাকে শ্রীমদনমোহনজীউর বিগ্রহমূর্ত্তিটী প্রদান করিলেন। এই সকল বিগ্রহমূর্ত্তির সেবক বাঙ্গালী গোস্বামীদিগের বংশধর দেখিতে পাইবেন। এই কারণেই জয়পুরে শ্রীগোবিন্দজীউর বাঙ্গালী পূজারী, এবং তাঁহাদের অনুকম্পায় বাঙ্গালী-দিগের একমাত্র উদ্ধারসাধন জপ-মন্ত্র "হরি-সংকীর্ত্তন" এখানে আরম্ভ হয়। তাঁহাদের নিকট এইরূপ উপদেশ পাইয়া প্রাতমনে পুনঃরায় বিনয়বচনে

জিজ্ঞাসা করিলাম, "গুরুজি! আপনাদিগকে আবার বিরক্ত করিতেছি, কৃপা পূর্ব্বক নিজগুণে মার্জ্জনা করিবেন। শ্রীবৃন্দাবন শ্রীকৃষ্ণের লীলা-স্থান,কিন্তু একা সেই শ্রীকৃষ্ণ কিরূপে ভিন্ন ভিন্ন নামে প্রসিদ্ধ হইলেন?" তদুত্তরে তাঁহাদের নিকট নিম্নলিখিত উপদেশটী শিক্ষা লাভ করিলাম—

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ—ব্রজ-পরিকর ও পুর-পরিকরগণের সহিত মর্ত্ত্যধাম পরিত্যাগ এবং নিত্যধামে গমন সম্বাদ, মহাবীর অর্জ্জুনের মুখে জম্বু-দ্বীপাধিপতি মহারাজ যুধিষ্ঠির শ্রবণ করিলে—শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র বজ্র নাভকে মথুরা নগরীতে এবং স্বীয় পৌত্র পরীক্ষিতকে নিজরাজ্যে অভিষেক করিয়া ভ্রাতৃগণের সহিত তিনি মহাপ্রস্থান করিলেন।

কিছুকাল অতীত হইবার পর একদা রোচনাদেবী আপন পুত্র বজ্রনাভকে বলিলেন—"বাবা! তোমার প্রপিতামহ "শ্রীকৃষ্ণের" অদর্শনে অদ্য আমার চিত্ত অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইতেছে, যদি তুমি তাঁর প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়া আমায় দেখাইতে পার, তাহা হইলে আমার সেই উৎ-কণ্ঠা কথঞ্চিত উপশম হইতে পারে?" মাতার উৎকণ্ঠের কারণ অবগত হইয়া বজ্রনাভ তৎক্ষণাৎ উত্তম শিল্পীদ্বারা একটী পাষাণমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়া জননীকে উহা দেখাইলেন। রোচনাদেবী সেই মূর্ত্তি দর্শন করিবা মাত্র বলিলেন—"বৎস! কেবল শ্রীমুখ ভিন্ন ইহার অপর কোন অঙ্গই শ্রীকৃষ্ণের মত হয় নাই। তখন বজ্রনাভ আর একটী মূর্ত্তি প্রস্তুত করাইয়া জননীর নিকট লইয়া গেলেন। এ মূর্ত্তি দর্শন করিয়া তিনি বলিলেন —"বাবা এ মূর্ত্তির বক্ষঃস্থল—কেবল তাঁহার অনুরূপ হইয়াছে। বার বার দুইবার দুইটী মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়াও জননীর মনের মত প্রকৃতমূর্ত্তি প্রস্তুত করাইতে না পারিয়া তিনি লজ্জিত হইলেন; এবার তিনি অতি যত্ন ও সাবধানের সহিত আর একটী মূর্ত্তি প্রস্তুত করাইয়া মাতার নিকট লইয়া গেলেন। রোচনাদেবী এবারও ক্ষুণ্ণ মনে বলিলেন—"না

বাবা! এ মূর্ত্তি—শ্রীকৃষ্ণের চরণদ্বয় ব্যতীত অপর কোন অঙ্গই তাঁহার অনুরূপ হয় নাই।" এই কথা শুনিয়া বজ্রনাভ রোষভরে পুনর্ব্বার মূর্ত্তি প্রস্তুত করাইতে উদ্যোগ করিলে,—রোচনাদেবী মধুর বচনে তাহাকে বলিলেন—"বৎস! আর তোমার কোন মূর্ত্তিই নির্ম্মাণ করাইবার প্রয়োজন নাই। এই তিন মূর্ত্তিকে তুমি আমার আদেশানুসারে শ্রীগোবিন্দ, শ্রীগোপীনাথ ও শ্রীমদনমোহন নামে প্রতিষ্ঠা কর। তখন বজ্রনাভ ভিন্ন ভিন্ন নাম দিয়া এই তিনটী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক মাতৃ আজ্ঞা পালন করিলেন।

পরিবর্ত্তনশীল কালের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই বজ্রনাভের অক্ষয় কীর্ত্তিগুলি প্রায় লুপ্ত হইতেছিল। তাহার পর স্বয়ং ভগবান স্বীয় কান্তার ভাবকান্তি অঙ্গীকার করিয়া, গৌড়দেশস্থ শ্রীধাম নবদ্বীপে শচীগৃহে গৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হইলেন। তৎপরে জীবগণের মঙ্গলের জন্য সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণচ্ছলে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নাম প্রকাশ করিয়া, যে সময় তিনি নীলাচল পর্ব্বতে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময় শ্রীরূপ ও সনাতন, উভয় ভ্রাতাকে শ্রীবৃন্দাবন গমন করিয়া ভক্তিশাস্ত্র ও শ্রীশ্রী-রাধাকৃষ্ণের লীলাস্থল প্রকাশ করিতে আদেশ করিলেন; তদনুসারে উভয় ভ্রাতাই শ্রীবৃন্দাবনে উপস্থিত হইয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। এইরূপে সেই সাধ্বী সতী রোচন-দেবীর আজ্ঞায় এক শ্রীকৃষ্ণ হইতে শ্রীগোবিন্দ, শ্রীগোপীনাথ ও শ্রীমদন-মোহন নামের সৃষ্টি হইয়াছে।

বিধর্ম্মী প্রহরীর কিম্বদন্তি এইরূপ;—

রাজা সওয়া জয়সিংহের রাজত্বকালে জয়পুরে শ্রীগোবিন্দজীউর বিগ্রহ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা হইবার পর, একদা কতকগুলি হিন্দুযাত্রী সেই ভগবান শ্রীগোবিন্দজীউর দর্শন আশে তথায় শুভযাত্রা করিলে, পথিমধ্যে এক যব-

নের সহিত তাহাদের আলাপ হয় এবং নানাপ্রকার কথাবার্ত্তার পর হিন্দুদিগের একমাত্র ত্রাণকর্ত্তা শ্রীগোবিন্দজীউর পরিচয় পাইয়া এই ভগবানের দর্শন অভিলাষ করে,তখন হিন্দুরা তাহাকে বিধর্ম্মী যবনদিগের দেবালয়ের মধ্যে প্রবেশ নিষেধ আজ্ঞা আছে জানাইলেও কিছুতেই তাহার মনের গতি পরিবর্ত্তন করিতে পারিলেন না ; বলা বাহুল্য সে ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে ভগবান শ্রীগোবিন্দজীউর দর্শন—স্থিরসঙ্কল্প করিয়া এই সকল হিন্দু যাত্রীদিগের পশ্চাদ্গামী হইল,কিন্তু যথাসময়ে দেবালয়ের দ্বারদেশে উপস্থিত হইবামাত্র চিরপ্রথানুসারে দ্বারপাল—তাহার পরিচয় পাইয়া দেবালয়ের ভিতর প্রবেশ করিতে বাধাপ্রদান করিল, তখন এই যবন নানাপ্রকার যুক্তিতর্ক আরম্ভ করিল,কিন্তু কিছুতেই কোন ফলোদয় হইল না দেখিয়া হতাশ প্রাণে শ্রীগোবিন্দজীউর শ্রীচরণ ধ্যান করিতে করিতে, বারিধিবক্ষে বালির বাঁধ ভাঙ্গিলে যেরূপ জলস্রোত প্রবাহিত হয় সেইরূপ, নয়ননীরে স্বীয় বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিতে লাগিল ; এই অভিনব ব্যাপার দর্শন করিয়া যেন কোন কুহকবলে প্রহরীর মনকে আকর্ষণ করিলে—সেই প্রহরীর অন্তরে দয়া উপস্থিত হইল, ফলতঃ সে তাহাকে সঙ্গে করিয়া হুজুরে হাজির করিয়া যুক্ত করে রাজার নিকট যবনের প্রার্থনা জ্ঞাপন করিল। এদিকে মহারাজ তাহার পরিচয়ে আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, কিন্তু সেই করুণ বিলাপ এবং প্রেমপূর্ণ হৃদয় ও ভক্তিভাব অবলোকন করিয়া মহারাজ মুগ্ধ হইলেন, তথাপি বিধর্ম্মী যবনকে কিরূপে হিন্দুর পবিত্র দেবালয়ে প্রবেশ করিতে আদেশ দিবেন ইহাই চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় সেই ভক্তবীর যবন রাজাকে চিন্তান্বিত দর্শন করিয়া করযোড়ে তাঁহার নিকট নিবেদন করিল, মহারাজ! যে ভগবান সর্ব্বজীবের সৃষ্টিকর্ত্তা, আপনাদের সেই ভগবানকে কি আমি কেবল একবার চক্ষে দর্শন করিলে তিনি অপবিত্র হইবেন? যিনি সর্ব্বাত্মায় বিরাজমান—তাহাতে কি তিনি অপবিত্র

না? যিনি সর্ব্ব ধর্ম্মাবলম্বীয় লোকদিগের রুচি অনুসারে আহার যোগাইতেছেন, সে আহার কি তাঁহার সৃষ্ট নয়? "ধর্ম্মাবতার! কৃপাপূর্ব্বক একবার সেই অগতির গতি আপনাদের একমাত্র ত্রাণকর্ত্তা পতিতপাবন শ্রীগোবিন্দজীউর শ্রীচরণ দর্শন করিতে অনুমতি দান করুন! শ্রীগোবিন্দজীউর পরিচয় পাইয়া অবধি সেই দেবোত্তম পবিত্র মূর্ত্তি দর্শনের নিমিত্ত আমার হৃদয়ে দেবভাবের উদয় হইতেছে; যদিও আমি কখন আপনাদের সেই ভগবানের পবিত্রমূর্ত্তি দর্শন করি নাই, তথাপি তিনি আমার হৃদয়ে পূর্ণমাত্রায় বিরাজ করিতেছেন।"

মহারাজ জয়সিংহ জ্ঞানচক্ষে তাহার আন্তরিক অবস্থা জানিতে পারিয়া, আগন্তুককে রাজ সরকারে কোন একটী চাকরীর প্রার্থনা করিতে আদেশ করিলেন। যবন—ইহাতে ক্ষুণ্নমনে বহুক্ষণ চিন্তা করিয়া এই স্থির করিল (যদি আমি নরপতির কৃপায় দেবালয়ের কোন এক নিভৃত স্থানেও কোনরূপ কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে সক্ষম হই, তাহা হইলে কখন না কখন শ্রীগোবিন্দজীউর শ্রীচরণ দর্শন পাইতে পারিব) এইরূপ স্থির করিয়া সে শ্রীমন্দির-সংলগ্ন যে কোন এক স্থানে অবস্থান করিবার জন্য একটী চাকরী প্রার্থনা করিল। তখন মহারাজ স্থির বুঝিলেন, চাতক যেরূপ একবিন্দু জলের আশায় মেঘশূন্য আকাশ পানে চাহিয়া থাকে, এই যবনও সেইরূপ আমার নিকট তাহার সকল সুখ সাধ জলাঞ্জলি দিয়া ভগবানের দর্শন আশা করিয়াছে। যাহা হউক তিনি অনেক চিবেচনা করিবার পর এই চন্দ্র-মহলের বহির্ভাগে উদ্যানস্থ দ্বারে তাহাকে প্রহরীপদে নিযুক্ত করিলেন।

যবন এইরূপে কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া দিবারাত্র কেবল এক মনে এক প্রাণে সেই পতিতপাবন ভগবান শ্রীগোবিন্দজীউরই বিষয় চিন্তা করিত

এবং কিরূপে ভগবানের দর্শন পাইবে, ইহারই চেষ্টা করিতে আরম্ভ করিল।

এদিকে ভগবান শ্রীগোবিন্দজীউ একদা আপন লীলাখেলা প্রকাশ-চ্ছলে এবং তাঁহার ভক্তের বাসনা পূর্ণ করিবার নিমিত্ত জয়পুর হইতে শ্রীবৃন্দাবনের নিকুঞ্জ-কাননে, বৃষভানু-নন্দিনী শ্রীমতী রাধিকার সহিত কেলী-কৌতুক করিবার উদ্দেশে যাত্রা করিবার সময়, রাত্রিকালে নিজ-মূর্ত্তিতে এই যবনের নিকট আত্মপরিচয় দিয়া তাহাকে সঙ্গে লইলেন। যবন সেই শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী, হিন্দুদিগের ত্রাণকর্ত্তা শ্রীগোবিন্দজীউর অপরূপ রূপ দর্শন করিয়া, সকল দুঃখের অবসান করিল অধিকন্তু প্রভুর আজ্ঞা পালন করিতে তৎপর হইল। তখন ভগবান শ্রীগোবিন্দজীউ তাহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য, বৃন্দাবনে নিকুঞ্জবনের এক স্থানে স্বীয় মুক্তাকণ্ঠহার (যেন অসাবধান বশতঃ উহা পতিত হইয়াছে) নিক্ষেপ করিয়া উন্মত্তভাবে শ্রীরাধা-প্রেমে মত্ত হইলেন। কথিত যবন ঐ হার শ্রীগোবিন্দজীউর স্থির জানিতে পারিয়া তাঁহার রসালাপের সময় বিঘ্ন না ঘটাইয়া তৎক্ষণাৎ উহা উঠাইয়া আপন নিকটে রাখিয়া দিল; তৎপরে রাত্রি অবসানে যথাসময়ে তাঁহার সহিত স্বীয় পুরে প্রত্যাগমন করিল।

পর দিবস জয়পুর দেবালয়ের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া পূজারী—ভগবানের কণ্ঠদেশে মুক্তাহার দেখিতে না পাইয়া মহা চিন্তান্বিত হইলেন, এবং মনে মনে নানাপ্রকার যুক্তিতর্ক করিয়া, অবশেষে দুঃখিত মনে ভয়-বিহ্বলচিত্তে রাজার নিকট এই নিদারুণ সংবাদ পাঠাইলেন। নরপতি হার অপহৃত হইয়াছে শুনিয়াই পূজারীর নিকট কৈফেৎ চাহিলেন, তখন তিনি কোনরূপ সৎকৈফেৎ দিতে না পারিয়া, নিজেই লজ্জিত হইয়া মৌনাবলম্বন করিলেন; তদ্দর্শনে রাজা পূজারী ঠাকুরকেই দোষী স্থির করিলেন, কেননা দেবতার যাবতীয় দ্রব্যসামগ্রী তাঁহারই জিম্মায়

থাকে; অধিকন্তু নিত্য দেবসেবার পর রাত্রিকালে ঐ রুদ্ধ মন্দির দ্বারের চাবী পুজারীরই নিকটে থাকিত, সুতরাং রাজার বিচারে সেই পুজারীই দোষী সাবস্ত হইয়া কারারুদ্ধ হইলেন।

মুহূর্ত্ত মধ্যে নগরের প্রতি পল্লীতে পল্লীতে এই দুঃসংবাদ প্রচার হইল,এমন কি ঐ যবন দ্বারীর নিকটেও ইহা পৌঁছিল। এদিকে যবন—ব্রাহ্মণকে নির্দ্দোষী স্থির জানিয়া, সেই অপহৃত মুক্তাহারসহ মহারাজের নিকট হাজির হইল এবং যুক্তকরে পূর্ব্ব রাত্রির সমস্ত রহস্য প্রকাশ করিয়া ভগবানের হার প্রত্যাবর্ত্তন করিল,তখন মহারাজ সন্তুষ্টচিত্তে তাহার প্রতি এই আদেশ প্রদান করিলেন যে, "যাবৎ আমার রাজ্য থাকিবে, তাবৎ তোমার বংশানুক্রমে যে কেহ বর্ত্তমান থাকিবে, সেই ব্যক্তিই এই স্থানে এইপদে নিযুক্ত হইবে।" প্রহরীকে এইরূপ পুরস্কার দিবার প্রধান কারণ এই যে,তিনি যে অকপট ভক্তকে বিধর্ম্মীজ্ঞানে পুরীর বাহিরে নিযুক্ত করিয়াছিলেন,আজ লীলাময় ভগবান তাহারই দ্বারা আপন লীলা প্রকাশ করিলেন। ইহার পর তিনি পুজরীকে নির্দ্দোবী জানিতে পারিয়া তাঁহাকে মুক্তিদান পূর্ব্বক আপন মহত্ব প্রকাশ করিলেন।

পুরোহিত মহাশয়ের নিকট এইরূপে নিগূঢ় তত্ত্ব সকল সংগ্রহ করিয়া আমরা আবার সকলে সন্ধ্যার পর সেই মন্দির চত্বরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম, তখন প্রাসাদ হইতে এক ব্যক্তি আসিয়া "আরতির সময় হইয়াছে" বলাতে, চারিদিকেই হরিধ্বনি আরম্ভ হইয়া মন্দিরদ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল। যথাসময়ে শঙ্খ, ঘণ্টা ও আরতি-বাদ্যে মন্দির উদ্যানটী প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল; এ দৃশ্য যিনিই একবার দেখিয়াছেন, জনমে তিনি কখন ভুলিবেন না। কি মধুর ভাব! মন্দির-দ্বার উদ্‌ঘাটন হইবা মাত্র সাক্ষাৎ ভগবান যেন বৈকুণ্ঠ হইতে রাজবেশে হাস্য করিতে করিতে ভক্তদিগকে ঝাঁকি দর্শন

দানে উদ্ধার করিতে উপস্থিত হইলেন এইরূপ মনে হইল। শ্রীমূর্ত্তিটী ঊর্দ্ধে প্রায় পাঁচ হস্ত প্রমাণ, বামে সৌদামিনী শ্রীরাধিকা দেবীর ধাতু-নির্ম্মিত মূর্ত্তি শোভা পাইতেছে, এতদ্ভিন্ন তাঁহাদের সন্নিকটে রাজকন্যা তাম্বুল পাত্রসহ দণ্ডায়মান, কি অপরূপ শ্রীমূর্ত্তি! এই যুগলমূর্ত্তি এক উচ্চ রৌপ্যনির্ম্মিত পত্রপুষ্প শোভিত কুঞ্জ-ছটার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত। আরতিকার্য্য শেষ হইলে ভক্তগণ সাধ্যমত কেহ সিকি, কেহ দোয়ানি, কেহ পয়সা আবার কেহ বা ইংরাজি পাইপয়সা প্রণামী স্বরূপ প্রদান করিয়া মহাপ্রসাদ স্বরূপ তুলসীপত্র ও চরণামৃত স্বেচ্ছায় গ্রহণ পূর্ব্বক আপনাদিগকে চরিতার্থ বোধ করিতে লাগিলেন। আরতির পর হরি সংকীর্ত্তন আরম্ভ হইল। এই সময় আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত সেই সঙ্কীর্ত্তন-ওয়ালা গোস্বামী ও অপর দুইজন রাজপুত—খোলকরতাল বাজাইতে বাজাইতে মধুর কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন, সেই দুইজন রাজপুতের মুখে হরিনাম বড়ই মধুর শ্রুত হইতে লাগিল। এইরূপে শ্রীগোবিন্দজীউর দর্শন করিয়া এখান হইতে শ্রীশ্রীগোপীনাথজীউর শ্রীচরণ বন্দনা করিতে প্রস্তুত হইলাম।

শ্রীশ্রীগোপীনাথজীউ।

শ্রীশ্রীগোবিন্দজীউর দর্শনান্তে এবার আমরা সহরের অন্যত্র শ্রীগোপীনাথজীউর শ্রীচরণ বন্দনা করিতে যাত্রা করিলাম। সন্ধ্যার পর গ্যাসালোক শোভিত সুপ্রশস্থ রাজপথ ও মার্কেটগুলির শোভা দর্শন করিতে করিতে ক্রমে এক সঙ্কীর্ণ অন্ধকারময় গলিপথে প্রবেশ করিলাম, এ পথটী অপ্রশস্ত অথচ রাজপথের ন্যায় পাকা বাঁধা রাস্তা নয়, সুতরাং প্রতি পদবিক্ষেপে—পায়ের জুতা কাদায় বসিয়া যাইতে লাগিল, সে যাহাহউক এই গলিপথ অতি কষ্টে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইবার পর, শ্রীশ্রীগোপীনাথজীউর মন্দিরে উপস্থিত হইলাম। এই গলি পথটী

এত সঙ্কীর্ণ যে ঘোড়ার গাড়ী যাতায়াত করিতে পারে না, ইহার দুই পার্শ্বে বিস্তর মুদীর ও জ্বালানী কাষ্ঠের দোকান সকল বিদ্যমান থাকিয়া ইহা যে এক দরিদ্র পল্লী, তাহা স্পষ্টরূপে প্রকাশ করিতেছে। শ্রীগোপী-নাথজীউর মন্দিরটী—শ্রীগোবিন্দনাথজীউর ন্যায় উদ্যান মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়, ইহার মেজে হইতে দেওয়াল পর্য্যন্ত সমস্তই প্রস্তরময়, তার—নানাপ্রকার সোণালী ও রঙ-বেরঙের চিত্রের সহিত বিবিধ প্রকার শিল্প-কার্য্যে শোভিত। এখানে স্ত্রীলোকদিগের দেব দর্শনের জন্য রেলিং ঘেরা একটী পৃথক স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে,আর পুরুষেরা সম্মুখস্থ চত্বরে বসিয়া বা দাঁড়াইয়া ভগবানের পবিত্র মূর্ত্তির দর্শন করিয়া থাকেন। জয়পুরে এই উভয় দেবালয়েই শ্রীবৃন্দাবনের ন্যায় কোনরূপ ভেট নির্দ্দিষ্ট নাই, ভক্তগণ—সাধ্যমত যাহা দর্শনী দেন, পুরোহিত মহাশয় উহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে প্রসাদস্বরূপ ভগবানের শ্রীপদের তুলসী ও চরণামৃত প্রদান করিয়া থাকেন। শ্রীশ্রীগোপীনাথজীউর মূর্ত্তিটী কৃষ্ণপ্রস্তর নির্ম্মিত, কিন্তু শ্রীমতী মূর্ত্তিটী ধাতুনির্ম্মিত। শ্রীগোবিন্দজীউর মূর্ত্তি ও দেবালয় অপেক্ষা—ইহা সর্ব্বদিকে ছোট। এইরূপে দেব দর্শন ও মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া বাসাবাটীতে প্রত্যাগমন করিলাম।

পরদিবস প্রাতঃকালে যথাসময়ে বাসাবাটী হইতে বহির্গত হইয়া সহর পর্য্যাবেক্ষণ করিবার সময় ঘুরিতে ঘুরিতে দেখিলাম এখানে নানা ধরণের বিবিধ প্রকার হজমী আচার বিক্রয় হইতেছে, তন্মধ্যে লেবুর আচার উল্লেখ যোগ্য,সাধ্যমত কিঞ্চিৎ সংগ্রহ করিলাম তৎপরে আজমীঢ় নামক ফটকের সন্নিকটে মহারাজের পশুশালায় উপস্থিত হইলাম। এখানে নানাবিধ জীবজন্তু অর্থাৎ বানর, হরিণ, বনমানুষ প্রভৃতি হইতে ভীষণ হিংস্রজন্তু ব্যাঘ্র, ভল্লুক পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়। এই পশুশালার শোভা দেখিয়া এখান হইতে "গেটোরের" সমাধি-ক্ষেত্রের সৌন্দর্য্য

দেখিতে যাত্রা করিলাম। এখানে তেমন কোন দর্শনীয় বস্তু নাই, কেবল জয়পুরের কুশোয়া-রাজাদিগের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া এই স্থানে সম্পন্ন হইয়া থাকে; যে সকল রাজাদিগের সমাধি স্থান এখানে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার প্রত্যেক চুলীর উপর এক একটী ছত্রী নির্ম্মিত আছে, গেটোর সমাধিক্ষেত্রে যতগুলি চুলী আছে, তন্মধ্যে শ্বেতমর্ম্মর গম্বুজ ও কুড়িটী থাম্বা শোভিত মহারাজ জয়সিংহের ছত্রটী দেখিতে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর। এইরূপে গেটোর সমাধি-ক্ষেত্রের সৌন্দর্য্য দেখিয়া এখান হইতে মহারাজের রাম-নিবাসের শোভা দর্শন করিতে যাত্রা করিলাম।

রাম-নিবাস।

রাম-নিবাস—একটী উপবন। মহারাজ রামসিংহ এই পরম সুন্দর উপবনটী নির্ম্মাণ করাইয়া সাধারণের ব্যবহারার্থে স্থাপিত করিয়া কত উপকার করিয়াছেন, উহা লেখনীর দ্বারা ব্যক্ত করা যায় না। ইহার ন্যায় মনোহর উদ্যান ভারতবর্ষ মধ্যে অতি অল্পই আছে। অবগত হইলাম স্বয়ং মহারাজ চারি লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া ইহাকে মনের মত প্রস্তুত করিয়াছিলেন; অদ্যাপি ইহার রক্ষণাবেক্ষণ এবং মেরামতির জন্য প্রতি বৎসর সতের হাজার টাকা ব্যয় ধার্য্য আছে। এই উপবন মধ্যে যে সমস্ত পত্র পুষ্প ও ফলের গাছ আছে, উহা একে একে বর্ণনা করিলে একখানি বৃহৎ পুস্তক হয়। ইহার স্থানে স্থানে শ্যামল দুর্ব্বাক্ষেত্র, লতাকুঞ্জ, কৃত্রিম উৎস, সেতু ও সরোবর আবার ধাতব মূর্ত্তি সকল সন্নিবেশিত আছে। উদ্যান মধ্যস্থ এক স্থানে মাননীয় লর্ড মেয়োর প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। কোন স্থানে ব্যাণ্ড চত্বর। এই ব্যাণ্ড চত্বরে প্রতি সোমবার অপরাহ্ন কালে মহারাজের সুমধুর ব্যাণ্ড বাজে, এতদ্ভিন্ন সেই দুর্ব্বাক্ষেত্রসমূহে অপরাহ্নকালে মহারাজের কলেজের ছাত্রেরা অবসর মত কখন কখন ফুটবল ব্যায়ামক্রীড়া করিয়া থাকেন। সহরের বিস্তর

লোক সন্ধ্যাবায়ু সেবন করিবার সময় পরিতৃপ্ত হইয়া মহারাজের উদার চরিত্রের বিষয় গল্পচ্ছলে বলাবলি করিতে থাকেন। ইহা হইতে এই প্রমাণ পাওয়া যায় যে, ধন চিরস্থায়ী নয়, কিন্তু মনুষ্যের যশ ও কীর্ত্তি চিরস্থায়ী।

রাম-নিবাসের মধ্যস্থলে দুইটী ইমারত আছে। একটী মেয়ো-হাসপাতাল, অপরটী এলবার্ট হল নামে খ্যাত। এই দুইটীর মধ্যে এলবার্ট হলই দেখিবার বস্তু। এই হলের বারান্দায় দেওয়ালে প্রথমেই নানাবিধ সুন্দর সুন্দর তৈল-চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়, যতগুলি চিত্র এখানে অঙ্কিত আছে, তন্মধ্যে বিখ্যাত গ্রীকবীর সেকন্দর কর্ত্তৃক পারস্যের রাজা দরায়ুসের পরাজয়, হনুমান কর্ত্তৃক লঙ্কাদগ্ধ, দ্রৌপদীর বস্ত্র-হরণ প্রভৃতি চিত্রগুলি দর্শকবৃন্দের চিত্ত আকর্ষণ করিতে থাকে। ইহার মধ্যস্থলে জয়পুরের যাদুঘর অবস্থিত। এই যাদুঘরটী আয়তনে ছোট হইলেও ভারতীয় যে সমস্ত শিল্পজাত দ্রব্য ইহার মধ্যে সংস্থাপিত আছে, কেবল উহাই দর্শনে মোহিত হইয়া অর্থব্যয় ও পরিশ্রমের সার্থক মনে হয়। জয়পুরের সূক্ষ্ম কাজবিশিষ্ট পাথরের ও ধাতুনির্ম্মিত দেবদেবী মূর্ত্তি, খেলনা, নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র আরও সোণারূপার সূক্ষ্ম শিল্পবিশিষ্ট বিবিধ প্রকার বাসন দেখিবার বস্তু; এতদ্ভিন্ন ফল, ফুল, পাতা, কঙ্কালাকৃতি জীবজন্তু ও মনুষ্যের শারীরিক গঠনপ্রণালীর প্রতিকৃতি ইত্যাদি অত্যন্ত শিক্ষাপ্রদ। এইরূপে রাম-নিবাসের সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া এখান হইতে শ্রীশ্রীগোবিন্দজীউর শ্রীমন্দিরে ভগবানের আর একবার দর্শনের জন্য প্রস্তুত হইলাম।

শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিয়া এবারও ভগবানের ঝাঁকি দর্শন পূর্ব্বক প্রত্যাগমনকালে—আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত সেই গোস্বামী মহাশয় এদিন মধ্যাহ্নকালে ভগবানের প্রসাদ সেবা করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন,

তখন আমরা দুইটী টাকা ভোগের প্রসাদের মূল্য স্বরূপ প্রদান করিয়া আপন বাসাবাটীর ঠিকানা জানাইলাম এবং যথাসময়ে নির্দ্দিষ্ট বাসায় উপস্থিত হইলাম। অবগত হইলাম, যদি কোন ভক্ত এখানে শ্রীগোবিন্দজীউর প্রসাদ সেবা করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে পুরোহিত গোস্বামীজীউর নিকট উক্ত প্রসাদের মূল্যস্বরূপ ।।৵৹ আনা পয়সা জমা দিলে, যথাসময়ে তাঁহারা তাহার বাসায়, ভোগের প্রসাদ পৌছিয়া দেন। সে যাহা হউক,আমরা জয়পুরে যে সমস্ত স্থানের শোভা দর্শন করিয়াছি, গোঁসাইজী উহা একে একে এক্ষণে শ্রবণ করিয়া বলিলেন, আপনারা প্রায় এখানকার এক গলতা-পাহাড় ব্যতীত সমস্ত দ্রষ্টব্য স্থানই দর্শন করিয়াছেন, কিন্তু জয়পুরে যেরূপ হাওয়া-মহল, দরবারগৃহ প্রভৃতির শোভা দর্শন করিয়াছেন, সেইরূপ যদ্যপি জয়পুরের প্রাচীন রাজধানী "অম্বর" যাত্রা করেন, তাহা হইলে এইরূপ আবার তথায়ও অনেক কীর্ত্তিই দেখিতে পাইবেন, অধিকন্তু তথায় শ্রীশ্রীযশোরেশ্বরী মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তিরও দর্শন পাইবেন। প্রতি বৎসর অম্বরে এই স্থানে দুর্গোৎসবের মহাষ্টমীর দিবস এক মেলা বসে, তখন সহরের যাবতীয় ভক্তগণ তথায় উপস্থিত হইয়া সেই দেবী উদ্দেশে অজস্র ছাগ ও মহিষ বলি দিয়া থাকেন। তৎশ্রবণে আমরা গোঁসাইজীকে জিজ্ঞাসা করিলাম,"অম্বর এখান হইতে কতদূর ?" উত্তরে তিনি বলিলেন "অম্বরের অপর নাম "আমের"। ইহা জয়পুর রাজ্যের প্রাচীন রাজধানী। মোগল সম্রাট আকবরশাহের সেনাপতি বিখ্যাত বীর "রাজা মানসিংহের রাজধানীর নাম কে না শুনিয়াছেন ? অম্বর আরাবল্লীর শাখা কালীখো পর্ব্বতমালার উপরে অবস্থিত। এই কালীখো পর্ব্বতমালা বর্ত্তমান জয়পুর সহরকে উত্তরদিকে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে বেষ্টন করিয়া আছে। অম্বরের সেই প্রাচীন রাজপ্রাসাদটী এখান হইতে

ন্যূনাধিক চারি ক্রোশ দূরে ঐ পর্ব্বতমালার উত্তুঙ্গ-শৃঙ্গের উপরিভাগে প্রতিষ্ঠিত ও তন্নিম্নে একটী সুন্দর উপত্যকার মধ্যে সেই প্রাচীন সহরটী অবস্থিত। জয়পুরের কুশোয়া-রাজাদিগের উপাস্য দেবতা "অম্বকেশ্বর" নামক মহাদেবের লিঙ্গমূর্ত্তি এখানে প্রতিষ্ঠা থাকায়, সেই দেবের নামানুসারে ঐ সহরের নাম অম্বর হইয়াছে।

মহারাজ মানসিংহ বঙ্গবিজয়ের পর,বঙ্গদেশ হইতে যে মহিষমর্দ্দিনীমূর্ত্তি সযত্নে আনয়ন করিয়া অম্বরে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন,সেই দেবীমূর্ত্তিই তথায় যশোরেশ্বরী নামে প্রসিদ্ধ। তথাকার এই দেবী সম্বন্ধে প্রবাদ—মহারাজ মানসিংহ যশোরের প্রতাপশালী মহারাজা প্রতাপাদিত্যকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়া, যশোহর হইতে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত যশোরেশ্বরীদেবীকে অম্বরে আনিয়াছিলেন, আবার কেহ কেহ বলেন, বিক্রমপুরের রাজা কেদার রায়কে মহারাজা মানসিংহ যুদ্ধে পরাজিত করিয়া তথা হইতে তিনি মহিষ-মর্দ্দিনী মূর্ত্তি, তৎসঙ্গে কেদার রায়ের পুরোহিত মহেশানন্দ ভট্টাচার্য্য মহাশয়কেও এই অম্বরে আনিয়া দেবীর নিত্য সেবার বন্দোবস্ত করেন। তাঁহার বংশধরেরা অদ্যাপি জয়পুর রাজষ্টেট হইতে সসম্মানে প্রতিপালিত হইয়া থাকেন। মায়ের নাতিবৃহৎ শিলামূর্ত্তিখানি তথায় রক্তবসনে ভূষিতা,সেই মূর্ত্তির সমস্ত অবয়বের মধ্যে কেবল রক্তবর্ণ নেত্রদুটী ভক্তগণ দর্শন পাইয়া থাকেন। দুঃখের সহিত লিখিতেছি সময়াভাবে আমাদের তথায় যাওয়া বা দেবী দর্শন ঘটে নাই। গোঁসাইজীর নিকট অম্বরের ও যশোরেশ্বরীর তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়া বাসাবাটীতে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক বিশ্রাম করিতেছি, ইত্যবসরে ভগবানের ভোগের প্রসাদ তথায় উপস্থিত হইল। এই অন্নপ্রসাদের সহিত লুচি, পুরি, পাঁপর ভাজা, বিবিধ প্রকার মিষ্টান্ন প্রভৃতি শ্রীধাম বৃন্দাবনের ঠাকুর বাড়ীর মত সমস্তই দেখিলাম। তৎপরে বিশ্রামের পর অপরাহ্নকালে আর একবার পুরোহিত ও

গোঁসাইজীউর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া শেষ বিদায় লইবার সময় তিনি আমাদিগকে এখান হইতে গলতা-পাহাড়ের সৌন্দর্য্য দর্শন করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছি দেখিয়া, গোঁসাইজী অপরাহ্ন কালে আমাদিগকে সেই গলতা যাত্রা করিতে নিষেধ করিলেন, সুতরাং সেদিন সহরে অবস্থান করিয়া পরদিন প্রত্যুষে তথায় যাত্রা করিয়াছিলাম।

গলতা পাহাড়।

জয়পুর সহরের উত্তর-পূর্ব্বদিকে প্রায় চারি মাইল দূরে চতুর্দ্দিক শৈল-মালা বেষ্টিত একটী পরম সুন্দর উপত্যকা আছে, সেই উপত্যকার নাম গলতা। কথিত আছে, পুরাকালে গালব ঋষির এখানে বনাশ্রম ছিল। জয়পুর সহর হইতে শকটারোহণে এই পর্ব্বতের পাদমূল পর্য্যন্ত অক্লেশে যাওয়া যায়, তাহার পর পদব্রজে প্রায় এক মাইল পথ অতিক্রম করিয়া পাহাড়ের অপর পার্শ্বে গলতা নামক উপত্যকায় উপস্থিত হইতে হয়। স্মরণ রাখিবেন দলমধ্যে লোক অধিক না থাকিলে একা এস্থানে আসা নিরাপদ নহে, কারণ এখানে যে ঝরণা আছে,ঐ ঝরণায় ছোট বড় ব্যাঘ্রাদি যখন তখন জল পান করিয়া থাকে; তাহারা কাহাকে নিঃসহায় অবস্থায় এখানে পাইলেই উহাদের প্রতি অত্যাচার করিয়া থাকে। এ উপদেশটি গত কল্য গোঁসাইজীর নিকট পাইয়াছিলাম, সে যাহাহউক, গলতা-পাহাড়ের প্রাকৃতিক শোভা অতি মনোহর! চতুর্দ্দিকে উন্নত পর্ব্বতমালা,তাহার মধ্যস্থলে এই মণি-মনোহর পরম সুন্দর উপত্যকা আপন শোভা বিস্তার করিয়া আছে। ইহার শিখরদেশ হইতে একটী ক্রীড়া-শীল চঞ্চল গিরি-নির্ঝর এক শৃঙ্গ হইতে শৃঙ্গান্তরে পতিত হইয়া শেষে উপত্যকায় অবতরণ করিয়াছে। এই স্থানেই ব্যাঘ্রের ভয়। এখানে এই ঝরণার জলে দুইটী পবিত্র

কুণ্ডের সৃষ্টি হইয়াছে। সেই কুণ্ড দুইটী সদা সর্ব্বদা জলে পূর্ণাবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য এই কুণ্ডদ্বয়ের পবিত্র শীতল উদকে পরিশ্রান্ত হিন্দুযাত্রীরা স্নানাবগাহন করিয়া চরিতার্থ বোধ করিয়া থাকেন।

যে স্থানে গালব-ঋষির আশ্রম ছিল, সেই নির্দ্দিষ্ট স্থানে অহঃরহ হোমাগ্নি জ্বলিতাবস্থায় আছে, অর্থাৎ ঋষিবর এখানে প্রথমে যে হোমাগ্নি প্রজ্বলিত করিয়াছিলেন, তাঁহার শিষ্যেরা এযাবৎ কাল সেই হোমাগ্নি বহু যত্নে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। বর্ত্তমানকালে মুনি-বরের সেই কীর্ত্তি অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য জয়পুর রাজ-সরকার হইতে ঐ হোমাগ্নি রক্ষা করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। এই হোমাগ্নি হিন্দুদিগের কত পবিত্র, কত আদরণীয়, তাহা নূতন করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে না। নিত্য কত শত হিন্দু যাত্রী এই হোমাগ্নি দর্শন ও স্পর্শ করিয়া আপনা-দিগকে চরিতার্থ বোধ করিয়া থাকেন তাহার ইয়ত্তা নাই; এতদ্ভিন্ন গলতা-পাহাড়ের স্থানে স্থানে বিস্তর হিন্দু দেবদেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠা আছে। যাত্রীগণ এই হোমাগ্নি স্পর্শ করিবার জন্যই এত কষ্ট স্বীকার করিয়া এখানে আসিয়া থাকেন। জয়পুর হইতে খাণ্ডব বন,—এই বিস্তৃত ভূভাগ মৎস্যদেশ নামে খ্যাত, অর্থাৎ বিরাট রাজার রাজত্ব ছিল। এইরূপে গলতা-পাহাড়ের শোভা দর্শন করিয়া এখান হইতে পুস্কর তীর্থ, যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইয়া স্থানীয় ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। এখানকার ষ্টেশনে সংবাদ পাইলাম যে, রাত্রি ১১টার সময় আজমীঢ়ের গাড়ী পাওয়া যাইবে, সুতরাং অবশিষ্টকাল ষ্টেশনের এধার ওধার বেড়াইতে বেড়াইতে বহু সময় নষ্ট করিয়া ট্রেণের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

পুস্করতীর্থে যাইতে হইলে—যাত্রীদিগকে জয়পুর ষ্টেশন হইতে আজমীঢ় নামক ষ্টেশনে অবতরণ করিতে হয়। আগ্রা হইতে

আজমীঢ় কমবেশ ২৪০ মাইল, আর এই জয়পুর হইতে মাত্র ৮৪ মাইল দূরে অবস্থিত। আমরা সন ১৩১৭ সালের ভাদ্র মাসে জন্মাষ্টমীর ২।১ দিন পূর্ব্বে পুষ্কর তীর্থে যাত্রা করিয়াছিলাম, এই সময় বৃন্দাবন হইতে ভগবানের ঝুলন দর্শনের ফেরৎ যাত্রীরা প্রায়ই পুষ্করতীর্থের সেবা করিয়া থাকেন, সুতরাং ট্রেণে এত জনতা হয় যে, যাত্রীগণকে তখন স্থানাভাবে অত্যন্ত কষ্ট ভোগ করিতে হয়। সে যাহাহউক যথাসময়ে আজমীঢ়ের ডাকগাড়ী ছপা ছপ শব্দে এখানে আসিয়া আপন গতিরোধ করিল; তখন যাত্রীগণও অবসর মত ট্রেণে উঠিবার কিছুক্ষণ পরেই ষ্টেশন হইতে সঙ্কেতসূচক ঘণ্টাধ্বনি হইলে, ট্রেণখানি আবার মৃদুমন্দ গতিতে পশ্চিমাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল।

সমস্ত দিন পরিশ্রমের পর ট্রেণে স্থান পাইয়া সুস্থ শরীরে একবার ভগবানের পবিত্র নাম উচ্চারণ করিলাম এবং পরক্ষণেই নিদ্রাদেবীর কোমল ক্রোড়ে বিশ্রাম পাইলাম। এইরূপে কিয়ৎকাল নিদ্রার পর অতি প্রত্যূষে যখন ঊষা সতী শ্বেতশুভ্র বসনাবৃতা হইয়া ধরণী-বক্ষে উঁকি মারিতেছিলেন, সেই সময় সুখনিদ্রা ভঙ্গ হইবামাত্র, চারিদিকেই অনন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বতমালা দেখা যাইতে লাগিল। কল্পনা রাজ্যের ছবির ন্যায় ঐ সকল পাহাড়ের গায়ে স্তরে স্তরে সজ্জিত ঘর বাড়ীগুলির মনোহর দৃশ্য দেখিয়াই চমৎকৃত হইলাম। এইরূপে সেই চলন্ত ট্রেণখানি আজমীঢ় ষ্টেশনের যত নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, গাড়ীর ভিতর হইতে সহরের নানাপ্রকার নয়নানন্দদায়ক শোভা দেখিয়া ততই বিস্মিত হইতে লাগিলাম। এ সহরের চারিদিকে অভ্রভেদী পর্ব্বতমালার মধ্যে যেন ইহার স্বভাব সৌন্দর্য্য লুকাইয়া রহিয়াছে, চতুষ্পার্শ্বেই কেবল অনন্ত পাহাড়শ্রেণী, তাহার মধ্যে সর্ব্বোচ্চ শিখর "তারাগড়" সগর্ব্বে আপন

শোভা বিস্তার করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, আবার তাহারই পাদমূলে অপেক্ষাকৃত অনুচ্চ তরুলতা শোভিত শ্যামল সুন্দর পাহাড়ের গায়ে স্তরের পর স্তর দুগ্ধফেণনিভ শ্বেতহর্ম্ম্যরাজি শোভা পাইতেছে, তাহার অঙ্গে অরুণোর কিরণ সম্পাতে কি শোভাই ফুটিতেছে, আবার সেই শ্যামবৃক্ষপত্র শোভার মধ্যে কতকগুলি শ্বেতবর্ণের গৃহ, যেন পুষ্পবৎ প্রতীয়মান হইতেছে, ঐ সকল ঘরবাড়ীগুলি ঠিক যেন পাহাড়ের গাত্র হইতে খাদের দিকে ঝুকিয়া পড়িতেছে, কি মনোহর দৃশ্য! এইরূপে দূর হইতে এখানকার নানাপ্রকার প্রাকৃতিক শোভা নয়নগোচর করিতে করিতে প্রাতে বেলা ছয় ঘটিকার সময়, সেই যাত্রীপূর্ণ ট্রেণখানি যথাসময়ে আজমীঢ় নামক ষ্টেশনে উপস্থিত হইল। রাজপুতনার মধ্যে এই "আজমীঢ়" ভারত গভর্ণমেণ্টের একটী প্রধান আস্তানা, সুতরাং ইহা এক জমকাল জংশন ষ্টেশনে পরিণত হইয়াছে।

ষ্টেশনের সন্নিকটে বাঙ্গালী যাত্রীদিগের বিশ্রামের জন্য একটী ধর্ম্মশালা আছে, তথায় কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিয়া পুষ্করতীর্থ স্থানে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। আজমীঢ় হইতে পুষ্কর তীর্থ অন্যূন ৪।৫ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। ধর্ম্মশালার মধ্যে বিস্তর নানা ধরণের ঘোড়ার গাড়ী অর্থাৎ পাল্কীগাড়ী, একাগাড়ী ও রক্‌রাইড টম্‌টম নামে এক প্রকার গাড়ী আছে, উহাতে চারিজন লোক অক্লেশে বসিতে পারেন, কিন্তু ইহাতে পাল্কী গাড়ীর ন্যায় চাল নাই, রৌদ্র ও বৃষ্টি হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য প্রত্যেক গাড়ীখানিতে একটী ক্যামবিশের আচ্ছাদনী আছে। পুষ্কর যাত্রার নিমিত্ত ঐরূপ তিনখানি গাড়ী ডাকা হইল, প্রত্যেক গাড়ীখানি যাতায়াতের জন্য ছয় টাকা হিঃ ভাড়া ধার্য্য হইল। বলা বাহুল্য যে দিবস আমরা তথায় যাইলাম, তাহার পরদিন অপরাহ্ণ কালে তথা হইতে প্রত্যাগমন করিব এইরূপ চুক্তি হইয়াছিল। যাত্রীগণ এই তীর্থে যাইবার

সময় এইরূপ রক-রাইড-টমটমই ভাড়া করিবেন, কারণ যাহারা একদিনে এখানকার তীর্থ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া ফিরিবেন, তাহাদের ৩৲ হইতে ৩।৹ টাকা ভাড়া লাগে, কিন্তু যাত্রী সমাগম অধিক হইলে, ভাড়ার হার ৪৲ টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়া থাকে। যে সকল যাত্রী এই অপরিচিত স্থানে একা বা পাল্কী গাড়ী ভাড়া করিবেন তাঁহাদিগকে কিয়দ্দূর গমন করিয়া এক বিস্তৃত পার্ব্বত্যপথে উপস্থিত হইবা মাত্র গাড়ী হইতে নামিয়া, সেই প্রশস্ত পথ হাটিয়া যাইতে হয়; অথচ গাড়ীর পুরা ভাড়াও দিতে হয়, ইহাতে তাঁহাদের অত্যন্ত অসুবিধা হইয়া থাকে, কিন্তু যাহারা রকরাইড টম্‌টম্ ভাড়া করিবেন, তাঁহাদিগকে এই ভয়াবহ স্থান অতিক্রম করিবার সময় গাড়ী হইতে নামিতে হয় না, কারণ এইরূপ গাড়ী অত্যন্ত হাল্কা ও দ্রুতগামী, সুতরাং পাহাড়ে উঠিবার সময় গাড়ী হইতে নামিতে হয় না, বা ইহার জন্য ভাড়াও অধিক দিতে হয় না। স্থানীয় অধিকাংশ সভ্যলোকেরা এরূপ টম্‌টমে আরোহণ পূর্ব্বক সহর পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন।

আজমীঢ়।

পূর্ব্বেই উল্লেখ হইয়াছে, আজমীঢ় জয়পুর হইতে ৮৪ মাইল আর আগ্রার পশ্চিমে অন্যূন ২৪০ মাইল দূরে অবস্থিত। তারাগড় নামক পর্ব্বতের নিম্নতর পর্ব্বতাঞ্চল ইহার রাজ্যভুক্ত। পর্ব্বতের উপরে এক অতি উচ্চ দুর্গ প্রতিষ্ঠিত ছিল। অবগত হইলাম পূর্ব্বে এই উচ্চ পর্ব্বতের শিখরদেশে মহারাজ অজের প্রতিষ্ঠিত এক অদ্ভুত দুর্গ বর্ত্তমান ছিল; মুসলমান আমলে ঐ বিশাল দুর্গের ভগ্নাবশেষ মেরামত হয়, তৎপরে ইংরাজ আমলে লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের সময়, সেই দুর্গস্থানটী সম্পূর্ণ রূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া এক্ষণে এই স্থানে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের সৈন্যদিগের স্বাস্থ্যবাস প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

নগরের চারিদিকে প্রস্তরময় প্রাচীর, এই প্রাচীরের পাঁচটী দ্বার আছে, ঐ সকল দ্বার দিয়া সকলে অবাধে সহর মধ্যে যাতায়াত করিয়া থাকেন। রাস্তাগুলি পরিস্কার ও প্রশস্ত; এই প্রশস্ত পথের দুই পার্শ্বে বিস্তর সুন্দর সুন্দর বাটী নির্ম্মিত হইয়া সহরের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতেছে। ইতিহাস পাঠে জানিতে পারা যায়, ১৪০৫ খৃঃ এই নগর স্থাপিত হয়। নগর প্রাচীরের বহির্ভাগে মোগল সম্রাট আকবর এক অট্টালিকা নির্ম্মাণ করান; তৎপরে সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে, অল্পদিনের জন্য এই আজমীঢ় নগরে তাঁহার রাজধানী স্থাপিত হইয়াছিল। গত শতাব্দীতে মহারাষ্ট্রীয়েরা আপন বাহুবলের পরিচয় দিয়া সেই মোগল রাজধানী আজমীঢ় নগরটী অধিকার করেন। তৎপরে সহরটী ১৮১৮ খৃঃ পর্য্যন্ত মহারাষ্ট্রীয়দিগেরই অধীনে থাকে, শেষে সিন্ধিয়ার মহারাজ ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টকে এই সহরটী স্বেচ্ছায় ছাড়িয়া দেন।

আজমীঢ়ের দক্ষিণ-পশ্চিমে মেয়াড়ওয়ারা নামক এক পর্ব্বতময় প্রদেশ আছে। কএক শতাব্দীকাল এ প্রদেশের লোকেরা দস্যুবৃত্তি করিয়া বেড়াইত; পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশের লোকেরা ইহাদের ভয়ে সতত সশঙ্কিত থাকিত। ইহারা এত অসভ্য ছিল যে মনুষ্যের জীবন ও স্বাধীনতা তৃণবৎ জ্ঞান করিত, আপন সন্তান সন্ততিদিগের প্রাণসংহার করিতে কুণ্ঠিত হইত না এমন কি টাকার লোভে আপন গর্ভধারিণীকে পর্য্যন্ত বিক্রয় করিত।

যখন এই দেশ প্রথমে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের হস্তগত হয়, তখন সশস্ত্র লোকেরা নানাস্থানে অর্থাৎ পাহাড়ের ও পথের মোড়ে মোড়ে চৌকি দিত, রাজ-কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে কাহাকেও দেখিতে পাইলে ইহারা তৎক্ষণাৎ তাহার প্রাণ সংহার করিত, আবার যে সকল লোক

রাজার বিচারে দোষী সাব্যস্ত হইয়া কারারুদ্ধ হইত, তাহারা দলবদ্ধ হইয়া ঐ সকল কয়েদীদিগকে ছাড়াইয়া দিত। এইরূপে কিছুদিন অতিত হইবার পর,একদা "কাপ্তেন হল" নামক একজন সদাশয় ইংরাজ পুরুষ ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট হইতে এজেণ্ট স্বরূপ তথায় উপস্থিত হইলেন, তাঁহার ঐকান্তিক চেষ্টা এবং পরিশ্রমের ফলে সেই সকল অসভ্য মেয়াড়ওয়ারাদিগকে লইয়া আপন সৈন্যদলভুক্ত করিয়া এক পল্টন প্রস্তুত করেন, সেই মহাত্মার কৃপায় তাহারা সকলেই বিশ্বাসী হইয়া উঠে, ক্রমে এই সকল শিক্ষিত সিপাহীদিগের সাহায্যে ঐ সকল ডাকাইতের দল বিলুপ্ত হয়।

তৎপরে ১৮৩৫ খৃঃ কাপ্তেন ডিক্সন্, সেই হাল সাহেবের পদে নিযুক্ত হইলেন। তিনি স্থির করিলেন মিঃ হাল—আপন প্রতিভাবলে যেরূপ ডাকাতের দল নির্ম্মূল করিয়াছেন,আমাকেও সেইরূপ এই সকল অসভ্যদিগকে কৃষিকার্য্য শিক্ষা দিয়া এ দেশে শান্তি স্থাপন করিতে হইবে। এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া তিনি এই শুভ কার্য্যে তৎপর হইলেন, কিন্তু এ প্রদেশের অবস্থা এমন কদর্য্য ছিল যে, কেহ ভূ-সম্পত্তির উপার্জ্জন গ্রাহ্য করিত না; ইহার প্রধান কারণ এই যে, এ প্রদেশটী একে পর্ব্বতময়, তায় বৃষ্টির জল ধরিয়া রাখিতে না পারিলে, ঐ জল দুই দিক দিয়া সরিয়া যাইত, এই সকল অসুবিধা থাকায়, তিনি অকাতরে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া উপত্যকায় বাঁধ ও স্থানে স্থানে কূপ সকল খনন, আবার সুবিধা মত প্রশস্ত স্থানে পুষ্করিণী কাটাইয়া দিলেন, কেননা এ প্রদেশে বৃষ্টিপাতের কোন নিশ্চয়তা ছিল না। ইহাতে জলকষ্ট অনেক পরিমাণে দূর হইল; এতদ্ব্যতীত অগ্রিম টাকা কর্জ্জ দিয়া অধিবাসীদিগকে কৃষি-কার্য্য করিতে উৎসাহ দিতে লাগিলেন। এইরূপে ঐ সকল অসভ্য ডাকাইত দল ক্রমে পরিশ্রমশীল কৃষক হওয়াতে

তাঁহার চেষ্টা সফল হইল এবং দেশে আপনাপনি শান্তি সংস্থাপিত হইল।

অতঃপর ডিক্সন সাহেব—এ দেশে ব্যবসায়ী লোকদিগকে নানাপ্রকার আশ্বাস প্রদান করিয়া, তাহাদের বসতির জন্য নয়া-নগর নামে একটী পল্লী এখানে নির্ম্মাণ করাইয়া, উহাই তাহাদের বাসস্থান নির্দ্দেশ করিলেন। ব্যবসায়ীরা ইহাতে সন্তুষ্টের পরিবর্ত্তে বরং ভীত হইল, কারণ উহারা স্থির জানিতে পারিল—ঐ সকল দস্যু কর্তৃক তাহাদের যথা-সর্ব্বস্ব অপহৃত হইবে। তখন বিজ্ঞ ডিক্সন্ সাহেব ব্যবসায়ীদিগের সেই ভয় দূরিকরণার্থে নগরের চারি ধারে সুদৃঢ় উচ্চ উচ্চ প্রাচীর প্রস্তুত করাইয়া ইহাকে নিরাপদ করিলেন। নগরটী এইরূপে নিরাপদ হইলে অতি অল্প দিনের মধ্যে সেই নয়া-নগরে অন্যূন বিশ সহস্র পরিবার আপনাপন স্ত্রী পুত্র লইয়া বাস করিতে লাগিল। ইহার ফলে—মেয়াড়ে ওয়ারা ক্রমে পর্ব্বত-পার্শ্বস্থ নিভৃত স্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমতল নিম্ন-ভূমিতে আপনাদের ক্ষেত্রের নিকট কুটির নির্ম্মাণ করিতে লাগিল, এবং সভ্য জাতিদিগের সহবাসে আপনা হইতে স্ত্রীলোক বিক্রয় বা হত্যাকাণ্ড বন্ধ করিয়া দিল; তদ্দর্শনে ডিক্সন সাহেবের আনন্দের সীমা রহিল না। এক্ষণে তাহাদের সুস্থ শরীর, প্রফুল্ল হৃদয় ও উত্তম বেশ-ভূষা দেখিলে, ইহাদের সৌভাগ্যের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে বলিয়া স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

মেয়াড়িওয়ারা—দেশে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট প্রজার মঙ্গলার্থে যে প্রকার যত্ন ও পরিশ্রম করেন, এদেশের জমীদারেরা যদি রাইয়তদিগের শ্রীবৃদ্ধির জন্য তদ্রূপ যত্ন করিতেন, তাহা হইলে বঙ্গদেশেরও কোন্ কালে শ্রী ফিরিত, সন্দেহ নাই।

আজমীঢ়ের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে উদয়পুর বা মেওয়াড় নামে এক

রাজপুত রাজ্য আছে। সূর্য্যবংশীয় জ্যেষ্ঠশাখার বংশধর বলিয়া তাঁহারা পরিচয় দিয়া থাকেন। উদয়পুরের রাণা বংশধরদিগকে সকলেই শ্রদ্ধা ও সমাদর করিয়া থাকেন; ইহার প্রধান কারণ এই যে হিন্দুরা—এই সকল রাণাদিগকে শ্রীরামচন্দ্রের বংশধর বলিয়া মান্য করেন। কথিত আছে, এই উদয়পুরের রাণারা—মোগল সম্রাটদিগের প্রাদুর্ভাব কালে যেরূপ শৌর্য্যবীর্য্যের পরিচয় দিয়া দীর্ঘকাল তাঁহাদের সৈন্যদিগের গতিরোধ করিয়াছিলেন, অদ্যাপি অপর কোন জাতি সেরূপ করিয়াছিলেন বলিয়া ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় না; বিশেষতঃ এই রাজবংশীয়গণের অহঙ্কার করিবার প্রধান কারণ এই যে, তাঁহারা কখন কোন বিধর্ম্মী বা মোগল সম্রাটদিগের নিকট আপন মর্য্যাদা নাশ করিয়া কোন সুন্দরী কন্যাকে উপহার স্বরূপ দান করেন নাই। প্রমাণ-স্বরূপ দেখুন—খিলিজি বংশীয় সম্রাট আলাউদ্দিন ১২৯৪ খৃঃ দাক্ষিণাত্য প্রদেশ আপন বাহুবলে অধিকার করেন, ইতিপূর্ব্বে অনেক মুসলমান সম্রাট এ প্রদেশে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু কখন কেহ দাক্ষিণাত্য প্রদেশ—জয় করিতে পারেন নাই; এই আলাউদ্দিনই তাঁহাদের সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। যে সময় সম্রাট আলাউদ্দিন এই অসম সাহসের পরিচয় দেন, সেই সময় চিতোরের রাণা ভীমজীর রাণী পদ্মিনীর—রূপলাবণ্যের প্রশংসা শ্রবণ করিয়া তিনি তাঁহাকে বেগম করিবার অঙ্গীকার করিলেন, কিন্তু রাণা তাঁহার প্রস্তাবে অসন্তুষ্ট হইয়া উহা প্রত্যাখ্যান করাতে—আলাউদ্দিন ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া এবং আপন অঙ্গীকার বজায় রাখিবার জন্য স্বয়ং বহু সহস্র শিক্ষিত সৈন্যসমভিব্যাহারে সেই গর্ব্বিত রাণার দর্পচূর্ণ করিবার অভি-প্রায়ে চিতোর নগর অবরোধ করিলেন। এইরূপে দীর্ঘকাল নগর অবরোধ হওয়াতে—রাণাকে অত্যন্ত বিপন্ন হইতে হইল; কিন্তু সম্রাট এত

কষ্ট স্বীকার করিয়াও নগরটী হস্তগত বা তাঁহাকে বশীভূত করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন আলাউদ্দিন নিজের দুরভিসন্ধি গুপ্ত রাখিয়া, রাণার নিকট সংবাদ পাঠাইলেন যে, "মাননীয় রাণা যদি পদ্মিনীর পরিবর্ত্তে আয়না মধ্যে কেবল তাঁহার স্ত্রীর মুখশ্রী একবার সম্রাটকে দেখান, তাহা হইলে, তাঁহার অঙ্গীকার পূর্ণ হয়,অধিকিন্তু তিনি নির্ব্বিবাদে নগরটী মুক্ত করিয়া স্বরাজ্যে প্রস্থান করিবেন"। সরল হৃদয় রাণা—সম্রাটের চাতুরী না বুঝিয়া তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন, এবং সম্রাটকে সাদরে আহ্বান পূর্ব্বক আয়না মধ্যে চিতোর রাজলক্ষ্মীর প্রতিমূর্ত্তি দেখাইলেন এবং ভদ্রতা রক্ষার্থে সম্রাটের প্রত্যাগমন কালে শিবিরের সীমানা পর্য্যন্ত স্বয়ং তিনিও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে গেলেন।

এদিকে বিশ্বাসঘাতক আলাউদ্দিন এক্ষণে তাঁহাকে আপন আয়ত্তে পাইয়া বন্দি করিয়া রাখিলেন, অধিকন্তু আদেশ করিলেন, "যদি তুমি আমার আদেশ মত পদ্মিনীকে এই দণ্ডে আমার নিকট না আনিয়া দাও, তাহা হইলে আমি নিশ্চয় তোমায় যন্ত্রণা দিয়া সামান্য পশুর ন্যায় বধ করিব"। মুহূর্ত্ত মধ্যে পদ্মিনীর নিকট এই অশুভ বার্ত্তা পৌছিলে, তিনি পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে—কোন প্রকারে চতুরে চতুরে সদ্ভাব রাখিয়া রাণাকে নিরাপদ করিতে হইবে। এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া সেই বুদ্ধিমতী পদ্মিনী, সম্রাটের নিকট সংবাদ পাঠাইলেন, "আমি রাণার অমতে বাদশাহের স্ত্রী হইতে পারিব,তথাপি জীবিত থাকিতে পূজনীয় রাণাকে প্রাণে হত্যা করিতে দিব না।" সম্রাট আলাউদ্দিন পদ্মিনীর বাক্যে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন, এবং শীঘ্র তাঁহার শিবিরে রাণীকে আসিতে উপদেশ প্রদান করিলেন। সম্রাটের উপদেশানুসারে সেই পদ্মিনী—বহুসংখ্যক সাহসী সুসজ্জিত যোদ্ধাকে নারীবেশে সঙ্গে লইয়া অশ্বারোহণে যবন শিবিরে উপস্থিত হইলেন।

সম্রাট আলাউদ্দিন তখন রাণীকে সঙ্গীনীগণসহ শিবিরে আসিতেছেন দেখিয়া বিনা আপত্তিতে সকলকে প্রবেশ করিতে হুকুম দিলেন। এদিকে মহাবীর রাণা—রাণীকে সেই যবন শিবিরে দেখিবা মাত্র মর্ম্মান্তিক দুঃখিত হইলেন, অধিকন্তু জীবনের শেষ বিদায় গ্রহণ করিতে আপন পত্নীর নিকট উপস্থিত হইলে—সেই সকল নারীবেশধারী বিশ্বাসী যোদ্ধারা আপনাদের রাজা ও রাণীকে তাহাদের অশ্বপৃষ্ঠে উঠাইয়া লইয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে চিতোর নগরে উপস্থিত হইলেন। এক্ষণে সম্রাট আলাউদ্দিন—রাণীর চাতুরী বুঝিতে পারিয়া প্রতিশোধ লইবার জন্য পুনরায় তাঁহার যাবতীয় বীর সৈন্যসমভিব্যাহারে চিতোর নগর আক্রমণ করিলেন।

রাজপুতদিগের সমাজে এক ভয়ানক রীতি প্রচলিত আছে ;—যদি কোন বলবান শত্রু—পুরী বা নগর আক্রমণ করে আর রাজপুতদিগের দ্বারা যদ্যপি ঐ সকল শত্রু পরাস্ত না হয়, তাহা হইলে শেষ অবস্থায় তাঁহারা আপনাপন স্ত্রী পুত্রদিগকে বিনাশ করিয়া ভীমবিক্রমে রণক্ষেত্রের সম্মুখযুদ্ধে প্রাণত্যাগ করেন, তথাপি কাহারও নিকট হীনতা স্বীকার করেন না। এবার ভীমজী বিশ্বাসঘাতক আলাউদ্দিন কর্ত্তৃক পরাজিত হইলে, শেষ মুহূর্ত্তে তাঁহাকেও এই পন্থা অবলম্বন করিতে হইয়াছিল।

চিতোরে বিস্তর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গুহা ছিল, রাণা ভীমজী যখন স্থির বুঝিলেন যে, আলাউদ্দিনের নিকট কিছুতেই তাঁহাদের পরিত্রাণ নাই, তখন স্বীয় পত্নী পদ্মিনীকে ভগবানের পবিত্র নাম উচ্চারণ করাইয়া পুরমহিলাগণের সহিত স্থানীয় এক গুহা মধ্যে সকলকে প্রবেশ করিতে আদেশ করিলেন, বলা বাহুল্য পূর্ব্ব হইতে ঐ গুহায় অগ্নিকুণ্ড সজ্জিত ছিল। পদ্মিনী—জীবনের শেষ অবস্থা স্থির জানিয়া সহস্র সহস্র

পুরস্ত্রীগণকে সঙ্গে লইলেন, এবং পূজনীয় রাণার আদেশ পালন করিলেন। এদিকে রাজপুতেরা—ঐ অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জ্বলিত করিয়া গুহার মুখ বন্ধ করিয়া দিলেন। এইরূপে রাজপুতদিগের যাবতীয় স্ত্রীলোকেরা সেই গুহার মধ্যে পুড়িয়া ভস্ম হইলে পর, অবশেষে স্বয়ং রাণা সদলে সম্মুখ সংগ্রামে জীবন বিসর্জ্জন করিলেন, তথাপি আলাউদ্দিনের বশ্যতা স্বীকার করিয়া আপন পত্নীকে তাঁহার নিকট অর্পণ করিলেন না। কথিত আছে—শেষ মুহূর্ত্তে যখন রাজপুত যোদ্ধারা রাণার সহিত দুর্গের দ্বার খুলিয়া রণক্ষেত্রে প্রবেশ করেন, তখন প্রত্যেক যোদ্ধার ঘোড়ার মস্তকে দুঃখের চিহ্নস্বরূপ আপন স্ত্রী বা আত্মীয়জনের বস্ত্রখণ্ড বাঁধিয়া সেই সম্মুখ সংগ্রামে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

এ যুদ্ধে আলাউদ্দিন জয়লাভ করিয়া যখন রাণার প্রাসাদ মধ্যে চিতোরের রাজলক্ষ্মী "পদ্মিনীর" সন্ধান করিতেছিলেন, তখন সংবাদ পাইলেন যে—রাজপুতদিগের যাবতীয় সুন্দরী স্ত্রীলোকদিগের সহিত চিতোরলক্ষ্মী "পদ্মিনী" রাণার আদেশে এক গুহার মধ্যে ভস্মীভূত হইয়াছেন। তখন আলাউদ্দিন তাঁহার সকল পরিশ্রম ব্যর্থ হইল স্থির জানিয়া ক্রোধান্ধ হইয়া নগরবাসীদিগের প্রতি অতি নিষ্ঠুর ভাবে অত্যাচার পূর্ব্বক সেই দুঃখের অবশান করেন। যে গুহায়—চিতোরলক্ষ্মী সঙ্গীনীগণসহ ভস্ম হইয়াছিলেন, অদ্যাপি সেই গুহার মুখ বন্ধ থাকিয়া অতীত ঘটনার বিষয় সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। রাজপুতেরা ঐ স্থানকে অতি পবিত্র বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকেন।

আমরা সকলে আজমীঢ় হইতে রক-রাইড-টম্‌টমে আরোহণ করিয়া রাজপথ হইতে অন্‌ সাগর নামক বৃহৎ হ্রদ দেখিতে পাইলাম; ক্রমে সহরের ফটক পার হইয়া প্রান্তরের পথে উপস্থিত হইলাম। এখানে চারিদিকেই পাহাড় ও বালিয়াড়ী, মধ্য পথটী অজগর সর্পের ন্যায়

প্রশারিত হইয়াছে। প্রথমে এই পথে অগ্রসর হইতে কোন কষ্ট হয় না, কারণ এই স্থানের চারিদিকের প্রাকৃতিক পার্ব্বত্য শোভা অতি মনোহর! নির্দ্দিষ্ট এই স্থান হইতে আরও কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে "বিশাল সাগর" নামে আর একটী হ্রদ দেখিতে পাওয়া যায়, পর্ব্বতের উপত্যকায়—বাঁধ দিয়া এই সকল সুন্দর হ্রদ প্রস্তুত হইয়াছে। পাঠক-বর্গের প্রীতির নিমিত্ত এই স্থানে সংক্ষেপে সেই বিশাল সাগরের কিছু পরিচয় দিব।

রাজা অনদেব এই বিশাল কৃত্রিম হ্রদটী প্রস্তুত করেন, কথিত আছে—পুরিহর, প্রমার, চালুক ও চোহান এই চারিটী বংশই অগ্নিকুল নামে প্রসিদ্ধ আছে। চোহান বংশে—রাজা অনদেবের জন্ম হয়; পূর্ব্বপুরুষ "রাজা অজ" পুস্করের নাগপর্ব্বতে বিশেষ কারণ বশতঃ তাঁহার রাজধানী নির্ম্মাণে পুনঃপুনঃ অসমর্থ হইলে, এই আজমীঢ়ের সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বতশিখরে তারাগড় নামক এক দুর্গ নির্ম্মাণ ও পর্ব্বতের পাদমূলে তাঁহার রাজধানী স্থাপন করেন; বলা বাহুল্য তাঁহারই নামানুসারে এই স্থানের নাম "অজের পর্ব্বত" হইয়াছে (আজমীঢ় শব্দ অজমেরুরই—অপভ্রংশ)। রাজা অজের বিশালদেব নামক এক বংশ-ধর আজমীঢ়ের পূর্ব্বপার্শ্বে পর্ব্বতের উপত্যকায় বাঁধ দিয়া যে একটী হ্রদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, অদ্যাদি সেই হ্রদ, বিশাল হ্রদের পরিবর্ত্তে বিশাল সাগর নামে খ্যাত। তাঁহার পৌত্র এই রাজধানীর পশ্চিম পার্শ্বে—পর্ব্বতের উপত্যকায় বাঁধদিয়া যে হ্রদ প্রস্তুত করেন, উহাই অনসাগর নামে বিখ্যাত। অনদেবের পৌত্র রাজা সোমেশ্বর দিল্লীর তুয়ার বংশীয় রাজা অনঙ্গ পালের কন্যাকে বিবাহ করেন, জগদ্বিখ্যাত পৃথ্বীরাজ চোহান সোমেশ্বরের পুত্র—রাজা অনঙ্গপালের কোন পুত্র না থাকায়, তিনি একদা বালক পৃথ্বীরাজের অসম সাহস এবং উচ্চ

অন্তঃকরণের পরিচয় পাইলেন, তখন তিনি পৃথ্বিরাজকেই সিংহাসনের উপযুক্ত পাত্র স্থির করিয়া দিল্লীর সিংহাসন—তাহাকেই দান করেন। পৃথ্বীরাজ এইরূপে কিছুদিন রাজত্ব করিলে পর, একদা তাঁহার ভ্রাতার ষড়যন্ত্রে পাঠান সেনাপতি "সাহাবুদ্দিন ঘোরীর" হস্তে পরাজিত হইলেন, সুতরাং পাঠানগণ তাহার রাজধানী আজমীঢ় নগর অধিকার করিয়া লইলেন। কালের কুটিল চক্রে ইহা পাঠান হইতে মোগলদিগের হয়, তৎপরে যোধপুরের রাঠোর বীর রাজা মলদেব কর্ত্তৃক নগরটী পুনরুদ্ধার হয়, তাহার পর মারহট্ট বীর সিন্ধিয়া কর্ত্তৃক মালদেবের কোন ভূখণ্ডের বিনিময়ে এই দেশ ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের হস্তগত হইয়াছে। এই সকল হ্রদের সচ্ছ-নির্ম্মল জল দেখিলে বস্তুতঃই অত্যন্ত আনন্দ হইতে থাকে।

ষ্টেশন হইতে প্রায় তিন মাইল পথ, এইরূপ নানাপ্রকার সৌন্দর্য্য দর্শন করিতে করিতে আমাদের গাড়ীগুলি একটী পর্ব্বতের পাদমূলে উপস্থিত হইল, সেই পর্ব্বতের উপর দিয়া পথটী অল্প অল্প উঠিয়া আবার তাহার অপর পার্শ্বে নামিয়াছে; যাঁহারা একা বা ঘোড়ার গাড়ী (পাল্কীগাড়ী) ভাড়া করিবেন তাঁহাদিগকে এই স্থানে গাড়ী হইতে নামিয়া হাটিয়া যাইতে হয়। আমাদের রক-রাইড-টমটম্ গাড়ীগুলি কখন ধীরে ধীরে পর্ব্বতের উপরে উঠিয়া, কখন বা পর্ব্বতের পার্শ্বদেশ দিয়া পর্ব্বতের বক্ষ বিদীর্ণ করতঃ যে পথ প্রসারিত হইয়াছে, সেই পথ দিয়া চলিতে লাগিল অর্থাৎ এই মাত্র যে পথ অতিক্রম করিলাম, পর-মুহূর্ত্তেই আবার তাহার মাথার উপরের পথ দিয়া যাইতে লাগিল। ইহার এক স্থান এত চড়াই যে, প্রতি দণ্ডেই গাড়ী গুলি নীচে গড়াইয়া পড়িবার ভয় হইতে লাগিল। সে যাহাহউক পুষ্কর যাইবার সময় এই পর্ব্বতের মধ্য দিয়া অন্যূন দুই মাইল পথ অতিক্রম করিতে হয়।

আজমীঢ় হইতে পুস্কর তীর্থের পথ এত দুর্গম হইলেও ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুরা শারীরিক কষ্টকে কষ্ট বলিয়া গ্রাহ্যই করেন না, কারণ তাঁহারা জানেন "পুস্কর আদি তীর্থ"। সত্যযুগে—পুস্কর, ত্রেতায়—নৈমিষারণ্য, দ্বাপরে—কুরুক্ষেত্র আর কলিকালে—গঙ্গাতীর্থ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর দ্বিতীয় নাই; অর্থাৎ বিষ্ণু যেরূপ সকল দেবতার আদি, তীর্থ সমূহের মধ্যে পুস্কর—সেইরূপ আদি তীর্থ। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া হিন্দুরা পুস্কর তীর্থের পথ যতই দুর্গম হউক না কেন, তাঁহারা সকল প্রকার বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া এই পুণ্যস্থানে গমন এবং তীর্থ-পদ্ধতি-ক্রমে ইহার নিয়ম সকল পালন করিয়া থাকেন।

আজমীঢ়ের এই পার্ব্বত্য পথ অতিক্রম করিয়া উপত্যকার মধ্য-পথে যে রাজপথ পাইলাম, সেই অনন্ত শোভাময়ী পথ ধরিয়া প্রকৃতি-দেবীর সুচারু অঙ্ক—পরম পবিত্র তীর্থস্থানের নিকটবর্ত্তী ব্রাম-ঘাটের সন্নিকটে উপস্থিত হইলে, আমাদের পাণ্ডা চন্দ্রঘাট নিবাসী ভৈরব মুরারীর সন্ধান করিয়া তাঁহাকেই এখানকার তীর্থগুরু মান্য করিলাম। পাণ্ডা ভৈরব মুরারী—অতি বিনয়ী, মিষ্টভাষী আবার তিনি সুচারুরূপে বাঙ্গালা ভাষা পড়িতে বা বলিতে পারেন। পাণ্ডার সন্ধান করিলে যে ব্যক্তি আমাদিগের নিকট ভৈরব মুরারী বলিয়া পরিচয় দিলেন, তাঁহার প্রতি সন্দেহ হওয়াতে, তিনি আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগের নাম, ধাম, আবার যে কয়জন তথায় গিয়াছিলেন তাঁহাদের নাম পর্য্যন্ত তাঁহার খতিয়ান বহিতে সাক্ষর দেখাইলেন, ইহাতেই প্রমাণ পাওয়া গেল, যে তিনিই আমাদের যথার্থ পৈতৃক গুরু। তাঁহার প্রতি সন্দেহ হইবার প্রধান কারণ এই যে, কোন বিদেশী যাত্রী এ তীর্থে উপস্থিত হইবার পূর্ব্ব হইতে—গোমস্তারা সকলেই তাহার পাণ্ডার নিকট লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতে থাকে, কেননা ভৈরব মুরারীর ন্যায় এতীর্থে বিস্তর

পাণ্ডা বর্ত্তমান আছেন। আমাদের পাণ্ডা ভৈরব মুরারীর যত্নে এখানে মুগ্ধ হইলাম। তিনি প্রথমে আমাদের সকলকে লইয়া গিয়া রাম-ঘাটের নিকট একটী দ্বিতল বাটীতে বিশ্রাম স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। তথায় কিয়ৎকাল বিশ্রামের সময় দেখিলাম—বৃন্দাবনে যেরূপ লালমুখ বাঁদরের দৌরাত্ম্য এখানেও সেইরূপ ছোট ছোট হনুমানের (মরকট) দৌরাত্ম্যতে অস্থির হইতে হইল। পাণ্ডার নিকট উপদেশ পাইলাম—পুরাকালে যখন ঋষিগণ এই পুণ্য স্থানে যজ্ঞ করিতেন, তখন এই সকল বৃহদাকার হনুমানগুলি তাঁহাদের যজ্ঞে বিঘ্ন ঘটাইত, এই নিমিত্ত ঋষিদিগের অভিশাপে এক্ষণে তাহারা এখানে মরকট রূপে অবস্থান করিতেছে।

বিধাতৃ-বিহিত পুষ্কর তীর্থ—সর্ব্বলোক-বিশ্রুত। ইহা একটী বৃহৎ চৌকনা পুষ্করিণীর ন্যায়। প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী অহল্যাবাঈ ও অপরাপর ধর্ম্মাত্মা রাজাদিগের কর্ত্তৃক ইহার চতুর্দ্দিক প্রস্তরের সোপান শ্রেণীর দ্বারা উত্তম রূপে আবৃত। পুষ্করতীর্থের চারিদিকে চারিটী সুন্দর বাঁধা ঘাট আছে। ঘাটের উপর দক্ষিণদিকে একটী উচ্চ নহবৎখানা শোভা পাইতেছে। পূর্ব্বদিকে ঘাটের দুই পার্শ্বে দুইটী উচ্চ বাঁধান বেদী; ঐ বেদীর উপরে বসিয়া ভক্তবৃন্দকে পিতৃগণের উদ্দেশে পিণ্ডদান করিতে হয়; তৎপরে পুষ্কর তীর্থ পদ্ধতি অনুসারে সঙ্কল্প পূর্ব্বক স্নান তর্পণ প্রভৃতি সম্পাদন করিতে হয়।

পুষ্কর-মাহাত্ম্য।

এই পুষ্কর তীর্থে ভূমণ্ডলের দশ সহস্র কোটি তীর্থ সান্নিধ্য আছে। আদিত্য, বসু, রুদ্র, সাধ্য, মরুৎ, অপ্সরা ও গন্ধর্ব্বগণ নিত্য এই তীর্থে সন্নিহিত থাকেন। দেব, দৈত্য এবং ঋষিগণ এইস্থানে তপস্যা করিয়া

দিব্য যোগ-সম্পন্ন ও পুণ্যশালী হইয়াছেন। কথিত আছে, যে ব্যক্তি শুদ্ধচিত্তে মনে মনে পুষ্কর তীর্থে গমন অভিলাষ করেন, তিনি সর্ব্বপাপ বিমুক্ত হইয়া সুরলোকে পূজিত হন। সর্ব্বলোক পিতামহ ভগবান কমলযোনি পরম প্রীতমনে সতত তথায় বাস করিতেছেন। পূর্ব্বকালে দেব ও ঋষিগণ এই পুষ্কর তীর্থে মহৎ পুণ্য উপার্জ্জন এবং সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। যে ব্যক্তি শুদ্ধচিত্তে পিতৃগণ, দেবগণ ও ঋষিগণের অর্চ্চনায় রত থাকিয়া ইহাঁদের অভিষেক করেন, তাঁহার অশ্বমেধানুষ্ঠানের অধিক ফল লাভ হয়; এইরূপ আবার যে ব্যক্তি এই মহা তীর্থ-তীরে ভক্তিসহকারে সস্ত্রীক দক্ষিণা সহ একটী ব্রাহ্মণ ভোজন করান, তিনি ইহকাল ও পরকালে পরমানন্দ অনুভব করিতে পারেন। কি ব্রাহ্মণ, কি বৈশ্য, কি ক্ষত্রিয়, কি শূদ্র যে কেহ এই পুষ্কর তীর্থে স্নান করেন, তীর্থ-বৈভব বশতঃ তাহাকে আর পুনর্ব্বার গর্ভ-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। যে ব্যক্তি কার্ত্তিকী পূর্ণিমাতে পুষ্কর তীর্থে গমন করেন, তাঁহার অক্ষয় ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়। যে ব্যক্তি কৃতাঞ্জলিপুটে স্বায়ং ও প্রাতঃকালে পুষ্কর তীর্থ স্মরণ করেন, তাঁহার সকল তীর্থস্থানের ফললাভ হয়। স্ত্রী কিম্বা পুরুষ জন্মাবধি যে সকল পাপ অর্জ্জন করিয়া থাকেন, একবার মাত্র পুষ্করে স্নান করিলে ইহার মহত্ত্ব হেতু তৎ-সমুদয়ই বিনষ্ট হইয়া যায়। হিমালয়ের তিন শৃঙ্গ হইতে যে তিন প্রস্রবণ প্রবাহিত হইতেছে, সেই পুষ্কর তীর্থের বারি—পাতাল ভেদ করিয়া এখানে বিদ্যমান, অর্থাৎ উহার উৎপত্তি নাই। এই নিমিত্ত কেহই পুষ্করের জন্মকরণ জানেন না। পূর্ব্বজন্মের বহু পুণ্য সঞ্চয় না থাকিলে, কাহারও ভাগ্যে পুষ্করে গমন, তপস্যা, দান বা বাস ঘটে না।

এই তীর্থ তীরে পঞ্চরাত্রি বাস করিলে মনুষ্য পুণ্যাত্মা হয় অর্থাৎ

তাহার কোন দুর্গতি হয় না। লোক ত্রিরাত্রি উপবাস, তীর্থাভিগমন এবং কাঞ্চন ও গো প্রভৃতি প্রদান না করিয়াই দরিদ্র হয় এই কথা বারম্বার বলা হইয়াছে। বহু পুণ্যে মানবজন্ম সংঘটিত হইয়া থাকে, সেই দুর্লভ মানব জন্ম গ্রহণ করিয়া তীর্থাভিগমন সর্ব্বোতোভাবে কর্ত্তব্য।

হাটকেশ্বরক্ষেত্রে, চন্দ্রভাগার উত্তরে, কয়োতোয়ার দক্ষিণে সরস্বতী তীরে যোজন পরিমিত পুষ্কর ত্রিতয় অবস্থিত।

বাসাবাটী হইতে বহির্গত হইয়া যথানিয়মে পাণ্ডার উপদেশ মত শুদ্ধ ও শুচি হইবার জন্য রামঘাটে উপস্থিত হইলাম। ঘাটটী বাসাবাটীর পার্শ্বেই অবস্থিত। এই নির্দ্দিষ্ট ঘাট স্থলে উপস্থিত হইয়াই দেখিলাম, সুপ্রশস্ত স্বচ্ছ বারিগর্ভে সুদীর্ঘ পুষ্কর হ্রদের চারিদিকে অসংখ্য মন্দিরাদি শোভা পাইতেছে, মধ্যে ব্রহ্মার যজ্ঞবেদী "পদ্মযোনি" মস্তকোত্তলন করিয়া আছে। কত শত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ইহার পবিত্র বারি স্পর্শ করিয়া স্নানাহ্নিক সমাপন করিতেছেন আবার আমাদিগের ন্যায় কত শত যাত্রী এই ঘাটে বসিয়া দেবকার্য্য, পিতৃকার্য্য, গো-দান প্রভৃতি নিয়ম সকল পালন করিয়া আপনাদিগকে চরিতার্থ বোধ করিতেছেন। এ তীর্থের এমনি মাহাত্ম্য যে এই হ্রদ মধ্যে ছোট বড় মৎস্য, কচ্ছপ, গুগ্‌লী, শামুক, কুম্ভীর প্রভৃতি একত্র অবস্থান করিয়া কেহ কাহারও প্রতি হিংসা না করিয়া তীর্থ হ্রদের মাহাত্ম্য প্রকাশ করিতেছে; আবার কোথাও বা যাত্রীগণ ইহার তীর হইতে ছোলা ভাজা, মুড়ি, পুরি নিক্ষেপ করিয়া, ঐ সকল জীবগুলিকে একত্রিত করিয়া আনন্দ অনুভব করিতেছেন আর ইহারাও যাত্রীপ্রদত্ত সেই উপহার সামগ্রীগুলি নির্ভয়ে টুপ টাপ করিয়া গিলিতেছে। আমরা প্রথমে ইহাতে যথানিয়মে সঙ্কল্প পূর্ব্বক স্নান দান প্রভৃতি সম্পাদন

পূর্ব্বক রামঘাটের নির্দ্দিষ্ট বেদীর উপর বসিয়া পিতৃগণের উদ্দেশে শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন করিলাম।

পুস্কর-তীর্থের কিম্বদন্তী এইরূপ ;—

একদা ব্রহ্মা নারদের মুখে জগতে কলির প্রাদুর্ভাব ও মানবগণের পাপ বৃদ্ধির কথা শ্রবণ করিয়া পরম পবিত্র পুস্কর তীর্থটী আকাশ হইতে স্থানান্তরিত করিতে মনস্থ করিলেন। তিনি ভাবিলেন যে, সত্য ধর্ম্মস্থিত পুস্করক্ষেত্র কলিপ্রভাবে নাশ প্রাপ্ত হইবে। এইরূপ স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া তিনি স্বীয় হস্তস্থিত পদ্মকে বলিলেন—"হে পদ্ম! যে স্থানে কলি নাই, তুমি তথায় পতিত হও, আমি পুস্করকে তথায় লইয়া যাইব। পদ্ম তখন পৃথিবীর সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিয়া শেষে পবিত্র স্থান হাটকেশ্বর ক্ষেত্রকে কলি রহিত দেখিয়া তথায় পতিত হইল, পুনশ্চ উত্থিত হইয়া এই স্থান হইতে আর এক স্থানে পতিত হইল, তৎপরে ঐ দ্বিতীয় স্থান হইতে আবার এক পৃথক স্থানে পতিত হইল। এই হেতু ঐ স্থানে স্ফটিকনিভ জলসমন্বিত তিনটী গহ্বর সৃষ্ট হইল। ব্রহ্মা-যজ্ঞ সম্পাদনের জন্য ঐ নির্দ্দিষ্ট স্থানে আগমন করিয়া ক্ষেত্রের জ্যেষ্ঠ, মধ্যম ও কনিষ্ঠ পুস্করত্রয়কে তথায় আনয়ন করিলেন এবং প্রথম পুস্করে—কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। এই সময় দেব, গন্ধর্ব্ব, বায়ু, সিদ্ধ, বিদ্যাধর প্রভৃতিকে আনয়ন করিবার জন্য নারদকে পাঠাইলেন; ব্রহ্মার আহ্বানে দেব হইতে তপস্বী ও যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ পর্য্যন্ত সকলেই সন্তুষ্টচিত্তে সেই যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইলেন। তখন ব্রহ্মা এক এক দিকপালের প্রতি এক এক দিকের কার্য্যভার ন্যস্ত করিলেন; ভৃগু, মৈত্রাবরুণ, চ্যবন, মরীচি, গালব, পুলস্ত্য, অত্রি, গর্গ প্রভৃতি ষোড়শজন ব্রাহ্মণকে ঋত্বিক কর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন। বিশ্বকর্ম্মা যথানিয়মে পিতামহের মস্তক মুণ্ডণ করিয়া দিলেন। এই-

রূপে যজ্ঞের যাবতীয় আয়জন প্রস্তুত দেখিয়া, ঐ সকল ঋত্বিক ব্রাহ্মণেরা শুভলগ্নে যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন, কিয়ৎকাল পরে তাঁহারা "পত্নীমালয়" "পত্নীমালয়" বলিয়া চীৎকার আরম্ভ করিলেন। এদিকে ব্রহ্মা—যজ্ঞের যাবতীয় সামগ্রী প্রস্তুত করিয়াছিলেন, কিন্তু স্ত্রীকে ডাকিতে ভুল করিয়াছিলেন, তখন তিনি মহাচিন্তিত হইয়া স্বীয় পুত্র নারদকে যজ্ঞস্থলে শীঘ্র সাবিত্রী দেবীকে আনিতে আজ্ঞা করিলেন, আজ্ঞাপ্রাপ্তে নারদ সাবিত্রী সকাশে নিবেদন করিলেন, "মাতঃ! পিতা মর্ত্ত্যধামে এক মহাযজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছেন, অতএব সুরেশ্বরি! শীঘ্র স্নানান্তে যজ্ঞমণ্ডপে চলুন; কিন্তু মাতঃ! আমার বিবেচনায় আপনার একাকিনী ঐ মহাযজ্ঞস্থলে গমন করা উচিত হইতেছে না, যাবতীয় দেবপত্নীদিগকে সঙ্গে করিয়া আপনি তথায় যাইলেই ভাল হয়।" এইরূপ বলিয়া তিনি যথাসময়ে সেই যজ্ঞস্থলে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এদিকে সাবিত্রী দেবী—পুত্রের অনুরোধ রক্ষা করিবার জন্য তাঁহার যজ্ঞস্থলে আসিতে বিলম্ব হইতে লাগিল; ঋত্বিক ব্রাহ্মণেরা দেখিলেন সাবিত্রীদেবীর আসিতে অত্যন্ত বিলম্ব হইতেছে অথচ যজ্ঞের শুভলগ্ন বহির্ভূত হইয়া যায়। তখন তাঁহারা বারম্বার "পত্নীমালয়" সময় অতীত হয়, বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। এবার ব্রহ্মা পুলস্ত্যকে সাবিত্রী সন্ধানে পাঠাইলেন, তখন সুরেশ্বরী পুলস্ত্যকে বলিলেন, "বৎস! তোমার পিতাকে কিয়ৎকাল অপেক্ষা করিতে বল, আমি ইন্দ্রাণী, গৌরী প্রভৃতি দেবপত্নীদিগকে সঙ্গে করিয়া শীঘ্র তথায় যাইতেছি।" পুলস্ত্য ফিরিয়া আসিয়া সেই কথা ব্রহ্মাকে নিবেদন করিলেন, তখনও ব্রহ্মা আহুতীর সোমভাণ্ড মস্তকে স্থাপন করতঃ দণ্ডায়মান থাকিয়া দেবীর আগমন প্রতিক্ষা করিতেছিলেন, বলা বাহুল্য ইহাতে তাঁহার অত্যন্ত কষ্ট হইতেছিল। এদিকে ব্রাহ্মণেরা বারম্বার চিৎকার করিয়া

বলিতে লাগিলেন "ভগবান! যজ্ঞের সময় উত্তীর্ণ হইয়া যায়, আর বিলম্ব করিলে চলিবে না।" তৎশ্রবণে ব্রহ্মা কুপিত হইয়া ইন্দ্রকে বলিলেন—"হে দেবরাজ! সাবিত্রী ইচ্ছাপূর্ব্বক আমাকে হতজ্ঞান করিয়া এখানে আসিলেন না, অতএব আমি অন্য ভার্য্যা দ্বারা এই যজ্ঞ সম্পাদন করিব। এক্ষণে আমার আদেশমত তুমি শীঘ্র এক কুমারীকে এইস্থানে আমার নিকটে আনয়ন কর।" দেবরাজ—ব্রহ্মার আদেশে কোন ব্রাহ্মণ কুমারীকে নিকটে না পাইয়া অবশেষে এক সুন্দরী গোপকন্যা, যিনি ঐ স্থান দিয়া ঘোলের ভাঁড় মাথায় করিয়া যাইতেছিলেন, বলপূর্ব্বক তাহাকে ধরিয়া আনিয়া উহার মস্তকস্থ ঘোলের ভাঁড় ফেলিয়া দিলেন এবং নিকটস্থ একটী গাভীর মুখে ঐ কুমারীকে প্রবেশ করাইয়া, গুহ্যদেশ দিয়া বাহির পূর্ব্বক যথানিয়মে সেই গোপকন্যার দেহ শুদ্ধ করিয়া লইলেন। এইরূপে ঐ গোপকন্যাকে পবিত্র করা হইলে, তিনি জ্যেষ্ঠ পুষ্করে স্নান ও বস্ত্রাদিতে ভূষিতা করাইয়া নির্দ্দিষ্ট সময় যজ্ঞস্থলে ব্রহ্মার নিকট হাজির করিলেন। ইন্দ্রের মুখে সকল কথা শ্রবণ করিয়া রুদ্র বলিলেন—"যে নিমিত্ত ইনি গোমুখে প্রবেশ করিয়া দেবকার্য্য সাধনের জন্য অপানদেশ দিয়া বাহির হইয়াছেন—সেই কারণের জন্য ইনি আমার আদেশ মত গায়ত্রী নামে প্রসিদ্ধ হইবেন।" ভগবান বাসুদেব বলিলেন "ব্রাহ্মণ ও গোজাতি" ইহাদের একই কুল, কেবল দ্বিধাকৃত মাত্র। অতএব এই কন্যা—ধেনুদর হইতে জন্মিয়াছে বলিয়া ইহাকে "দ্বিজন্ম-জাতা" বলিতে হইবে। এইরূপ বাক্য উচ্চারণ করিয়াই তিনি ব্রহ্মাকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, হে ব্রাহ্মণ! আমি আদেশ করিতেছি, "আপনি ইহার পাণিগ্রহণ করুন।" তখন বাসুদেবের কথায় নির্ভর করিয়া ব্রাহ্মণগণ গায়ত্রীকে ব্রাহ্মণীশ্রেষ্ঠ ও গোপজাতি বর্জ্জিতা বলিয়া সম্ভাষণ করিলেন। অমনি গৃহোক্ত বিধানে ব্রহ্মার

সহিত গায়ত্রী দেবীর পরিণয় কার্য্য সমাধা হইল। এইরূপে পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন হইলে—ব্রহ্মা, সোমভাণ্ড আর গায়ত্রীদেবী অরণীকাষ্ঠ মস্তকে করিয়া যজ্ঞমণ্ডপে উপস্থিত হইলেন। পুরাণ পাঠে উপদেশ পাওয়া যায়, কার্ত্তিক মাসের শুক্ল একাদশী তিথি হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত এই যজ্ঞ শেষ হইতে সময় লাগিয়াছিল।

এদিকে নারদের নিকট সাবিত্রীদেবী ব্রহ্মার দ্বিতীয় বিবাহের বিষয় শ্রবণ করিয়া আন্তরিক দুঃখিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া স্বর্গরাজ্যের যাবতীয় দেবীগণসহ উক্ত যজ্ঞমণ্ডপে আগমন করিলেন এবং এ বিবাহে যাঁহারা সম্মতি দান করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সকলকেই অভিশাপ দিলেন। তৎপরে তিনি বাম চরণ পর্ব্বতোপরি এবং দক্ষিণ চরণ অচলশিরে স্থাপন করিয়া সকল দুঃখের অবসান করিলেন। সেই সাবিত্রীদেবী পতিস্থানে অপমানিত হইয়া এ তীর্থে এইরূপে পর্ব্বতে আশ্রয় করিয়া আছেন।

কথিত আছে, এই সতী সাবিত্রীদেবীর অভিশাপে সেই যজ্ঞস্থলে অনেক প্রকার বিঘ্ন ঘটিয়াছিল, তন্মধ্যে পাঠকবর্গের অবগতির নিমিত্ত দুএকটী বিষয় প্রকাশিত হইল। ভগবান শঙ্কর—সাবিত্রী দেবীর দুঃখে কাতর হইয়া এক নাগা-সন্ন্যাসীর বেশে "আমায় ভোজন দাও" "আমায় ভোজন দাও" বলিয়া যজ্ঞে বিঘ্ন উৎপাটন করেন, ঋত্বিক ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে নরকপালধারী বলিয়া বিস্তর ভৎর্সনা করেন; ইহাতে মহাদেব রোষভরে যজ্ঞস্থলে একটী কপাল নিক্ষেপ করেন; কপাল যজ্ঞবিঘ্ন কারণ বলিয়া উহা দূরে নিক্ষিপ্ত হইল, শূলপাণী কর্ত্তৃক অমনি বিস্তর কপাল ঐ স্থানে নিপতিত হইল; এইরূপে একটীর পর একটী কপাল পড়াতে যজ্ঞস্থল কপালে কপালে পরিপূর্ণ হইয়া গেল, তখন সকলেই এই সন্ন্যাসীকে সাক্ষাৎ মহাদেব স্থির জানিতে পারেন, এবং তপস্যা দ্বারা তাঁহাকে তুষ্ট করিয়া আসন্ন বিপদ হইতে মুক্ত হইলেন।

বটুব্রাহ্মণ—যিনি ব্রহ্মার পৌত্র ও সনাতনের পুত্র। সেই বটু সহসা ঋত্বিক ব্রাহ্মণগণের মধ্যে এক সর্প নিক্ষেপ করেন, সর্পটী নিক্ষিপ্ত হইবা মাত্র ভৃগুঋষিকে বেষ্টন করিল। তর্দ্দর্শনে ভৃগুপুত্র "চ্যবন" এই বলিয়া বটুকে অভিশাপ প্রদান করিলেন যে "তুই এই দণ্ডে সর্পাবস্থা প্রাপ্ত হ।" তখন বটু আপন ধৃষ্টতা বুঝিতে পারিয়া অত্যন্ত কাতর হইলেন এবং ব্রহ্মার স্তব স্তুতি করিতে লাগিলেন, ব্রহ্মা তাহার করুণবিলাপে ব্যথিত হইয়া বলিলেন, "বৎস বটু! আমি বহুকাল পূর্ব্ব হইতে নাগকুলের নবম কুল সৃজন করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম, চ্যবনের অভিশাপ মত তুমি ঐ সমর্য্যাদ নবম কুলের প্রতিষ্ঠাতা হও। পুষ্করের হাটকেশ্বর ক্ষেত্রে এক পর্ব্বত মধ্যে একটী তোয়াধার আছে, আমার আদেশ মত তুমি তথায় গিয়া বাস কর। ব্রহ্মার আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া বটু অদ্যাপি ঐ তোয়াধার নাগ পর্ব্বতে নাগকুণ্ড নামে তীর্থস্বরূপ হইয়া অবস্থান করিতেছেন। ব্রহ্মার আশীর্ব্বাদে এই নবম নাগকুল প্রতিষ্ঠাতা বটু প্রতি শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণপঞ্চমী তিথিতে এখানে পূজা পাইয়া থাকেন। এই যে নানাপ্রকার অনর্থক সংঘটন হইয়াছিল, উহা কেবল সাবিত্রীদেবীর অভিশাপের কারণ; পুষ্কর তীর্থে রামঘাটের অপর তীরে সর্পাকৃতি নাগপর্ব্বত বর্ত্তমান থাকিয়া অতীত ঘটনার বিষয় সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এইরূপ আবার পুষ্করের এই যজ্ঞ সময় দক্ষিণা পথ হইতে কোটিসংখ্যক কু-রূপ ব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন, তাঁহারা এই পুণ্য পুষ্কর হ্রদের জলে স্নান করিবা মাত্র তীর্থ প্রভাব বশতঃ সুরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যে ঘাটটীতে তাঁহারা স্নান করিয়াছিলেন, সেই ঘাটটী "সুরূপ ঘাট" নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে কার্ত্তিক মাসের শুক্লা একাদশী তিথিতে এই ঘটনাটী হয়; এই নিমিত্ত অদ্যাপি ভক্তগণ দলে দলে ঐ নির্দ্দিষ্ট সময়ে এই সুরূপ ঘাটে আসিয়া স্নান

করিয়া থাকেন। পুস্কর হ্রদের চারিধারে যে সকল প্রস্তরময় বাঁধান ঘাট বর্ত্তমান আছে, ঐ সকল ঘাটে—যে সময় যেরূপ সংঘটন হইয়াছিল, সেই ঘাটটী সেই নামে খ্যাত হইয়াছে; অর্থাৎ যজ্ঞকালে দেব ও ঋষিরা যে স্থানে আশ্রয় লইয়া যিনি যে ঘাটে স্নান করিয়াছিলেন, সেই ঘাটটী সেই নামে খ্যাত হইয়াছে। এক স্বরূপ ঘাটের ন্যায় এখানে, নর-সিংহ ঘাট, ইন্দ্র-ঘাট, যজ্ঞ-ঘাট, গৌরী ঘাট, সাবিত্রী-ঘাট, কপাললোচন-ঘাট, সপ্তর্ষি-ঘাট ইত্যাদি অনেকগুলি ঘাট শোভা পাইতেছে।

পুস্কর—সত্যযুগের তীর্থ হইলেও কলির দুঃখ নিবারণের জন্য জগতে আনীত, এই কারণে কলিতেও পুস্কর আদি তীর্থ। পুস্কর মাহাত্ম্য বহুদিন কলিকালে গুপ্তভাবে অবস্থান করিতেছিল। কথিত আছে—রাজপুতানার মন্দুরের পুরিহর বংশীয় কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্ত রাজা লহোররাও অত্যন্ত শীকারপ্রিয় ছিলেন। একদা তিনি শীকারে গিয়া এক শ্বেত বরাহের পশ্চাদ্ধাবন করিতে করিতে পিপাসায় কাতর হইয়া, এখানকার শুষ্কপ্রায় এই পুস্কর হ্রদের জল পান করেন। এদিকে পুস্করের পবিত্র বারি স্পর্শ করিবা মাত্র, তিনি রোগমুক্ত হইয়া সুন্দর কান্তি ধারণ করিলেন; তদ্দর্শনে তিনি চমৎকৃত হইয়া এই শুষ্কপ্রায় পুস্করের পুনরুদ্ধার করেন ও স্থানে স্থানে ঘাট বাঁধাইয়া আপন কীর্ত্তি স্থাপন করেন। তাহার পর নানা স্থানের রাজপুত, মহারাষ্ট্রীয় রাজা ও রাণী অহল্যাবাঈ প্রভৃতি মহাত্মাগণের অনুকম্পায় এখানে আরও বিস্তর ঘাট ও দেবালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

পুস্কর এখন ত্রিতয় দর্শন পাওয়া যায় না। জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ এই দুইটী পুস্করই দেখিতে পাওয়া যায়। জ্যেষ্ঠ পুস্করটী এক প্রকাণ্ড দীঘির ন্যায়, আর কনিষ্ঠটী ইহারই দক্ষিণাংশে ক্ষুদ্রতররূপে অবস্থিত; উহা হইতে একটী ছোট খালের আকারে কনিষ্ঠ পুস্কর-হ্রদের জল

নিকাশ হইয়া দক্ষিণদিকের জলাভূমিতে পতিত হইতেছে—সেই জলা-ভূমিই পুণ্যতোয়া সরস্বতী নামে খ্যাত। পুরাণ পাঠে জানা যায় যে, এই সরস্বতী—কুরুক্ষেত্রে অদৃশ্য হইয়া পুষ্করে পঞ্চতোয়া হইয়া অধিষ্ঠান হইয়াছেন। সেই পঞ্চনদীর নাম যথাক্রমে—সুপ্রভা, সুধা, কনকা, নন্দা ও প্রাচী। পুষ্কর তীর্থস্থান হইতে তিন ক্রোশ দূরে নন্দকেশ্বরে, পঞ্চস্রোতা সরস্বতী বিদ্যমান। তথায় অনন্ত শয্যায় ভগবান বিষ্ণু ও মহাদেবের এক লিঙ্গমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে।

পুষ্করে যে সমস্ত দেবালয় প্রতিষ্ঠিত আছে, তন্মধ্যে ব্রহ্মা, গায়ত্রী, সাবিত্রী, বরাহ, বদরী-নারায়ণ, কপালেশ্বর ও শেঠজীর মন্দিরই প্রসিদ্ধ। শেঠজীর মন্দিরে একটী তাম্র-স্তম্ভ চিহ্নস্বরূপ বর্ত্তমান আছে। বৃন্দাবনে এই শেঠজীর মন্দির প্রাঙ্গণে—সোণার, মথুরায়—রৌপ্যের আর এখানকার মন্দির প্রাঙ্গণে—তাম্রের স্তম্ভ (তাহা তালগাছ নামে খ্যাত) দেখিতে পাওয়া যায়। এ তীর্থে—ব্রহ্মার মন্দিরটী গোয়ালিয়ারের প্রসিদ্ধ মহাজন গোকুল পারেক, হ্রদের উত্তরে সাবিত্রীর মন্দিরটী—মাড়ওয়ারের রাজা অজিত সিংহের পুরোহিত, বদরীনারায়ণজীউর মন্দিরটী—ঘাড়ো-য়ার ঠাকুর সাহেব কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়া প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে প্রাচীন বরাহদেবের মন্দিরটী—মোগলসম্রাট ঔরঙ্গজেবের আদেশে ভঙ্গ হইলে পর, যোধপুরের প্রসিদ্ধ রাজা ভক্তসিংহ ইহা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন, অটমটেশ্বরের মন্দিরটী সংস্কার অভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে—মারহাট্টা সুবাদার গুণরাও কর্ত্তৃক আবার নবকলেবরে প্রস্তুত হইয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উপরোক্ত প্রসিদ্ধ দেবালয়গুলি ব্যতীত এখানে আরও বিস্তর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবালয় সংস্থাপিত হইয়াছে।

এই তীর্থে যে সকল ভক্ত—রাত্রি যাপন করিবার বাসনা করিবেন, তাঁহাদের যদ্যপি ঐ রাত্রিকালে পুষ্করহ্রদে পানীয় বারি বা অপর কোন

কারণে আসিবার আবশ্যক হয়, তাহা হইলে প্রজ্বলিত লণ্ঠন হস্তে আসিবেন। কেননা, এই হ্রদ মধ্যস্থ যে সকল বড় বড় কুম্ভীর বর্ত্তমান আছে, প্রায়ই রাত্রিকালে তাহারা তীরে উঠিয়া অবস্থান করে, এমন কি হ্রদতটস্থ দেবালয় প্রাঙ্গণের উচ্চ প্রাচীরে যে দ্বারটী রাত্রিকালে অর্গলাবদ্ধ থাকে, সেই দ্বারটীতে অনবরত মনুষ্যের ন্যায় আঘাত করিয়া তাহারা ভিতরে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিতে থাকে ; আর এক কথা—এখানে কোনরূপ পাকা বাঁধা টাট্টিঘর (মল মূত্র ত্যাগ স্থান) না থাকায় যাত্রীদিগকে তীর্থতীর হইতে বালুয়ারির উপর অথবা বাসাবাটীর সন্নিকটে পার্শ্বস্থ পতিত জমীতে মলমূত্র ত্যাগ করিতে হয়। সেই পতিত জমীতে মলত্যাগ করা এক বিড়ম্বনা ভোগ, কেননা এখানে ছোট ছোট মুরগীর বাচ্ছার ন্যায় যে সকল ময়ূরী-শাবক বিচরণ করিতে থাকে, তাহাদের রক্ষা করিবার জন্য ময়ূর-ময়ূরীরা প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া থাকে, সুতরাং জনসমাগম দেখিলেই যতক্ষণ না উহাদিগকে বিতাড়িত করিতে সক্ষম হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহাদের কে-ও-য়া রব ও তাড়নার বিরাম নাই। অতএব এ কার্য্যটী দিবাভাগেই সম্পন্ন করিবেন।

ব্রহ্মঘাটের সন্নিকটে—একটী সপ্ততল বিশিষ্ট চত্বর দেখিতে পাওয়া যায়। স্বয়ং চতুরানন ঐ স্থানে বসিয়া যজ্ঞ করিয়াছিলেন বলিয়া—উহা যজ্ঞ-বেদী নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। এই ঘাটের সন্নিকটে পশ্চিম তটে ব্রহ্মা-গায়ত্রীর প্রসিদ্ধ মন্দির শোভা পাইতেছে। সেই মন্দিরের গর্ভগৃহটী দুগ্ধশ্বেত-মর্ম্মর নির্ম্মিত ; মধ্যস্থলে চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার পাষাণমূর্ত্তি, বামে প্রস্তর নির্ম্মিতা গায়ত্রী দেবীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। যে সকল ভক্ত এই তীর্থে আসিয়া যথানিয়মে ব্রাহ্মণ বা পাণ্ডাভোজন করান, তাঁহারা ভক্তগণের নিকট হইতে উহার মূল্য লইয়া স্বহস্তে, লুচি, পুরি ও মিষ্টান্ন সংগ্রহ পূর্ব্বক এই চত্বরে বসিয়া ভোজন করিয়া থাকেন।

পশ্চিম তীর্থস্থানের নিয়ম এই যে—একটী স্ত্রীপুরুষকে দক্ষিণাসহ পরিতৃপ্তের সহিত ভোজন করান হইলে এখানে একজন ব্রাহ্মণ ধরা হয়। সে যাহা হউক, এই মন্দির দ্বারের এক পার্শ্বে ব্রহ্মার মানসপুত্র সনক-সনন্দন ও অপর পার্শ্বে সণৎকুমার সনাতনের পাষাণময় প্রতিমূর্ত্তির দর্শন পাওয়া যায়। মন্দিরের বামপার্শ্বে পঞ্চমুখ মহাদেব এবং নারদের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত, এতদ্ভিন্ন ইহার দুই পার্শ্বে দুইটী প্রস্তর নির্ম্মিত হস্তীর উপর দেবরাজ ইন্দ্র ও কুবের মূর্ত্তি বিরাজমান। এই সকল পবিত্র দেবমূর্ত্তি দর্শন করিলে কাহার না প্রাণে আনন্দ হয়?

সমস্ত দিন তীর্থ কার্য্যে এবং দেবালয় সকল দর্শন করিতে করিতে ক্রমে সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল। পাণ্ডার সহিত তখন একবার সকলে মিলিত হইয়া পুষ্করতীর্থে উপস্থিত হইয়া সবিস্ময়ে দেখিলাম, দশ বারটী প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড খেজুর বৃক্ষের ন্যায় আকৃতি কুম্ভীর—গা ভাসান দিয়া তীরে উঠিবার চেষ্টা করিতেছে, আমাদের পদশব্দ পাইয়া তাহারা সাঁতার দিয়া হ্রদের অতল জলে ডুব দিল। পাণ্ডার নিকট উপদেশ পাইলাম, ইহারা প্রায় মনুষ্য মারে না, কেবল সন্ধ্যাকালে ঘাটের ধারে মাছ খাইতে আসিয়া থাকে। এই জন্য তাহাদের ভয়ে স্থানীয় লোকেরা রাত্রিকালে জলে নামিবার সময় লণ্ঠন ও লাঠি লইয়া আসিয়া থাকেন, তাঁহার নিকট আরও উপদেশ পাইলাম বহুপূর্ব্বে একজন ইংরাজ—বন্দুকের গুলিতে এই হ্রদের একটী কুম্ভীর মারিয়াছিলেন, ইহাতে স্থানীয় পাণ্ডারা যুক্তি করিয়া মহা হুলস্থুল করেন। এই নিমিত্ত ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট আইন করিয়া পুস্করে জীবহিংসা রহিত করিয়া দেন। এই নিয়ম অদ্যাপি প্রচলিত আছে।

পাণ্ডার নিকট এই পুষ্করের গভীরতা সম্বন্ধে উপদেশ পাইলাম যে —ইহা অতলস্পর্শী। বহু পূর্ব্বে একদা মোগল সম্রাট ঔরঙ্গজেব

সৈন্য-সামন্ত লইয়া এই পুস্কর তীরে কোন বিশেষ কারণে অবস্থান করিবার সময়, হিন্দু দিগকে দলে দলে পুস্করের সেবা করিতেছে দেখিয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন, এবং দেবমন্দিরগুলি ভাঙ্গিয়া দিবার আদেশ প্রদান করিলেন, তৎপরে পাণ্ডাদিগকে ডাকাইয়া পরিহাসচ্ছলে জিজ্ঞাসা করেন, তোমাদের দেবতা পুস্করের ক্ষমতা কিরূপ? আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বল। তখন পাণ্ডারা ভয়বিহ্বল চিত্তে সম্রাটের নিকট কর-যোড়ে নিবেদন করিলেন, "সাহাজান্! আমরা শাস্ত্রে পুস্করের যে পরিচয় পাইয়াছি, তাহাই প্রকাশ করিতেছি—এই পুস্কর অতলস্পর্শী; কেহ অদ্যাপি ইহার গভীরতা নির্ণয় করিতে সক্ষম হন নাই।" সম্রাট সেই পাণ্ডাদিগের নিকট পুস্করের এইরূপ পরিচয় পাইয়া, তিনি /৫ পাঁচ সের ওজনের একটী সোণার ওলন প্রস্তুত করাইয়া, তাঁহারই লোক দ্বারা ইহার গভীরতা মাপাইতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু কিছুতেই ইহার অন্ত পাইলেন না; অবশেষে পাণ্ডাদের বাক্যই যথার্থ জানিতে পারিয়া তিনি ওলনটী উত্তোলন করিতে আদেশ দিলেন। আদেশ মাত্র ওলনটী উত্তোলন হইলে তিনি চাক্ষুস যাহা দেখিলেন, তাহাতেই পুস্কর তীর্থের পরিচয় পাইলেন; যে স্মুবর্ণ ওলনটী তিনি পুস্করের জল নির্ণয় করিবার জন্য নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, সেই ওলনটী তীর্থ বারি স্পর্শে লৌহ হইয়াছে, তদ্দর্শনে দর্শক মাত্রেই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, অধিকন্তু যখন স্পর্শে হিন্দুদিগের সেই পবিত্র তীর্থ—আপন প্রভাব দেখাইবার অভিপ্রায়ে এরূপ উগ্র ভাব ধারণ করিলেন যে, ঐ হ্রদের জল বৃদ্ধি পাইয়া সম্রাটের যাবতীয় তাম্বু ও সৈন্য সামন্তদিগকে কোথাও ভাসাইয়া, আবার কোথাও বা পুড়াইবার উপক্রম করিল। তখন সম্রাট পাণ্ডাদের পরামর্শে হিন্দুদিগের পবিত্র তীর্থ পুস্করের নিকট নিজ ত্রুটি মার্জ্জনা করিয়া নিস্তার পাইলেন।" এইরূপে পুস্কর—পাণ্ডা-

দিগের মান রক্ষা করিয়া শান্তভাব ধারণ করিলেন। এক্ষণে সম্রাট ঔরঙ্গজেব যে সকল মন্দির এখানে ধ্বংস করিয়াছিলেন, উহার খেসারৎ স্বরূপ স্বেচ্ছায় পাণ্ডাদিগকে ৫২ হাজার বিঘা দেবোত্তর ভূমি দান করিলেন। অদ্যাপি স্থানীয় পাণ্ডাগণ যাত্রীদিগকে তাঁহার "ফারমান" দেখাইয়া থাকেন।

পুরাকালে ভারতের হিন্দু রাজন্যবর্গ এই আদি পুষ্করতীর্থ তীরে আসিয়া কেহ মুক্তি কামনা, কেহ রাজ্য কামনা, আবার কেহ বা পুত্র কামনা করিয়া তুলাপুরুষ দান-যজ্ঞ সমাধান করিতেন। "তুলাদণ্ডের একদিকে তাঁহারা নিজে—অপরদিকে স্বর্ণ, রৌপ্য মণিমাণিক্যাদির সহিত তুলিত হইতেন। ঐসকল তুলিত স্বর্ণ রোপ্য প্রভৃতি পুষ্করের ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত ও পাণ্ডাদিগের মধ্যে বিতরণ করিয়া আপনাপন ধন বলের পরিচয় প্রদান করিতেন। একদা নিঃসন্তান মদ্রদেশাধিপতি অশ্বপতি নামে এক পরম ধার্ম্মিক, সত্যপ্রতিজ্ঞ, জিতেন্দ্রিয়, দানশীল নরপতি, এই তীর্থে আসিয়া পুত্র কামনা করিয়া যজ্ঞ আরম্ভ করিলে—স্থানীয় পাণ্ডারা তাঁহাকে সাবিত্রী দেবীর অর্চ্চনা করিতে উপদেশ দেন, তদানুসারে তিনি সাবিত্রীদেবীর অর্চ্চনা করিয়া সাবিত্রীসম পদ্ম-পলাশলোচনা তেজস্বিনী এক কন্যারত্ন লাভ করিয়াছিলেন। ঐ কন্যা সাবিত্রীদেবীর কৃপায় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া—তাহার নাম সাবিত্রী রাখেন। বরপুত্রি এই সাবিত্রীর যৌবনকাল উপস্থিত হইলে—তাহার পদ্মপলাশলোন এবং তেজস্বিনী মূর্ত্তি অবলোকনে কোন নরপতি দেবীজ্ঞানে উহার পাণিগ্রহণ করিতে সাহস করিলেন না, তদ্দর্শনে অশ্বপতি সেই স্নেহের পুত্তলী সাবিত্রীকে—আত্মানুরূপ পতি লাভ করিতে আদেশ করিলেন, কারণ কথিত আছে উপযুক্ত কন্যাকে যে সম্প্রদান না করে, যে পুরুষ বিবাহ না করে এবং যে ব্যক্তি ভর্ত্তৃহীনা

মাতার রক্ষণাবেক্ষণ না করেন, এই তিন ব্যক্তিই ধর্ম্মে পতিত হইয়া দেবস্থানে নিন্দনীয় হন।

রাজা অশ্বপতি কন্যাকে, এই প্রকার উপদেশ প্রদান করিলে, নৃপ-নন্দিনী প্রথমতঃ রাজর্ষিগণের রমণীয় তপোবনে গমন পূর্ব্বক তত্রস্থ মান্যতম স্থবিরগণের পদবন্দনা করিয়া, ক্রমে সমুদয় বন পরিভ্রমণ এবং তীর্থে তীর্থে ধন প্রদান করতঃ অবশেষে পরম ধার্ম্মিক দ্যুমৎসেন নামা ভূপতির পুত্র সত্যবানকে অল্পায়ু জানিয়াও তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিলেন, এবং নিজ গুণে ধর্ম্মপুত্র যমরাজাকে নানাপ্রকার যুক্তি তর্কে সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহার বর এবং স্বীয় সতীত্বপ্রভাবে বহুকাল পরমসুখে কালাতিপাত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এইস্থানে সাবিত্রী ও সত্য-বানের পরিচয় দিবার কারণ এই যে, অনেকে এই সুরেশ্বরী—সাবিত্রী-দেবীকে পর্ব্বতোপরি অবস্থিত দর্শনে তাঁহার বরপুত্রী সাবিত্রী বলিয়া ভ্রমে পতিত না হন।

সন্ধ্যা হইবামাত্র পুষ্কর তীর্থে স্থানীয় বালক বালিকাগুলি এবং ভক্তগণ শুদ্ধ বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক পুষ্করদেবকে যখন অভিষেক করিতে আসিতে লাগিলেন, তখন প্রতি ঘাটে ঘাটে প্রদীপ প্রজ্বলিত হইল, ভক্তগণ মহানন্দে সুমধুর তানে স্তোত্র পাঠ করিতে করিতে মন্ত্রপূত সহকারে পুষ্প ও আলোকমালা, সেই হ্রদে ভাসাইতে লাগিলেন। তীর্থ ঘাটের চতুর্দ্দিকেই শঙ্খ ঘণ্টাধ্বনি আরম্ভ হইল, এই সকল দেখিয়া শুনিয়া আমরাও ক্ষণকালের জন্য ভগবানের পবিত্র নাম উচ্চারণ করিয়া পাণ্ডার সাহায্যে সেই ত্রিলোকপূজ্য পুষ্করদেবের অর্চ্চনা করিলাম; তৎ-পরে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তীর্থ তীরে এই সন্ধ্যাশোভা দর্শন করিয়া স্থানীয় দেবালয় সমূহে ভগবনের আরতি দর্শনের জন্য বহির্গত হইলাম। পথি মধ্যে পাণ্ডাঠাকুর বলিলেন, "বাবু! আমার বোধ হইতেছে,

আপনারা এই তীর্থ তীরে সন্ধ্যাশোভা দর্শন করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছেন, কিন্তু যদ্যপি আপনারা কার্ত্তিক মাসের শুক্লা-একাদশী হইতে পূর্ণিমা তিথির মধ্যে একবার এখানে আসেন, তাহা হইলে সেই সময় এই পুস্করদেবের উৎসব দর্শন করিলে আশ্চর্য্য বোধ করিবেন। উৎসব সময় এখানে যে মহামেলা হয়, তাহাতে কমবেশ লক্ষ লোক সমাবেত হইয়া থাকেন। জনতাপূর্ণ সেই মেলার সময় এই তীর্থ তীরের সন্ধ্যাশোভা একবার দর্শন করিলে আত্মহারা হইবেন, সন্দেহ নাই।

পূণ্যস্থান পুস্করতীর্থের রাম-ঘাট হইতে সাবিত্রী-পাহাড়—অতি নিকট বলিয়া অনুমান হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নয়; এই রাম ঘাট হইতে সাবিত্রী পাহাড় কমবেশ চারি মাইল বালুকাময় পথ অতিক্রম করিয়া সাবিত্রী পাহাড়ের পাদমূল্যে উপস্থিত হইতে হয়। বেলা যত বৃদ্ধি হয়, সূর্য্যকিরণে এই পথের বালুকা রাশি ততই তাতিয়া উঠে, তাহার উপর যে উচ্চ পর্ব্বতে দেবী অবস্থান করিয়া ভক্তগণকে দর্শন দানে উদ্ধার করিতেছেন, উহাতে আরোহণ করিতে যে কিরূপ কষ্ট সহ্য করিতে হয়, তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই অবগত আছেন। ব্রহ্মার যজ্ঞে অবজ্ঞাতা হইয়া সুরেশ্বরী যে পর্ব্বত আশ্রয় করিয়া তাঁহার দুঃখের অবসান করিতেছেন, সেই উচ্চ পর্ব্বতটীর শিখরদেশে আরোহণ করিতে সর্ব্বশুদ্ধ ৩৬০টী সোপান অতিক্রম করিতে হয়।

যে সকল তীর্থ-যাত্রীদিগের মধ্যে অসামর্থবান ভক্ত থাকেন, অথচ যিনি কতদূরদেশ হইতে কত অর্থ, কত ক্লেশ সহ্য করিয়া এই পবিত্র স্থানে আসিয়া নির্দ্দিষ্ট এই উচ্চ পর্ব্বতে উঠিতে ভীত হন এবং তাঁহার পূর্ব্ব উৎসাহ ত্যাগ করেন, যে সকল আত্মীয় সজনের সহিত তিনি আসেন তাঁহারা যেন পুস্করতীর হইতে একখানি ডুলি ভাড়া করিয়া ঐরূপ অসামর্থবান লোকের আশা পূর্ণ করেন? পুস্কর তীর্থস্থান হইতে সাবিত্রীদেবীর

পর্ব্বতের উপর আরোহণ ও অবরোহণ করিয়া পুষ্করে প্রত্যাবর্ত্তন কাল পর্য্যন্ত একখানি ডুলী—যাতায়াতের খরচ ॥০ আনা হইতে ॥৵০ ভাড়া মাত্র। যে সকল বাহক এই ডুলী বহন করে, তাহারা জাতিতে জাঠ, সুতরাং অত্যন্ত বলিষ্ঠ, অর্থাৎ অশ্বযানের মত উহারা দ্রুত গমন করিয়া থাকে। কথিত আছে যে, এই দেবীকে শুদ্ধচিত্তে ভক্তিসহকারে অর্চ্চনা ও স্পর্শ করিলে, তাঁহার কৃপায় পতির দীর্ঘায়ু ও পতিপ্রাণা হইতে সক্ষম হইতে পারেন। রাত্রিকালে পাণ্ডার নিকট এইরূপ নানাপ্রকার উপদেশ পাইয়া পরদিবস প্রত্যূষে যথানিয়মে সাবিত্রী পাহাড়ে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম।

সাবিত্রী পাহাড়।

যথাকালে পরদিবস প্রত্যূষে সদলে শ্রীশ্রীসাবিত্রীদেবীর শ্রীচরণ ধ্যান করিতে করিতে শুভযাত্রা করিলাম। পুষ্করের বাঁধা রাস্তা হইতে ক্রমে শুষ্ক মরুভূমির মধ্যপথ দিয়া সরাসর অগ্রসর হইয়া পাহাড়ের পাদমূলে অতি কষ্টে উপস্থিত হইলাম। এ পথে কাঁটাগাছ বা ঝোপ-ঝাপের অসদ্ভাব নাই। আমরা যে দিবস সাবিত্রীদেবীর দর্শন যাত্রা করিয়াছিলাম, ঐ দিবস আমাদের ন্যায় আরও কত যাত্রী—কেহ পদব্রজে আবার কেহ বা ডুলীতে আরোহণ করিয়া দেবী দর্শনে গমন করিতেছিলেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। এই সকল যাত্রীদিগের সহিত মিলিত হইয়া নানা বিষয় গল্প করিতে করিতে সাবিত্রী পর্ব্বতের পাদ-মূলে পৌঁছিয়াই, ইহা দুরারোহ সোপান শ্রেণীর দ্বারা সজ্জিত রহিয়াছে দেখিলাম। অবগত হইলাম প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বে যোধপুরের রাজার দেওয়ান কর্ত্তৃক এই সোপানগুলি নির্ম্মিত হইয়াছে।

অত্যুচ্চ এই পর্ব্বতমূলে ক্ষণকাল বিশ্রামান্তে দেবীর শ্রীচরণ ধ্যান

পূর্ব্বক উপরে আরোহণ করিতে লাগিলাম। এইরূপে অতি সাবধানের সহিত উঠিয়া পর্ব্বতের শিখরদেশে সাবিত্রী-মন্দিরের দ্বার সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, সেই মন্দিরদ্বার ভিতর হইতে বন্ধ রহিয়াছে সুতরাং সেই দ্বারের নিম্নস্থ সোপানে কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করিয়া শ্রান্তিদূর করিবার সময় ভাবিলাম, মলয় মারুত কি কেবল এই স্থানেই বহিয়া থাকে? পাহাড়ের চূড়া চারিদিকে খোলা, এই জন্যই পর্ব্বতের গায়ের গাছপালার মধ্যদিয়া চতুর্দ্দিকের অনন্ত বিস্তার প্রান্তরের উন্মুক্ত বাতাস মৃদুমন্দ গতিতে বহিয়া থাকে, ইহার ফলে শরীর একেবারে জুড়াইয়া যায়। এক্ষণে যাত্রীদিগের কোলাহল শব্দে—কিছুক্ষণ পর মন্দির সংলগ্ন একটী বাতায়ন উন্মুক্ত হইল, তাহার মধ্য হইতে কতিপয় মনুষ্যমুণ্ড বারেক দেখা দিয়াই অন্তর্দ্ধান করিল। তৎপরে কিয়ৎকাল পর হঠাৎ ঘন ঘন্ ঝন্ ঝন্ শব্দে মন্দির দ্বার খুলিয়া গেল এবং একজন ব্রাহ্মণ আমাদিগকে সাদরে ভিতরে প্রবেশ করিতে আহ্বান করিলেন।

মন্দির ও প্রাঙ্গণটী—কারুকার্য্য বর্জ্জিত ও আকারে ক্ষুদ্র। যে সকল ভক্ত ধর্ম্মের জন্য, তীর্থকৃত্যের নিমিত্ত নানারূপ কষ্ট স্বীকার করিয়া এখানে আসেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই সুরেশ্বরী শ্রীশ্রীসাবিত্রীদেবীর শ্বেত প্রস্তর নির্ম্মিতা মোহিনী মূর্ত্তিখানি দর্শন করিয়া পরমানন্দ অনুভব করিয়া থাকেন, কেনমা শাস্ত্রে উপদেশ পাওয়া যায়—দেবী ব্রহ্মার যজ্ঞকাল হইতে এই স্থানে আশ্রয় লইয়া আছেন; তাঁহার পদরেণু স্পর্শে এই স্থান পবিত্র। দেবীর পবিত্র মূর্ত্তিখানি আকর্ণ-নয়না, হাস্যমনা অর্থাৎ শ্রীমুখখানি যেন সদাই হাসিভরা। সাবিত্রীদেবীর পার্শ্বদেশে দেবী সরস্বতী, বহির্দ্দেশে ইন্দ্রাণী বা শচীদেবীর অধিষ্ঠান হইয়াছে। এখানে যে সরস্বতী মূর্ত্তি বিদ্যমান, তিনি পদ্মাসনা বা বীণাধারিণী নহেন। স্বদেশ হইতে যে স্বর্ণনির্ম্মিত নথ, মাথার সিন্দুর, হাতের লোহা, সাবি

প্রভৃতি দেবীর অর্চ্চনার জন্য লইয়া গিয়াছিলাম,সেই সকল দ্রব্যের সহিত শ্রদ্ধাপূর্ব্বক দেবীর পূজার্চ্চনা প্রদান করিয়া মহাব্রত উদ্যাপন করিলাম। যে সিন্দুর ও লৌহা দিলাম, দেবীর পাণ্ডার পত্নী সেই সিন্দুর বাণ্ডিল ও লৌহাগুলি একবার তাঁহার শ্রীঅঙ্গে স্পর্শ করাইয়াই সেগুলি সমস্ত আমাদিগকে প্রত্যার্পণ করিলেন। বলা বাহুল্য যে—এই সিন্দুর ও লৌহা দেবীর শ্রীঅঙ্গে স্পর্শ করাইতে প্রত্যেক যাত্রীর নিকট হইতে ১।০ এক টাকা চারি আনা প্রণামী লইলেন। অবগত হইলাম পাণ্ডাজী কখন কখন যাত্রীসমাগম অধিক দেখিলে ১।০ হইতে ২৸/০ পর্য্যন্ত প্রণামীর হার বৃদ্ধি করিয়া থাকেন। মন্দির প্রাঙ্গণের বৃক্ষতলে ভগবান মহেশ্বরের একটী লিঙ্গমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে; ইহার বহির্ভাগে পশ্চিম পার্শ্বে যে একটী কুণ্ড দেখিতে পাওয়া যায়, সেই কুণ্ড-বারি স্পর্শ করিয়া এখানকার নিয়মগুলি সম্পন্নপূর্ব্বক পুস্করের নির্দ্দিষ্ট বাসাবাটীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

এখান হইতে পুস্করে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বেলা ১০টা বাজিয়াছিল, সুতরাং সূর্য্যকিরণে বালুকারাশি উত্তপ্ত হইয়া অত্যন্ত কষ্ট দিয়াছিল। সে যাহা হউক, সেই দিন যথানিয়মে পুস্করে ব্রাহ্মণ ভোজন, তৎপরে পাণ্ডার নিকট সুফল লইয়া তাঁহার খতিয়ান বহিতে আমাদের নাম ধাম সাক্ষর করিয়া এখান হইতে গন্তব্য স্থানে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। অর্থাৎ আমাদের যে রকবাইড-টমটম্‌গুলি অপেক্ষা করিতেছিল, উহাতে আরোহণ পূর্ব্বক আজমীঢ় ষ্টেশনাভিমুখে যাত্রা করিলাম।

সমাপ্ত।

সমালোচনা।

স্থানাভাব বশতঃ "সচিত্র তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনীর" কয়েকটী সার সংগ্রহ সমালোচনা সন্নিবেশিত হইল :—

বর্ত্তমান সাহিত্যযুগের অদ্বিতীয় সমালোচক চুঁচুড়া নিবাসী দেশপূজ্য সুপ্রবীণ শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহোদয় সচিত্র তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী সম্বন্ধে বলেন :—

কতকটা সখের খাতিরে, কতকটা স্বাস্থ্যের জন্য যৌবনে অনেক তীর্থেই ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি, আজ আবার বৃদ্ধবয়সে ঘরে বসিয়া আগ্রহের সহিত "তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী" পড়িলাম। দেখিলাম, এই নূতন লেখক এক নূতন পন্থায় তাঁহার ভ্রমণ-কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন। গ্রন্থের প্রত্যেক পৃষ্ঠায় গ্রন্থকারের খাঁটি হিন্দুত্ব সব প্রকাশ হইয়াছে। গ্রন্থের গুণপনা এই যে, ইহাতে সমাজের ছড়াছড়ি, অলঙ্কারের হুড়াহুড়ি নাই, ভাষাটী বেশ সরল, স্নিগ্ধ ও শান্ত—যেন বাঙ্গালীরই ঘরের কথা, আর গ্রন্থকারের গুণপনা এই যে, পরের মুখে ঝাল না খাইয়া ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুর পবিত্র চক্ষে তীর্থ সম্বন্ধে মাহাত্ম্য সকল খুঁটিনাটী কথা কহিয়া সাধারণের অজ্ঞেয় বহু তত্ত্বই সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন। এই গ্রন্থের একখণ্ড সঙ্গে থাকিলে বিদেশ গিয়া সহচরের অভাবে কোন অসুবিধাই ভোগ করিতে হয় না; কেন না, কোন্ তীর্থে কি দর্শনীয়, কি করনীয়, কোন্ পূজার কোন্ দ্রব্য প্রয়োজনীয়, কোন্ স্থানের অধিবাসীরা কোন্ জিনিষকে কি নামে অভিহিত করে, এ সকল কথা বেশ নিপুণতার সহিত বিশদভাবে বোঝান হইয়াছে।

বসুধা, ১ম সংখ্যা, ১২শ বর্ষ, সন ১৩১৯ সাল।

বৈশ্যজাতির মুখপত্র প্রসিদ্ধ "সুবর্ণবণিক" সম্পাদক বলেন ;—

"তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী" শ্রীগোষ্ঠবিহারী ধর প্রণীত, ৩৫৬ নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা হইতে শ্রীবিপিন বিহারি ধর কর্ত্তৃক প্রকাশিত, এই পুস্তকখানি বিলাতী ধরণের বাঁধাই, ছাপানও অতি সুন্দর। অনেক তীর্থ চিত্র ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে, তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী তীর্থ যাত্রীর একমাত্র সম্বলের বস্তু বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, তীর্থভ্রমণকালে তীর্থ যাত্রীদিগকে ঠগের হাতে পড়িয়া অনেক সময়ে বিপদগ্রস্ত হইতে হয়, তন্নিবারণের জন্য গ্রন্থকার এই পুস্তক প্রণয়ন করিয়া ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন, সন্দেহ নাই। অনেক তীর্থের ইতিহাস ও ইহাতে বেশ সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে।

সুবর্ণবণিক, ৩রা অগ্রহায়ণ, সন ১৩১৭ সাল।

সুনামখ্যাত পুলিশ কোর্টের ভূতপূর্ব্ব উকীল শ্রীযুত মনোজমোহন বসু মহোদয় বলেন ;—

আমি শ্রীযুক্ত গোষ্ঠবিহারী ধর মহাশয়ের "তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী" পাঠ করিয়া নিরতিশয় আনন্দলাভ করিয়াছি। পুস্তকখানি নানা জ্ঞাতব্য বিষয়ে পরিপূর্ণ এবং ইহাতে নানাস্থানের অতি মনোরম হাফটোন চিত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। হিন্দু সাধারণ বিশেষতঃ তীর্থভ্রমণ অভিলাষীগণ ইহা পাঠে যথেষ্ট উপকৃত হইবেন ; বর্ণনার প্রণালীও প্রশংসনীয়।

কলিকাতা, ১২ই অগ্রহায়ণ, সন ১৩১৯ সাল। — শ্রীমনোজমোহন বসু। উকীল পুলিশকোর্ট।

জগদ্বিখ্যাত বসুমতী সম্পাদক বলেন ;—

সচিত্র "তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী" শ্রীগোষ্ঠবিহারী ধর প্রণীত, ৩৫৬ নং অপার চিৎপুর রোড হইতে শ্রীবিপিন বিহারী ধর, কর্ত্তৃক প্রকাশিত। উত্তম কাপড়ে বাঁধাই। নানা তীর্থের বহু হাফটোন ছবি ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তীর্থ যাত্রীগণ পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আনন্দ লাভ করিবেন। ভারতের প্রধান প্রধান তীর্থসমূহের বিবরণ প্রভৃতি ইহাতে বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

বসুমতী, ২রা অগ্রহায়ণ, সন ১৩১৮ সাল।

একমাত্র দৈনিক সুপ্রসিদ্ধ নায়াক সম্পাদক বলেন ;

সচিত্র "তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী" শ্রীযুৎ গোষ্ঠবিহারী ধর প্রণীত। এই বইখানি খুলিলে প্রথমেই ইহার চিত্রগুলি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। গ্রন্থের আকার ডবলক্রাউন ১৬ পেজি, আড়াই শত পৃষ্ঠার অধিক। উত্তর ভারতের অনেকগুলি তীর্থক্ষেত্রের বৃত্তান্ত এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে। তীর্থক্ষেত্র গমনের পথে প্রবঞ্চক ও সেতুয়া এবং তীর্থক্ষেত্রে পাণ্ডাগণের অত্যাচার হইতে আরম্ভ করিয়া প্রধান প্রধান তীর্থক্ষেত্রের উৎপত্তির বিবরণ, পূজা ও দেব দর্শন বিধি, দেবতা ও পাণ্ডাদিগের প্রণামী এবং অন্যান্য প্রাপ্য, তীর্থ যাত্রীদিগের যে সকল দ্রব্য, যে পরিমাণ পাথের এবং নিজের ব্যবহারের জন্য যে সকল জিনিষ আবশ্যক, তাহার তালিকা—এ সকল বিষয় এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তীর্থক্ষেত্রের বিবরণের সঙ্গে অন্যান্য দ্রষ্টব্য স্থানেরও বিবরণ ইহাতে লিখিত হইয়াছে। গ্রন্থের ভাষা মন্দ নয়, মোটের উপর গ্রন্থখানি সুপাঠ্য হইয়াছে।

নায়ক—২৪শে বৈশাখ, ৫ম বর্ষ, সন ১৩১৯ সাল।

167, Manicktollah Street.
CALCUTTA.

Honerable Rai Baikunto nath Bose Bahadur Honry, Magistrate Says ;—

I have read with pleasure and profit the book of travel which Baboo Gosto Behary Dhur has broughtout in two Volumes under the designation of "Sachitra Tritha Bramana." The book is a record of the writers personal experiences of the various places ef pilgrimage in all parts of India which he visited and as such it should prove valuable practical help to would be pilgrims for whose guidance he has so very thoughfully provided the requisite instructions. The stag-at-home might enjoy the pleasure of a visit which they can not make by perusing the vivid descriptions of the places with the occasional aid of the neatly executted illustrations which accompany them,

2nd. January 1913. Baikunto Nath Bose.

Marble palace, Chorebagan, Calcutta,
17th July 1912.

Honble, Kumar Nogendra Nath Mullick says :—

I have gone through "Shachitra Teertha-Bhramon-Kahiny part I and II compiled by Baboo Gosto Behary Dhur. The book contains detailed and descriptions with illustrations cf almost all the important places of pilgrimage in India.

It is the best guide to the pilgrims and to the tourists.

Nogendra Mullick.

হিন্দুধর্ম্মের মুখপত্র "বঙ্গবাসী" সম্পাদক বলেন ;—

তীর্থ ভ্রমণ-কাহিনী। শ্রীযুৎ গোষ্ঠবিহারী ধর প্রণীত। কলিকাতা ২০১ নং কর্ণওয়ালীস ষ্ট্রীটে মেডিকেল লাইব্রেরীতে প্রাপ্তব্য—গ্রন্থকার নানা তীর্থস্থান ভ্রমণ করিয়াছেন ; সুতরাং তীর্থ তথ্য সম্বন্ধে ইনি যে অভিজ্ঞ, তাহা বলাই বাহুল্য। আলোচ্য গ্রন্থে তাহার পদে পদে প্রমাণ পাওয়া যায়। তীর্থযাত্রীর ইহা উপকারী ও উপাদেয়। অনেক তীর্থের অনেক খুটি-নাটি তথ্য পাওয়া যায়। কোথাও কোথাও পৌরাণিক তথ্য বিস্তৃতভাবে লিখিত আছে। পৌরাণিক তথ্যগুলি বেশ। এ গ্রন্থ সাহায্যে হিন্দু মাত্রেরই পাণ্ডা গোলক ধাঁধার বড় উপকার হইবে।

বঙ্গবাসী ৮ আষাঢ়, সন ১৩১৯ সাল।

হাওড়ার প্রসিদ্ধ The Loyal Citizen সম্পাদক বলেন ;—

Sachitra (illustrated) "Thirtho Bhraman" (pilgrimage).

We are glad to read the above named book. It is completed in Three Volumes, but we have recieved the Vol. II for review. There are good many pictures in this volume.

The volume in question is entremely interesting as much as, it has given vivid descriptions of a number of sacred places of the Hindus.

The Author has a great command over the Bengali languages. The descriptions of the places are given in such a charming way that one can not leave the Book if he has once begin to read them.

জগদ্বিখ্যাত The Indian Mirror সম্পাদক বলেন ;

SACHITRA TIRTHA-BHRAMAN-KAHINY.

Baboo Gosto Behary Dhur is much Travelled-man. He has visited all the principal Hindu places of pilgrimage in India. What he has not is not perhaps worth visiting. But he has done more. He has jotted down an account of the numerous shrines at which has worshipped and such account including the pouranick or legendary stories that are associated with the sites.

The number of Hindus who has visited the magnificent shrines in Southern India is less those who have made pilgrimages in upper India and still less is the number of those who have written on them. The two out of the three Volumes of his travels, which Baboo Gosto Behary Dhur has caused to be brought out, are therefore, of obsorbing interest to pilgrims and tourists alike.

The Volumes are liberally embellished with appetizing illustrations of important shrines and striking views.

The writer has shown much care and industry in the compilation of the Volumes and he will undoubtedly feel simply rewarded if intending pilgrims make use of those for their guide.

To the House-keeper too, they will not only furnish profitable reading, but will act as powerful incentivet to travel.

The Indian Mirror, 10th July 1912

ভবানীপুরের বিখ্যাত "যমুনা" পত্রিকার সম্পাদক বলেন ;—

"সচিত্র তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী" শ্রীযুৎ গোষ্ঠবিহারী ধর প্রণীত ; তৃতীয় ভাগ। মূল্য এক টাকা চারি আনা মাত্র। এই সুদীর্ঘ ভ্রমণ কাহিনী খানি পাঠ করিয়া আমরা আনন্দ লাভ করিয়াছি। ইহাতে লেখকের আত্মকথার কোন আড়ম্বর নাই। বেশ সহজ সরল ভাষায় নানাদেশের কাহিনীগুলি লিপি বদ্ধ হইয়াছে। রচনা ভঙ্গিটি উপভোগ্য। এই ভাগে—বোম্বে, পুণা, গৌহাটী, প্রভাস, চন্দ্রনাথ, দার্জ্জিলিং, নেপাল প্রভৃতির বিস্তর বিবরণ আছে। গ্রন্থে অনেকগুলি ছবি আছে ; ছবিগুলিতে বক্তব্য ফুটিয়াছে ভাল।

চৈত্র সন ১৩১৯ সাল।

The Hindu Patriot says ;—

Sachitra-Tirtha-Bhraman-Kahiny Part III by Gosto Behary Dhur Price Rs. 1/4/-

It is a most interesting book of travels, invaluable to visitors to Hindu places of pilgrimage.

Dated 17th March '13,

Calcutta.

সর্ব্বজনপ্রিয় প্রবীণ সুচিকিৎসক ভারত গভর্ণমেণ্ট হইতে উপাধিপ্রাপ্ত "বৈদ্যরত্ন" শ্রীযুক্ত কালিদাস বিদ্যাভূষণ মহোদয় বলেন ;—

বার্দ্ধক্যাবস্থায় তীর্থ ভ্রমণ অসম্ভব, কিন্তু তীর্থ দর্শন বাসনা নিরন্তর রহিয়াছে। সেই বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য শ্রীমান গোষ্ঠবিহারী ধর প্রণীত "সচিত্র তীর্থ-ভ্রমণ কাহিনী" পাঠ করিয়া প্রীতি-প্রফুল্লিত হইলাম। কারণ গৃহে বসিয়া দূরস্থিত তীর্থগুলির বিবরণসহ প্রতিকৃতি দর্শন বিশেষ প্রতিপদ এবং যাঁহারা তীর্থ গমনে সমুত্থত হইয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে পুস্তকখানি অতি যত্নের বস্তু। কোথায় কোন্ বস্তু পাওয়া যায় বা অপ্রাপ্য, তাহা বিষদভাবে বিবৃত হইয়াছে। যদিও এক্ষণে রেলপথে সর্ব্বত্র যাতায়াতের সুবিধা হইয়াছে, তথাপি টাইম টেবল ব্যতিরেকে যেরূপ রেলপথে আশা যাওয়া চলে না, সেইরূপ এই পুস্তকখানিও যেন তীর্থস্থানের দ্বিতীয় টাইমটেবল। গ্রন্থকারের এই কৃতিত্ব মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করা যায় এবং তাঁহার হৃদয়ের সারল্য দেখিয়া বিশেষ আহ্লাদিত হইলাম। কিমধিকমিতি।

তাং ২৩ কার্ত্তিক বৈদ্যরত্ন শ্রীকালীদাস বিদ্যাভূষণ কবিরাজ,

সন ১৩১৯ সাল। ৮ নং রায় বাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

The Well-reputed Statesman says—

" Sachitra Trita Bhraman Kahiny" This is the thira volume of a Book of travel written by Baboo Gosto Behary Dhur of Calcutta.

The volume comprises accounts of the Presidency of Bombay, in the Province of Assam and in the territory of Nepal. The neatly executed illustrations which accompany the descriptions add much to their interest. The whole series is calculated to prove a useful guide to would be Hindu pilgrims.

To the General reader too, it is likely to furnish pleasent rcading.

Calcutta 29th June 1913.

দেশপূজ্য সুরেন্দ্রনাথের "বেঙ্গলী" পত্র বলেন ;—

Sachitra Tirtha Bhraman by Baboo Gosto Behary Dhur.

The book depects the narrations and histories of Hindu secred places and vividly represents the securites of all such places.

We recommend this Book to the readers, who are fond of travels and hope they will feel much pleasure with it. It can be had at the Bengal Medical Library.

The Bengalee, 2nd. November 1913.